শ্রীশ্রীভাগবতকথামৃত

শ্রীমধুসূদন কথিত

শ্রীযুত্ ভক্তিবিনোদ অধিকারী সম্পাদিত

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ রসানন্দ বনমহারাজের ভূমিকা সম্বলিত

সাহিত্য কুটীর

১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :—
শ্রীবটকৃষ্ণ রায়
কাশীয়াড়া, মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৬, রথযাত্রা

মুদ্রাকর :—
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৩৩/ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

॥ উৎসর্গ ॥

পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺নদেরচাঁদ বেরার

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী—

ভূমিকা

বসুদেবং সুতং দেবং কংসং চানূরমর্দ্দনং।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎগুরোঃ ॥

'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাই কৃষ্ণসেবাই আমাদের একান্ত কর্তব্য'—শাস্ত্রের এই মঙ্গলময় উপদেশটি ভুলে গিয়েই আমরা অশান্তি ও দুঃখ পাইতেছি। ভাগ্যক্রমে ভগবৎ কৃপায় সাধুগুরুর দর্শন পাইয়া তৎসঙ্গ ফলে যদি কোন জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ কৃষ্ণোন্মুখ হয় তবেই সে দুঃখের হাত হইতে নিস্কৃতি পায়। নতুবা শান্তি অসম্ভব।

"কৃষ্ণাশ্রয় বিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যাকুল কোটি কোটি ধন ॥
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় নহে বিদ্যাধনে ॥"

আবার, 'বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতেন সুখং কদাপি ॥'

বৃন্দাবনে নিজগৃহে, কারাগারে অথবা রাজসিংহাসনে বসিয়াও সুখ মিলিবে না যদি না আমরা কৃষ্ণভজন করি। নরকেও সুখ আছে যদি নারকী ব্যক্তি সেখানে ভজন করে।

এই কৃষ্ণভজনের জন্য চাই সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, ভাগবত শ্রবণ পঠন ও পাঠন। শাস্ত্রে আছে—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি লভি, পাবে প্রেমধন ॥

এই সাধুসঙ্গ ও ভগবানের লীলাকাহিনী পঠন ও পাঠন হইতেই আসিবে ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎ প্রেম, আসিবে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ। আর সেই অনুরাগের ফলেই জীব মৃত্যু হইতে অমৃতে গমন করিতে পারিবে। মৃত্যু গোবিন্দকে ভয় করে। 'গোবিন্দা-ন্মৃত্যুর্বিভেতি।' তাই সেই গোবিন্দের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ও অনুরাগ দেখাইতে সর্বশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা দরকার।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কল্যাণে ভগবান কৈল বেদপুরাণ ॥

জীব ভগবানকে ভুলে মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্মমৃত্যুর যাঁতায় অনবরত ঘুরিতেছে এবং আধ্যাত্মিক তাপত্রয় ভোগ করিতেছে। তাহাদের এই মর্মান্তিক

অবস্থা দেখিয়া ভগবান মুনিগণের অন্তরে বেদশাস্ত্র প্রদান করেন। কিন্তু অস্থিরমতি জীব তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় এবং বেদবিরুদ্ধ জীবন যাপন করিতে থাকে। তখন ভগবান নিজেই আচার্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রতিপাদ্য ধর্মশিক্ষা দেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সাড়া পড়েনি। তারপর ভগবান মহামুনি ব্যাসদেবের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বেদকে চারভাগে ভাগ করেন। সেই সময় তিনি অষ্টাদশ পুরাণও রচনা করেন। ঐসব পুরাণ ও শাস্ত্রের চমকপ্রদ ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি জীবকে ঈশ্বরমুখী করিতে চেষ্টা করিলেন।

এইসব শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বেদব্যাস নিজে শান্তি পান নি। মনে হইতেছে, কৃষ্ণের সম্পর্কে আরো যেন কিছু কথা বলিলে বা লিখিলে ভাল হয়। তিনি হরিদ্বারের গঙ্গার ধারে বসিয়া দুঃখিত চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন—জীবের শান্তির জন্য এত সব করিয়া আমি নিজেই যখন শান্তি পাইতেছি না, তখন কি প্রকারে জীবের মঙ্গল হইবে?

হঠাৎ সেই স্থানে নারদের আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন ব্যাসদেবের গুরুদেব। নারদ ব্যাসদেবের মনের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন! তুমি ঠিক ঠিক তথ্য পরিবেশন করিতেছ না। যেমন বালি, লবণ, চিনি ও লৌহগুঁড়ো একত্র মিশ্রণের ফলে কোন দ্রব্য সঠিকভাবে আলাদা করা যায় না, ঠিক তুমিও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে একসাথে মিশাইয়া ফেলিয়াছ। যাহার ফলে কলির অল্পায়ু অস্থির বুদ্ধি সম্পন্ন জীব কোন মতেই ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। তাহারা শাস্ত্রের বিভিন্ন তথ্য পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। তবে এখন তুমি লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণের লীলা সমন্বিত ভক্তি মহিমা কীর্ত্তন কর। আমি চারটি মাত্র শ্লোক বলিতেছি—এই মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা কর, যাহা শ্রবণ করিলে জীব চিরশান্তি লাভ করিবে।

সেই চারটি শ্লোককে আঠার হাজার শ্লোকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাসদেব ভাগবতের আবির্ভাব ঘটান। এই ভাগবতের প্রথম শ্রোতা ছিলেন ব্যাসের পত্নী-বীথিকার গর্ভস্থ সন্তান শ্রীশুকদেব। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া সংসার মায়ায় আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে জন্মগ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তারপর ব্যাসদেব বহু মিনতির দ্বারা তাঁহাকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করান। ১৬ বৎসর মাতৃগর্ভে থাকিবার পর তিনি ভূমিষ্ট হইয়া কিন্তু গৃহ হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরিক্ষীত আত্মার মঙ্গলের জন্য অধিবেশনে বসিয়াছেন। ঠিক সেই সময় শ্রীশুকদেব গিয়া বলিলেন—হে মহারাজ, তোমার পিতৃপুরুষগণ-ভগবানের সঙ্গে লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন। তুমি সেই লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতরসময়ী কথা শ্রবণ করিয়া আত্মার শান্তিলাভ কর। এই কথা বলিয়াই মহারাজ পরীক্ষিতের অনুরোধে তিনি শ্রীভাগবতকথা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

শ্রীব্যাসদেবকৃত শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নির্মল আনন্দ উপভোগ করিবেন না—ইহাতে যোগী-ভক্ত,

কর্মী ও সাধারণ গৃহী সকলেই পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যেন একটি কামধেনু—যিনি যে উদ্দেশ্যে দোহন করিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন। অদ্বৈত-দ্বৈত হইতে অচিন্ত ভেদাদি বহুবিধ অভিমতের অভিনব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এই গ্রন্থে। জ্ঞান-ভক্তি-তত্ত্ব-তথ্য-কাব্য-দর্শন-অনুভূতি-ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, চিন্তা-ভাবনা-বৈরাগ্য ও অমৃততত্ত্বের ষোড়শ উপাচার লইয়া মহর্ষি-বেদব্যাস এই মহাগ্রন্থটির আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি আমরা ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাহার রসাস্বাদন করিতেছি।

এই সুবৃহৎ ভাগবত গ্রন্থটি যেন একটি বিরাট বৃক্ষ। এই বৃক্ষের দ্বাদশটি স্কন্ধ বা শাখা সেই দ্বাদশস্কন্ধে আছে অসংখ্য অধ্যায় বা প্রশাখা, আর অসংখ্য টীকা-টীপ্পনী সমৃদ্ধ বিচিত্র অলংকার সমন্বিত আঠার হাজার শ্লোক বা পুষ্প।

বর্তমান যুগের কলিহত কর্মব্যস্ত মানুষদের এই ভাগবত পড়ার ধৈর্য্য আজকাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাই পরম কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণকথা অনুশীলন মানসে বিশেষ করিয়া প্রাণগোবিন্দের প্রতি বিরাট ভালবাসা আর শ্রদ্ধা লইয়া ব্যাসদেবকৃত সুবৃহৎ ভাগবতের বিরাট কাহিনী ও তত্ত্বকথাগুলিকে অতি সংক্ষেপে সহজ সরল ও চমৎকার ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃত গ্রন্থে।

বিষয়বস্তুকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য লেখক স্বরচিত ভক্তিমূলক কবিতাও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন সুন্দরভাবে সাবলীল ভাষায় জনসাধারণের উপযোগী করিয়া কাহিনী ও তত্ত্বের মাধ্যমে ভাগবত পরিবেশন অত্যন্ত প্রশংসার্হ। শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃতের কোনও স্থানে শাস্ত্রের কাঠিন্য নাই। বরং গ্রন্থটির পাতায় পাতায় ভক্তিমিশ্রিত সাহিত্যের গভীর ভাব ব্যঞ্জনা গদ্যের মধ্যে এক মাধুর্য্যময়ী অপরূপ ছন্দের সাবলীল সুরঝংকার—যাহা শুধু আমার মত এক আশ্রমবাসীকেই নহে সমগ্র পাঠক-পাঠিকার মনকে আকুল করিয়া তুলিবে।

ইহা ছাড়া বৃন্দাবন—মথুরা ও দ্বারকাকে লেখক নিজস্ব ভাব ও ভক্তির তরঙ্গ দিয়া নতুন আঙ্গিকে ঢালিয়া যেন নতুন ভাবে সাজাইয়া বাংলার নিজস্ব সম্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থটি পাঠ না করিলে তাহা বোঝা যাইবে না।

সাধু বাংলা ভাষায় গদ্যে রচিত ভাগবত বাজারে দু'একখানা মিলিতে পারে কিন্তু এমন সহজবোধ্য সরল চলিত ভাষায় ভাগবত আমি এই প্রথম দেখিলাম। আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের ধর্মীয় জীবনে ও মানসিকতায়, ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণে এবং ভক্তির অনুশীলন ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হইবে এবং সকলশ্রেণীর মানুষকে অশেষ আনন্দদান করিবে। এককথায় এই গ্রন্থে সাহিত্য রসিক পাইবেন সাহিত্যের রসকলি, ধার্মিক পাইবেন ধর্মের সুগভীর তত্ত্ব, গল্প প্রেমিক পাইবেন রোমান্সের রসধারায় পৌরানিক গল্পের ভাবধারা আর মুমুক্ষু সাধক পাইবেন সংসার মুক্তির নতুন পথের

দিশা। তবে সবটাই ভক্তির অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া লেখা। তাইতো আমার বলিতে ইচ্ছা করে—

ভাগবতকথামৃতের কথা অমৃত সমান।
শ্রীমধুসূদন কহে শুনে পুণ্যবান॥

এমন সুন্দর ভাষায় অমৃতময়ী ভাগবতী কথা, এমন সুখপাঠ্য গ্রন্থ সর্বজনের পাঠ করা একান্ত উচিত। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং মহিমা জানিতে হইলে সকলকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। এই গ্রন্থরত্ন উপহার বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সংযোজন। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট গ্রন্থখানি আদরনীয় হইয়া উঠিবে।

তাছাড়া এই গ্রন্থটি একদিন বঙ্গ সাহিত্যের আকাশে কলঙ্কহীন চন্দ্রের মতো শোভা পাইবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে আমি এই গ্রন্থটির বিপুল প্রচার কামনা করি। হরে কৃষ্ণ!

গ্রন্থকারের নিবেদন

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

ভবসাগরপারের কাণ্ডারী শ্রীশ্রীগুরুদেবের পদধূলি মাথায় নিয়ে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীহরি আর পিতা মাতার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম জানিয়ে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে ভাগবতের আলোচনা উপস্থাপিত করছি। শ্রীমদ্ভাগবত অনন্ত ভাবরসের উৎস। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সেই অনন্তভাবের আধার। কৃষ্ণানুভূতি আমার কাছে অন্ধের হস্তীদর্শনের আভাসমাত্র। তবুও এই ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে কেবলমাত্র আপন মনের নিছক তৃপ্তিলাভের জন্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকপাঠিকার ভিন্ন ভিন্ন রস-পিপাসার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আলোচনা করছি এই মহাপুরাণের।

আজ অন্যায়-অত্যাচারে দেশ ষোলকলাপূর্ণ। জনতার আদালতে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' মানবসভ্যতার 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' ঘনিয়ে উঠেছে অশান্তির কালো মেঘ। মানবতার বিরুদ্ধে সভ্যতার শত্রুদের মহাবিনষ্টির ঘৃণ্য কুটিল চক্রান্ত। আজ ভাই ভাইকে খুন করে রক্তনদীর পাশে গড়ে তুলছে সাতমহলা ইমারত। সমাজ সংসারের চারিদিকে ধর্মের আদর্শ আজ ধূলিলুণ্ঠিত, অন্ধ গোঁড়ামিতে পর্য্যবসিত। জ্বলছে শুধু অশান্তির আগুন।

মানব সভ্যতার বক্ষ থেকে এই আগুন নেভানোর জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন যুগাবতার। কিন্তু সেই সব অবতারদের প্রচারিত ধর্মের বাণী মানুষ ভুলে গেছে যুগের প্রভাবে। কলির কালচক্রে 'অশান্তির ঘূর্ণি' আজ জীবনের পলে পলে'। বুদ্ধ-শ্রীচৈতন্য-যিশু-রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার ও অবতার সদৃশ মহামানবের আবির্ভাবের পরেও মানুষের আদিম মনের হিংস্রতার অবসান ঘটেনি—'Still falls the blood from the starved man's wounded sides'.

আজ আমরা অচেতন জনসমাজের গোপন সিঁড়ি বেয়ে সাহিত্যের দর্পণে আপন মুখের প্রতিচ্ছবি দেখছি। অরণ্যজীবনের মতো বেঁচে আছি একই ছন্দে। আমাদের জীবনের মধ্যে শুধু দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানি। বহিরঙ্গবিলাস আর অশোভনীয় জীবনচক্রে আমাদের মানবতা গেছে হারিয়ে—ভক্তি হয়েছে বিলুপ্ত আর শান্তি বিঘ্নিত। ফলে জীবন হয়ে উঠছে বিষণ্ন, বিপন্ন ও দুর্বিসহ।

এই দুর্বিসহ বিপন্ন-ভক্তিহীন মানবজীবনে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনই একমাত্র শান্তির উপায়। বাসনারূপ মোহকে ত্যাগ করে মনকে ভগবন্মুখী করতে পারলেই যথার্থ শান্তিলাভ হয়। ঈশ্বরমুখী মানুষ শত বিপদে পড়েও বেঁচে থাকে। ভগবানতো বলেছেন—"হে ভক্ত, তুমি যদি আমাকে সত্যকারের ভালবাস, তাহলে তোমার ভয়

নেই। আমি তোমাকে উদ্ধার করবই। কারণ, তুমি আমার আপনজন। জলধি যখন পার হবে তুমি, আমি রইব তোমারই সাথে, সংকটের আবর্তে তোমাকে তলিয়ে যেতে দেবো না। অগ্নিকুণ্ড পেরিয়ে যাবার সময় দগ্ধ হবে না তুমি। কঠোর সংগ্রামের মাঝে তুমি রইবে অক্ষত। গিরিপর্বতশ্রেণী ভেঙে পড়তে পারে কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা চির অটল, তোমার মঙ্গলের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি আমি চিরকাল পালন করব।"

তাই ভক্তিভরে—"ধন জন দেহ গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ।

তারপর শুদ্ধচিত্তে করহ স্মরণ ॥

কৃষ্ণ ইচ্ছা মতে সব ঘটায় ঘটনা।

তাহে সুখ দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা কল্পনা ॥"

ভগবানের সন্তোষ সম্পাদনই আত্মশুদ্ধি কর্ম। ভগবানের প্রতি মতি জন্মানোর জন্য দরকার ভাগবত আলোচনা—দরকার শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তন। অতএব ভক্তিভরে ব্যাকুল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে আমাদের নামসংকীর্ত্তন করতে হবে। তবে এই নামসংকীর্ত্তনের প্রবণতা আসবে ভগবানের লীলাকাহিনীমূলক গ্রন্থ পাঠ থেকে—ভগবানের নাম করার ইচ্ছে আসবে ভগবত আলোচনার মাধ্যমে। ভাগবত আলোচনার দ্বারাই জাগবে হরিপ্রেম। তবে নীরবে নাম করলে প্রেম জাগে না। নিঃশব্দ কি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে? না, তা পারে না। তাই উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করতে হবে। করতে হবে হরিনাম যজ্ঞ।

'সেইতো সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।

সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার॥'

কলিযুগের মানুষের প্রাণ অন্নগত—আয়ুও অত্যল্প। ধ্যান-পূজা-তপস্যা এ যুগের মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই ভগবান কলির ক্ষীণজীবি মানুষের জন্য হরিনামকেই মুক্তির পাথেয় রূপে উল্লেখ করে গেছেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ হরিণাম মহামন্ত্রের দ্বারা জীবনকে সার্থক করা। কারণ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

যে ব্যক্তি হরিনাম সুধাপান দ্বারা সারাজীবন কাটায় তার জীবন সার্থক। হরিনাম যার কানে প্রবেশ করেনি—সে কান ক্ষুদ্র গহ্বর ছাড়া আর কি? যে জিহ্বা শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করে না—সে জিহ্বা ভেকজিহ্বামাত্র। যে মাথা শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণত না হয় তা বহুমূল্য মুকুটে শোভিত হলেও দেহের ভার বোঝামাত্র। যে হাত হরির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় না, কাঞ্চন বলয়ে ভূষিত হলেও সে হাত মৃত মানুষের মত অসার। যে চোখ হরির থাকতেও যে হরিক্ষেত্রে যায় না সে তো নিশ্চল বৃক্ষমূল মাত্র। যে ব্যক্তি হরিপাদপদ্মের তুলসীর আঘ্রাণ নেয় না—তার শ্বাস থাকতেও সে শবস্বরূপ।

তাই সর্বকর্মের মাঝে শ্রীহরি চিন্তন-মনন, লীলাস্মরণ, নামসংকীর্ত্তন ও ভাগবত পঠন জীবের একান্ত কর্তব্য। দুর্লভ মানবজীবনতো হরিচিন্তার জন্যই। ভগবত

চরণ লাভের জন্যইতো আমরা লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এ জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি। তাই এ জীবনকে হেলায় হারানো উচিৎ নয়। একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। মোহাঞ্জন মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র অহৈতুকী ভক্তি বিশ্বাস আর ব্যাকুলতার দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করতে হবে, পেতে হবে শান্তি।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার পরম পূজ্যপাদ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের হৃদয়নিঃসৃত মূল্যবান উপদেশগুলি—

"সাধনার পথে বিশ্বাস আর ব্যকুলতা—এই দুটি কথাই কানে এসে বাজে। একটি নিষ্কম্প দীপশিখা। আর একটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য বহমান বায়ু। ·· ক্ষীণ জলধারা যখন গিরিগুহা থেকে বেরোয়, সে বিশ্বাস করে কোথাও আছে তার জলনিধি। বক্রগমনে প্রবাহিত হতে হতে একাগ্রগামিনী হয়ে সে চলে। সেই ভাবে চলছি আমরাও। সংসারের ঝড়ের মধ্যে দুঃখ কষ্টের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি বিশ্বাসরূপ আলোর সন্ধানে—যে আলো কাঁপে না টলে না। আবার সে শুধু পথই দেখায় না, সমস্ত বঞ্চনার উপরেও সে দাগ টানে জমার ঘরে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে শোক দুঃখে নির্বিচল হও, জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চল। তিনিই সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি, সর্ব সমস্যার সমাধান। পাথর হাজার বছর জলে ডুবে থাকলেও তাতে জল ঢুকে না, তেমনি বিশ্বাসী ভক্ত সংসারের হাজার হাজার ঘাত প্রতিঘাতেও বিচলিত হয় না। · · শরণাগতি কখনও নিষ্ক্রিয় নয়। জোর করে এগিয়ে যাও—তাঁকে ধরে ফেল। নিজের খেলা খেলতে আমরা পৃথিবীতে আসিনি। এসেছি ঈশ্বরের জন্য।····· ধর্ম বীর্যবানের—ভীরুর বা ক্লীবের নয়।

ক্ষীণ জলধারা যেমন সমুদ্র পায়, তেমনি আমরাও তাঁকে পাবো। তাই আজ আমাদের জাগতে হবে—অন্তরের শক্তিকে উন্মোচিত করে প্রার্থনা করতে হবে—হে প্রভু! তুমি যে আছ তা আমাকে বুঝতে দাও। ঘরে বাইরে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই গো। জীবনেব সব কিছু ভেঙে গেছে, আছে শুধু বিশ্বাস। যখন তোমার কথা ভাবব, দেখব—তুমি তখন দাঁড়িযে আকুল হয়ে শুনছ, আমি যখন হাঁটব—তখন তুমিও আমার সাথে সাথে হাঁটছ।····· যা পাই, তাতে তুমি। যা না পাই তাতেও তোমার আভাস। বায়ুর সংস্পর্শে তোমার নির্মলতা। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করব—আমি অকিঞ্চন নই, প্রত্যাখ্যাত নই। তুমি আছ আমার একান্ত হয়ে। আমাকে খুশী করার জন্য ধূসর আকাশের অনন্ত মহিমার মাঝখানে রেখে দিয়েছ অনন্ত কোটি তারা—গহন অরণ্যে রেখে দিয়েছ একটি নির্ঝরিণী। সর্বত্র রূপে-রসে গন্ধে-স্পর্শে কী অপূর্ব তোমার মহিমা!

কৃষ্ণব্যাকুলিনী গোপীগণ বন থেকে বনান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকে। ব্যাকুল হয়ে বলছে—হে চম্পক! হে অশোক! হে তুলসী! হে মালতি! বলতে পারো তোমরা, কোথায় পড়েছে তাঁর পদধূলি? হে পৃথিবী! দেখ, কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে তোমার গায়ে রোমাঞ্চ। আমরা কৃষ্ণহীনা, পতিপুত্রহীনা হয়ে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছি তাঁরই জন্যে। বল আমাদের সেই শ্যাম কোথায়?

সম্পাদকের নিবেদন

'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥'

যিনি গোলোকের গুপ্ত সম্পদ নিজ প্রেম ও নামামৃত আপামর জনসাধারণকে অকাতরে অযাচিতভাবে বিতরণ করেছিলেন, সেই মহাবদান্য, কলিপাবনাবতার, প্রেমের ঠাকুর, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করি।

আর যিনি নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর স্তুতি-বন্দনা করেন বেদমন্ত্রে, অশেষ শক্তিধর অনন্ত যাঁর মহিমার অন্ত পান না, যোগিগণ যুগ যুগ ধ্যান করেও যাঁর স্বরূপ মনের মধ্যে ধারণা করতে পারেন না, যিনি এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, সেই ব্রহ্মসংহিতার পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব-কারণের কারণ, অনাদিরও আদি এবং ভক্তগণের পরম আরাধ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণ-পুরুষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের শ্রীপদারবিন্দে সহস্রবার (নমঃ সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই।

সেই সঙ্গে পতিতপাবন সাধু, মহান্ ভক্তগণের পদরজ শিরোভূষণ পূর্বক তাঁদের অযাচিত কৃপাবারি বর্ষণে আমার ন্যায় পামরের তাপিত হৃদয় সুশীতল করবে—এই বাসনা পোষণ করি। (মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।) পরম প্রীতিভাজন শ্রীমধুসূদন রচিত 'শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃত' গ্রন্থের সম্পাদনা করার অনুরোধ বারবার আসায় সে বিষয়ে আমার বিনম্র নিবেদন এই যে, আমি শাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে জড়ধী, ভজনমার্গে দীনাতিদীন দিশেহারা কাঙাল পথিকমাত্র। আমার ন্যায় অল্পজ্ঞ ও অভাজনের বক্তব্যে অনেক ভুল ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাকা সম্ভব। তবে এও জানি—আমাদের বরেণ্য কৃপালু ভক্তবৃন্দ সর্বদা ক্ষমাশীল ও করুণাসাগর। তাঁদের দয়ালু হৃদয়ের ক্ষমাসুন্দর সহানুভূতিতে আমার সেই ত্রুটি বিচ্যুতি সুবিবেচিত হবে—এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে ভাগবত বিষয়ে আমার বক্তব্যের সূত্রপাত করছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দুটি অমূল্য পঙ্‌ক্তির কথা—

'এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥'

এখানে ভাগবত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে দুটি সার্থক অর্থে। (এক) শাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতগ্রন্থ, যাঁর মধ্যে ভগবান শ্রীহরির গুণগাথা কীর্ত্তিত হয়েছে। আর (দ্বিতীয়) ভাগবত বলতে ভক্তিরসরসিক, যিনি শ্রদ্ধা ভক্তির অনুশীলন

করেন এবং অনন্যভজনশীল হয়ে অহরহ ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র ভগবদ্দর্শন করেন (স্থাবর-জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি। সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥) তিনিই ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত অখিল শাস্ত্রের সার, অষ্টাদশ পুরাণের মুকুটমণি— সকল ভক্তি-শাস্ত্রের খনি। তাই বললেন নন্দ নন্দনচরণপরায়ণ রোমহর্ষণ নন্দন উগ্রশ্রবা নামে সূতমুনি—

—নদীসমূহের মধ্যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যেমন শ্রেষ্ঠ, দেবতাগণের মধ্যে ভগবান অচ্যুত বিষ্ণু যেমন শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন দেবাদিদেব শম্ভু শ্রেষ্ঠ, তেমনি পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ।

'নিম্নগাশং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরণামিদং তথা॥'

দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট মহামুনি ব্যাসদেবের অসাধারণ মনীষার অপূর্ব অবদান—মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির পরাসৃষ্টি—এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অমৃতময় ফল ('নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং') পরমহংসচূড়ামণি মহাভাগ শ্রীল শুকদেবের শ্রীমুখনির্গলিত যে হরিকথার অমৃতধারা 'শুকমুখাদ্ অমৃতদ্রবসংযুতং।' সাতদিন ব্যাপী অখণ্ডভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত, বিষয়বিরক্ত, প্রায়োপবেশনে সমাসীন মৃত্যুপথযাত্রী ও মুমুক্ষু মহারাজ পরীক্ষিত উক্ত সাতদিন সেই হরিকথার অমৃতধারায় অবগাহন ক'রে ও তা আকণ্ঠ পান ক'রে পরম মুক্তির পথে পরাগতি লাভ করেছিলেন। সেই অখণ্ড ভাগবতী কথার সার্থক সঞ্চয়ন শ্রীমদ্ভাগবত।

কোন কোন আচার্যের মতে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্তের ব্যাখ্যামূলক ভাষ্য। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মন্দাকিনী ধারা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বৈতবাদের মিলনমাধুরীপূর্ণ অমৃতধারায় এসে মিলিত হয়ে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বেদান্তের যিনি নিরাকার নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই ভাগবতের সাকার, সবিশেষ, সগুণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান। তৈত্তিরিয় উপনিষৎ যাঁকে বলেছেন—'রসঃ বৈ সঃ' তিনি রসস্বরূপ। যিনি বেদান্তের রস ব্রহ্ম, মধুব্রহ্ম, তিনিই ভাগবতের অখিলরসামৃতসিন্ধু নব কিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণ।

তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলেছেন, ব্রহ্মবাদিগণ তাঁকেই বলেছেন নিরাকার ব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞানমার্গের উপাসকগণের নিকট পরমাত্মা এবং সাত্বত ভক্তগণের নিকট তিনিই সাকার সবিশেষ সচ্চিদানন্দময় ভগবান।

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' ভাঃ ১।২।১১

সংস্কৃতভাষায় রচিত অষ্টাদশ সহস্র মন্ত্রময় শ্লোক সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশটি স্কন্ধে এবং অসংখ্য অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং এই গ্রন্থরাজ ভগবানের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি-

রূপে প্রকাশিত। কোন কোন আচার্যের অভিমত অনুযায়ী বলা হয়েছে—ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ তাঁর ঊরু, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কন্ধ দুই পার্শ্বদেশ, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ দুই বাহু, নবম স্কন্ধ হৃদয়, একাদশ স্কন্ধ কপাল এবং দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। আর দশম স্কন্ধটি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অধরের মধুর হাসি—'মঞ্জু হাস্যতাম্'। অল্প সময়ের জন্য হলেও কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হলে আমরা তার মুখের হাসিটি দেখতেই ভালবাসি।

ভাগবতের এই দশম স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলাসহ বৃন্দাবন-লীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা অতি মধুরভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়াশক্তিকে আশ্রয় করে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় লীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ মধু বৃন্দাবনে সেইরূপ লীলা প্রকটিত করেছেন, যা শ্রবণ করে বিষয়াসক্ত মানুষও ভগবন্মুখী হয়।

দ্বারকালীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতত্ত্বরূপে, মথুরালীলায় পূর্ণতর তত্ত্বরূপে এবং বৃন্দাবনলীলায় পূর্ণতম তত্ত্বরূপে প্রকাশমান। তাই এই দশম স্কন্ধটি ভাগবতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও হৃদয়মনরসায়ন। অসার এই সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত, নিত্য নূতন অভাবের তাড়নায় জর্জরিত মানুষের সময় ও সুযোগ অল্প এই সদ্‌গ্রন্থ পাঠের। তাই অল্প সময়ের জন্যও ভাগবত শ্রবণ বা পাঠ করতে হলে দশম স্কন্ধই শ্রবণীয় বা পঠনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরম নির্মৎসর সাধুগণের অনুষ্ঠেয় ঈশ্বর আরাধনারূপ শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম ধর্ম নিরূপিত হয়েছে এবং এতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপনাশক পরম সুখপ্রদ পরমার্থও অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরীকৃত হন। কিন্তু অন্যগ্রন্থ শ্রবণে তা হন না।

'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥' ভাঃ ১।১।২

অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ ক'রে সেই সেই শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করলে তবে মঙ্গল হয়, কিন্তু ভাগবত 'শ্রবণমঙ্গলং'। ভাগবতী কথা শ্রবণমাত্রই জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, তাপিত জীবনে সুধাধারা বর্ষণে শান্তি আনয়ন করে এবং সকল পাপ বিনষ্ট করে। প্রথম রাসলীলার পর শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপরা, বিরহকাতরা ব্রজরামাগণ সর্ব-যোগেশ্বরেশ্বর রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীগোবিন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরকমল দর্শন-মানসে তাঁর গুণগাথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥' ১০।৩১।১০

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি (কর্মবাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা,

নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।

মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ১।১০।১

ভাগবতকার এই আশ্রয়তত্ত্বটি বুঝাবার জন্য সর্গ বিসর্গ প্রভৃতি নয়টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। 'আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।' (চৈ, চ,) আশ্রয়তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু রসের বিচারে লীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব। ব্রজবাসিগণের মধ্যে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা বাৎসল্য-রসের আশ্রয়, শ্রীদামসুদামাদি সখাবৃন্দ সখ্যরসের আশ্রয় এবং ব্রজললনাগণ মধুর রসের আশ্রয়। বিষয়তত্ত্ব আশ্রয়তত্ত্বের সর্বতোভাবে অধীন ('অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।') হওয়ায় ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের 'যশোদাদুলাল', 'ভাই কানুহাইয়া' এবং 'গোপীজনবল্লভের' ভূমিকায় অপরূপ মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টিতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, দণ্ডনীতি, সমাজনীতি, দান ও তপস্যা ইষ্টাপূর্তের ফল, অবতার মহিমা, শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী, ভগবান্ ও ভক্তের মহিমা, ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, গার্হস্থ্য ধর্ম, মানবধর্ম প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হলেও ভাগবতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম'। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, হয়গ্রীব, বামন, পরশুরাম, রাম প্রভৃতি বিভিন্ন অবতার পরমপুরুষের অংশাবতার। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ (এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।) জগতের সকল জীবকে বিশেষতঃ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে অনুগ্রহ করার জন্য ভগবান্ মনুষ্যদেহে আবির্ভূত হয়ে সেই রকম লীলা করেছেন, যা শুনে মানুষ তৎপর অর্থাৎ ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হয়ে ওঠে।

—'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাশ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥'

পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বলেছেন—তাঁকে পাওয়ার অর্থাৎ তাঁর কৃপালাভ করার উৎকৃষ্ট উপায়—ভক্তি। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।'—ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগের নাম ভক্তি। ভগবান্ বলেছেন—

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা ॥ ১১।১৪।২০

যোগসাধনার দ্বারা, জ্ঞানমার্গে উপাসনার দ্বারা, বেদপাঠের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা এবং বিষয়বাসনা ত্যাগের দ্বারা আমাকে যত সহজে লাভ করা যায় না, যত সহজে অহেতুকী ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

'জ্ঞানকর্মে যোগধর্মে নহে কৃষ্ণবশ।

কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥"

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা প্রভৃতি নবধা ভক্তির

অনুশীলন দ্বারা ভজনমার্গে অগ্রসর হতে হতে শ্রীগুরু কৃষ্ণ প্রসাদে ভজনশীল ভক্তের হৃদয়ে অহেতুকী ভক্তির সঞ্চার হয়। ক্রমে অনুরাগ ভক্তির উদয়ে প্রেম ভক্তির অঙ্কুর হয়। সেই প্রেমভক্তিরসে সিঞ্চিত হৃদয়ে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মাধ্যমে শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ সেবারূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়।

ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত মানুষ জাগতিক সুখের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নিজের লালায় বদ্ধ উর্ণনাভের ন্যায় মায়া পিশাচীর ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে ব্যর্থ ছুটাছুটি করছে। প্রকৃত সুখ কোথায়? দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক জন্ম, মৃত্যু থেকে মুক্তির উপায় কি? কোথায় বিমল আনন্দ? উপনিষদ্ বলেন—'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।' জাগতিক সুখ—বিষয় বৈভব, পুত্র কলত্রের সঙ্গ সুখ অল্প, অনিত্য ও ক্ষণিক। এতে প্রকৃত সুখ নেই। ভূমানন্দই প্রচুর সুখের নিদান। যে আনন্দ লাভ করলে মানুষের চাওয়া পাওয়ার আর অধিক কিছু থাকে না। 'যং লব্ধ্বাং চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' সেই ভূমানন্দ লাভ করার জন্য চাই ভাগবতের পরমপুরুষ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যদি এই সুন্দর মানবদেহকে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত না করা হয়, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে যদি ভগবানের মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা যায়, তাহলে শৃগাল কুক্করাদি পশু জন্তুর সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য থাকে না। কেবল যদি উদর পূরণে ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় জীবন কেটে যায়, দিনান্তেও শ্রীহরির মধুমাখা নাম মুখে না নেয়, কিছুমাত্রও ধর্মাচরণ না করে, তবে সে জীবন তো পশুর জীবন। (ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।)

আর মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? ভগবান শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাবিষয়ক কাহিনীর শ্রবণ স্মরণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবানে যে ভক্তি জন্মে, তাই সংসারী মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।—

'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

সংসারতাপিত মানুষের কাছে ভাগবত এই শুভ সন্দেশ বহন করে আসছেন যে, দ্বাপরযুগের শেষে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ব্রজরামাগণকে বংশীধ্বনি করে আহ্বান করেছিলেন, তা নয়, পরম কারুণিক ভগবান যুগ যুগ ধরে নিখিল মানবকুলকে আহ্বান করছেন মোহন মুরারী ধ্বনি করে। বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়ারাম মানুষ আমরা, কর্ণ আমাদের বধির। তাই সেই প্রাণারাম আকর্ষণী মুরলী ধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি না। তবে আজও কোন কোন ভাগ্যবান তা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধে ভাগবতে আলোচিত হলেও ভগবদ্ভক্তগণ তা চান না। কারণ ধর্ম, অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সকৈতব পুরুষার্থ। যারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁদের হৃদয় থেকে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়।

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।'—চৈ. চ.

আর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি অকৈতব পুরুষার্থে, যাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়। হরিভক্তি পরায়ণ সজ্জনগণ স্বর্গ, নরক ও মোক্ষকে সমান দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। তাঁরা শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে প্রেমসেবা রূপ পরমানন্দসাগরে ডুবে থাকতে চান। ব্রহ্মানন্দ সেই প্রেমানন্দের কাছে অতি তুচ্ছ।

—নারায়ণপরা সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ৬।১৭।২৮

আধুনিক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যত্র জীব তত্র শিব অর্থাৎ জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করার আদর্শ প্রচার করে গেছেন। দীন, দুঃখী অনাথ আতুর জীবের মধ্যেও ভগবান আছেন, তাদের সেবার মধ্যে দিয়ে ভগবানের সেবা করা হয়—এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণমিশন' নামক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন।—তিনি বলেছিলেন উদাত্ত কণ্ঠে—

—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥'

জীবে প্রেম বা জীব সেবার আদর্শ শুধু এযুগের পালনীয় নয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও জীবের সার্বিক মঙ্গল সাধন করার মধ্য দিয়ে মানব ধর্ম পালনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

—এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু—।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥ ভাঃ ১০।২২।৩৫

এই সংসারে ধনসম্পত্তি, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা এমন কি প্রাণ দিয়েও সর্বদা জীবসকলের মঙ্গল সাধন করাকেই দেহিগণের জন্মগ্রহণ করার সার্থকতা বলা হয়েছে।

আজ বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে বর্তমান সভ্যতাও সংস্কৃতর বিজয় রথ দ্রুত এগিয়ে চলেছে—অনেকে একথা বলেন। কিন্তু প্রদীপের তলাতেই জমে গাঢ় অন্ধকার। আজ ভারতের দিকে দিকে ধর্মের নামে অধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধ কুসংস্কার, মানুষে মানুষে বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদ এবং মানসিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের পথে। এই ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ভাগবত।

করুণাপর মহর্ষি বেদব্যাস জীবের অবিদ্যা বা অনর্থের উপশমের একমাত্র সহজ উপায়স্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ ভক্তির কথা বর্ণনা করার জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছিলেন।

—অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ ১।৭।৬

সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে দিশেহারা মানুষকে অভয় দিয়ে শ্রীল শুকদেব বললেন—সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥
ভাঃ ১০।১৪।৫৮

যাঁরা পবিত্রকীর্ত্তি পদপল্লবরূপ ভেলাকে সম্যক আশ্রয় করে থাকেন, অর্থাৎ একান্তভাবে তাঁর শরণাগত হন তাদের নিকট এই ভয়ানক ভবসমুদ্র ক্ষুদ্র গোবৎসপদের তুল্য হয়ে থাকে। তাদের আশ্রয়স্থল হয় বৈকুণ্ঠধাম এবং তাদের কখনও বিপদগ্রস্ত হতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভারতীয় কোটি কোটি হিন্দুর নয়, "নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বে দীর্ণ" বিশ্বে শান্তিকামী ও মুক্তিকামী সকল মানুষের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ভজনমার্গের ধ্রুবতারা হৃদয়ের কৌস্তুভমণি।

অতএব পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকাঃ ভুবি ভাবুকাঃ— হে জগতের সকল ভাবুক, রসিক ভক্তগন, লয় পর্যন্ত অর্থাৎ মুক্তি পর্যন্ত অহরহ ভাগবতের রসামৃত পান করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কল্যাণভাজন শ্রীমধুসূদন বাবু রচনা করেছেন শ্রীশ্রীভাগবতকথামৃত। প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রময় আঠার হাজার শ্লোকে রচিত। সেই অমূল্য শ্লোকগুলির টীকাও রচিত কঠিন ও দুর্বোধ্য সংস্কৃতভাষায়। সুতরাং সাধারণ মানুষের পক্ষে কেন, অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও এই টীকা পাঠ করে তার মর্মোদ্ধার করতঃ রসাস্বাদন করা অসম্ভব। এমন কি সাধু বাংলাভাষায় শ্লোকগুলির অনুবাদ পাঠ করেও রসোপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। অবশ্য যদিও সাধুসঙ্গে ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ কর্তব্য। কিন্তু সবার পক্ষে সকল সময়ে সাধুগণের সঙ্গলাভ সহজসাধ্য নয়। তাই ভাগবতের জটিল তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পরিহার করে মূল বিষয়গুলি থেকে বাছাই করে প্রধান প্রধান উপাখ্যান ও কাহিনীগুলি অবলম্বনে মধুসূদন বাবু সংক্ষেপে নূতন আঙ্গিকে সহজ, সরল চলতি বাংলা গদ্যে রচনা করেছেন শ্রীশ্রীভাগবতকথামৃত। পুরাকালে দেবতাগণ অমৃত পান করে যে অপার আনন্দলাভ করেছিলেন শুধু শিক্ষিত নয়; অল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষও যাতে ভাগবতের মূল বিষয়বস্তু অমৃতস্বরূপ কথা ও কাহিনী পাঠ করে রসাস্বাদন করতঃ সেই পরম আনন্দ লাভ করতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে অতি সুন্দর সাবলীল ভাষায় রচনা করেছেন এই গ্রন্থ। লেখকের এই সাধু প্রচেষ্টা সতত প্রশংসার্হ।

মধুসূদন বাবু সাহিত্যক নন, ভক্তিমূলক কবিতা ও গীতি কবিতার রচয়িতা, নাট্যকার, নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও কৃষ্ণভক্তিতে আস্থাবান। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকখানি কবিতার পুস্তক, নাটক, গল্প ও উপন্যাস রচনা করে বঙ্গসাহিত্যভারতীর অঙ্গনে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। তাঁর প্রথম ধর্মমূলক গ্রন্থ 'মহাপ্রভুর কৃষ্ণ অভিসার' ধর্মপিপাসু মানুষের হৃদয়ের অমূল্য সামগ্রীরূপে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীভাগবতকথামৃত' নিজস্ব ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ—আনন্দের মধুধারা। ভাষার সৌন্দর্য, বর্ণনার মাধুর্য, বিষয়বস্তু পরিবেশনের নৈপুন্যে গ্রন্থখানি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি।

সাধু বাংলাগদ্যে রচিত ভাগবত বইমেলার বাজারে সংখ্যায় অত্যল্প। তাই

এমন সহজবোধ্য চলতি ভাষায় ভাগবতী কথা পরিবেশনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে এবং নানা সমস্যা কণ্টকিত বাঙালীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

গ্রন্থটির প্রারম্ভে গ্রন্থকার তাঁর নিবেদন ভূমিকায় এই ভাগবতকথা রচনার উদ্দেশ্যে এবং এই ধূলার ধরণীতে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের বিষয়ে সংক্ষেপে সব বিবৃত করেছেন।

ভাগবতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলির সরস বর্ণনায় গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে এবং স্বরচিত গীতিকবিতা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

সর্বপাপ ও তাপহারী শ্রীহরির নাম, রূপ গুণ ও লীলামাধুরী এবং মহিমা-প্রকাশক উপাখ্যানগুলির মধ্যে স্বরচিত ভক্তিমূলক কবিতা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থকার প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনীর শেষে তাঁর নিজস্ব সাধু মন্তব্যে কলিকালুষভরা মানুষের বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী অর্থাৎ ভগবন্মুখী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এবং ভগবৎকৃপালাভের সহজ উপায় যে ভগবানে ভক্তি, তা ভাগবতী কথা পরিবেশনের মাধ্যমে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভাগবতকথামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের বিষয় যথা মঙ্গলাচরণ উদ্দেশ্য পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, শুকদেবের শুভাগমন, দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও শুকদেব কর্তৃক ভাগবতকথারম্ভ মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করে তৃতীয় স্কন্ধে দিতিগর্ভস্থ শিশুর তেজে দেবতাগণের ভীতি, জয়-বিজয়ের অধঃপতন প্রভৃতি আখ্যান, হিরণ্যাক্ষবধ কপিলের মাতা দেবহূতিকে উপদেশ ইত্যাদি সংক্ষেপে সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ স্কন্ধে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, ধ্রুবের উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

পঞ্চম স্কন্ধে জড় ভরতের উপাখ্যান ও ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলের উপাখ্যান বৃত্রাসুরবধ ইত্যাদি কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম স্কন্ধে হিরণ্য-কশিপুবধ ও প্রহ্লাদচরিত বর্ণনা প্রভৃতি এবং অষ্টম স্কন্ধে সমুদ্র মন্থন, ভগবানের মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃত পরিবেশন, বলিরাজের যজ্ঞে বামনদেবের গমন ও ছলনা বর্ণিত হয়েছে চমৎকারভাবে।

নবমস্কন্ধে রাজা অম্বরীষের উপাখ্যান, সগররাজের উপাখ্যান প্রভৃতির সরস বর্ণনা পাঠকপাঠিকার মনকে আনন্দে পূর্ণ করে তুলবে।

প্রথম স্কন্ধ থেকে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত নানা উপাখ্যান ও কাহিনীর মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন অবতার রূপে এই ধরাতলে আবির্ভাব এবং দুর্বৃত্তদের নিধন করে ভক্তদের কৃপা করার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে গীতার অমোঘ বাণী—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।'

দশম স্কন্ধে লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে সুন্দর সাবলীল ভাষায়। শিশু গোপালের পুতনাবধ, মাতা যশোদা কর্তৃক দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, নবনীত ভক্ষণ ইত্যাদি লীলার মধ্যে যেমন বালগোপালের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে তেমনি ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মার মোহভঙ্গ, কালিয়দমন লীলায় প্রথমে খল কলিয়কে নিগ্রহ, পরে শান্তরসের ভক্ত কালিয়কে কৃপা প্রদর্শন সুন্দররূপে রূপায়িত হয়েছে এই গ্রন্থে।

অতঃপর বস্ত্রহরণপর্বে ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়ণী ব্রত আচরণ ও বস্ত্রহরণলীলায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে লেখনী পরিচালনা করা হয়েছে।

মধুবৃন্দাবনের বর্ণনায় লেখক বঙ্গপ্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য্য বর্ণনার উপাদানগুলি নিয়ে মনোহররূপে সাজিয়ে তুলেছেন বৃন্দাবনভূমিকে এবং আমাদের মনকে সজল বঙ্গ প্রকৃতি থেকে কল্লোলিনী যমুনাসেবিত মধুর বৃন্দাবনের সরস ভূমিতে নিয়ে গিয়ে এক অনাবিল আনন্দরসে আপ্লুত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

যদিও বৃন্দাবন তার নিজস্ব প্রাকৃতিক শোভা সম্পদে সর্বদা শোভমান তথাপি তার শ্যাম শোভা সহস্র গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল ব্রজ গোপাল শ্যামসুন্দরের মঞ্জু লীলামাধুরীতে এবং মধুময় সাহচর্য্যে। মধু বৃন্দাবনের কেবল গোপগোপী নয়, গাভী গোবৎস নয়, হরিণ হরিণী, ময়ূর ময়ূরী নয়, অন্যান্য পশুপাখী নয়, প্রতিটি লতাগুল্ম, ওষধি—এমনকি দূর্বাদল পর্য্যন্ত ধন্য হয়েছিল গোলোকের শ্রীহরি নন্দদুলাল ব্রজের রাখালরাজা ব্রজগোপালকে পেয়ে; তাঁর সুবর্ণ নূপুর শোভিত, বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত শিবাদিদেববন্দিত পাদপদ্মযুগলের কোমল স্পর্শ পেয়ে।

অতঃপর রাসলীলা বর্ণনা সার্থক রূপলাভ করেছে লেখকের ভাব, ভাষায়, ছন্দে, নৃত্যে ও গীতিমাধুর্যে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়াশক্তিকে (উপাশ্রিতঃ) অধিকরূপে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীগণের মিলনমাধুরীপূর্ণ রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে অনবদ্যরূপে।

রাসমণ্ডলে প্রতি দু'জন গোপীর মধ্যের এক একজন শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলাকারে নৃত্যরত দু'টি সুবর্ণমণির মধ্যে মহামরকত নীলমণির সমুজ্জল শোভা অনির্বচনীয়।

—'তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥' ভাঃ ১০।৩৩।৬

সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ যোগেশ্বরেশ্বর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ববিমোহন রূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি কৃষ্ণপ্রেমৈকতাৎপর্য্যময়ী মহাভাবস্বরূপিনী ব্রজগোপীগণের সাহচর্য্যে হয়ে উঠেছে সমুদ্ভাসিত।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায় থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়ী নামে খ্যাত। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী কেবল দশম স্কন্ধের নয়, সমগ্র ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ।

ভৌম বৃন্দাবনের প্রেক্ষাপটে রাসলীলা চিত্রিত হলেও আসলে এই লীলা চিন্ময় জগতের লীলা। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলনের এই মাধুর্য্যময়ী লীলা পরম ত্যাগের

লীলা। (নিবৃত্তিপরেয়ং রাসক্রীড়া)। সাধনায় সিদ্ধি ব্রজরামাগণ গৃহধর্ম, বেদধর্ম, সতীত্বধর্ম পতিব্রত্য ধর্ম এক কথায় সকল ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে গীতার উপদেশ মহাবাণী 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ভাগবতের রাসলীলার মধ্যে মূর্ত্তিমতী রূপ লাভ করেছে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের এই লীলায় আত্মনিবেদিত ভক্তগণের কেবল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আরতি জেলে ভগবানের সেবায় নিরাজন করা নয়, সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে সর্বারাধ্য ভগবানের পূর্ণরূপে সেবা করার মধ্যে জন্মজন্মান্তরের সাধনার পরম প্রসাদ —ভক্তাধীন ভগবানকে একান্ত নিজের করে পাওয়া—সাধনার চরম সার্থকতা লাভ।

এই রাসলীলার তাৎপর্য ও তত্ত্বমাহিমা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব। কেবল শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলনকারী রসিক ভক্তগণেরই তা আস্বাদনীয়।

লেখকের সুনিপুণ শব্দযোজনায় এবং স্বরচিত প্রাসঙ্গিক গীতাকবিতা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করায় রাসলীলার বর্ণনা যেমন আরো সরস ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে তেমনি লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা ও রাসলীলার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় হয়েছে প্রকাশিত।

রাসলীলার পরে অক্রুরের বৃন্দাবনগমন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় ধনুর্যজ্ঞে আগমন, কংসবধ সুন্দররূপে বর্ণিত। উদ্ধবের ব্রজে গমন ও গোপীগণের কৃষ্ণবিরহ বর্ণনা পাঠক পাঠিকাগণের মনে বিরহের সুর জাগিয়ে তুলবে। তারপর জরাসন্ধ বধ ও শিশুপাল বধের কাহিনীও ভূভারহরণের জন্য ভূমার ভূমিতে অবতরণ নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। দ্বারকালীলার বর্ণনা যেন গোলোকবর্ণন।

একাদশ স্কন্ধের মূল বিষয়গুলি তাত্ত্বিক, সহজবোধ্য নয়। তথাপি ভাগবত ধর্ম, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, চতুর্বিংশতি শিক্ষাগুরু, জীবের বন্ধন মুক্তি, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর লক্ষণ মোক্ষধর্ম প্রভৃতি বহু তাত্ত্বিক বিষয় সরল ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করে গ্রন্থকার যেভাবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

দ্বাদশ স্কন্ধে কলিধর্ম ও কলির আবির্ভাব প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অহেতুকী ভক্তি ভগবৎ কৃপালাভের উপায় বলে সংক্ষেপে বর্ণনা করে ভাগবতকথামৃত রচনার সমাপ্তিতে শ্রীহরির নাম সংকীর্তনই কলিহত মানুষের সকল পাপ ও তাপ নাশের সহজ পথ যে বলেছেন গ্রন্থকার, এবিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরম শ্রেয়। নাম ও নামী অভিন্ন জ্ঞানে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, স্মরণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির স্ফুরণ হয়। সত্ত্বগুণান্বিত চিত্ত স্বভাবতঃ দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্মল। সেই চিত্তদর্পনে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হল। কিন্তু আমাদের কামকলুষিত চিত্ত মলিন অস্বচ্ছ ও কুটিল। তাই তাতে সহজে নামের কৃপা হয় না। অকপটে শ্রীনাম স্মরণ করতে করতে মনের সেই মালিন্য দূর হয় 'কয়লাহৃদয় গলি হীরা হয়, তস্কর হয় সাধু'। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে

সংসার দাবানলে দগ্ধ মানুষের শান্তির বারিধারা বর্ষিত হয়। হৃদয়ে উথলে উঠে আনন্দসিন্ধু এবং প্রতিপদে আস্বাদিত হয় পূর্ণামৃত। করুণানিধান প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলির অল্পায়ু ও চঞ্চলমনা মানুষের পক্ষে ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির সহজ উপায় এই সুধাময় নাম সংকীর্ত্তন (নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।) বলে ঘোষণা ক'রে সকল শ্রেণীর মানুষকে ধন্য করেছেন।

এই 'শ্রীশ্রীভাগবতকথামৃত' গ্রন্থ সর্বসাধারণের ঘরে ঘরে স্থান লাভ করে সকলের সদ্‌জীবন লাভের সহায়ক হোক—এই কামনা করি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় পরমশ্রদ্ধাভাজন ভক্তপ্রবর ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের 'ফেলালব' টীকা সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের (দশম স্কন্ধ) সাহায্য গ্রহণ করেছি. সেজন্য তাঁর নিকট সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি এবং সেই সাধুগণ মহাভাগে শ্রীচরণকমলে জানাচ্ছি সভক্তি প্রণাম।

আর পরিশেষে ভাগবতকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রার্থনা জানাই—

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ ! নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো ॥
নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম ॥' ১২।১৩।২২-২৩

হে প্রভো ! হে দেবেশ্বর ! জন্মে জন্মে যাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তি জন্মে, আপনি অনুগ্রহ করে সেরূপ বিধান করুন, যেহেতু আপনি আমাদের নাথ। যাঁর নাম সংকীর্ত্তনে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সকল দুঃখ নিবারিত হয়, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

জয় গৌরহরি ! জয় গোপীনাথ !!

ভক্তজনকৃপাভিখারী
শ্রীভক্তিবিনোদ অধিকারী

সূচীপত্র

ষষ্ঠ স্কন্ধ

সপ্তম স্কন্ধ

অষ্টম স্কন্ধ

নবম স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ—

- মহাপ্রভুর কৃষ্ণ অভিসার
- আমি কৃষ্ণের কৃষ্ণ আমার
- শত কৌরবের শত কাহিনী

ভ্রমণ কাহিনী ঃ—

- সীমানা ছাড়িয়ে
- অপরূপ নীলাচল

উপন্যাস ঃ—

- ভুলি নাই প্রিয়া
- শ্বেত পায়রার ডানা
- নিষিদ্ধ সমাজ

নাটক ঃ—

- ভুলি নাই প্রিয়া
- রক্তে রাঙা দাসপুর
- বেইমান পৃথিবী
- বিদ্রোহী ভগবান
- শেষ বিচার
- রক্ত ঝরানো সিঁদুর
- সন্তান না শয়তান
- বিদ্রোহী ইরাবান
- রাজতিলক

• ভাগবত পরিচয় •

শ্রীশ্রীব্যাসদেবকৃত ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের সহজবোধ্য নয়। তাছাড়া অতি সহজ বাংলা গদ্যে এই ভাগবত অনূদিত হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তাই আজকের অগণিত ভক্তিরসপিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আমি সরল চলিত ভাষায় উক্ত গ্রন্থটির ভাববস্তু ব্যক্ত করতে চেষ্টা করলাম আমার এই শ্রীশ্রীভাগবতকথামৃত গ্রন্থে। মূল ভাগবতের আঠারো হাজার শ্লোকরূপ দধি মন্থন করে নবনীস্বরূপ এই গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম।

* * *

বিংশতাব্দী শেষ হয়ে আসছে। তার বিদায় বেলায় মানুষ হয়ে উঠেছে কর্মব্যস্ত। সংসার যাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হচ্ছে আর ছট্‌ফট্‌ করছে জ্বালা-যন্ত্রণায়। তাদের অবসর যাপনের সময় ও সুযোগ খুব কম। সেই যন্ত্রণাদিগ্ধ মানুষের হৃদয়ে শান্তির অমিয় ধারা ছিটিয়ে দিতে বিশেষতঃ ভাগবতের সারকথা জানার জন্য উৎসুক মানুষদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করলাম শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃত গ্রন্থখানি।

ভাগবতের বারোটি স্কন্ধই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলারসে পরিপ্লাবিত। শ্রীকৃষ্ণ মানবশিশুরূপে মথুরার কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর গোকুলে ও বৃন্দাবনে বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করে মথুরায় এসে নিধন করলেন মহারাজ কংসকে। এরপর চলে গেলেন দ্বারকায়। সেখানে বহুবর্ষ প্রজাপালন করে অবশেষে করলেন লীলা সংবরণ। এটাই ভাগবতের মূল আখ্যানভাগ। এই আখ্যানভাগগুলি যুগযুগান্তরব্যাপী মানুষকে দিয়েছে শান্তি, তাঁদের মনে এনে দিয়েছে ধর্মবিশ্বাস আর গভীর আত্মপ্রত্যয়। শ্রীমদ্ভাগবত যেন 'তৃষ্ণার শান্তি যেন নিখিল সংসারের সন্তাপভঞ্জন'।

অতীতের সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষাবিদদের কত চিন্তার ধারা আর শত শত মুনি ঋষিদের কত উপদেশমূলক সারগর্ভ বিচিত্র কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। ভাব ও ভাষার ছন্দে ছন্দে তৃপ্তির আনন্দ, তথা আর সংলাপে আছে প্রেমরসের অমৃতধারা। তাইতো ভাগবত মহিমা আজ ভারত মহিমাতে পর্যবসিত। ভাগবত ভারতের নিজস্বঃসম্পদ, ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের মহান গৌরব।

এই ভাগবত প্রসঙ্গে ব্যাসদেবের সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার। কে এই ব্যাসদেব?

মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি। শক্তি যখন ঋষি কল্মাষপাদের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাঁর একমাত্র পুত্র পরাশর ছিলেন মাতৃগর্ভে। মাতা অদৃশ্যন্তী এবং পিতামহ বশিষ্টদেবের রক্ষণাবেক্ষণে পরাশর ক্রমে হয়ে উঠলেন মহাপণ্ডিত।

সেটা ছিল দ্বাপরযুগ।

একদা পরাশর মুনি নদী পার হবেন। খেয়ানৌকা চালাচ্ছে এক ধীবরের পালিতাকন্যা—মৎস্যগন্ধা। মৎস্যগন্ধার রূপে চাঞ্চল্য উপস্থিত হল পরাশরের। ভেঙ্গে গেল তাঁর ধৈর্যের বাঁধ। মন্ত্রপ্রভাবে দিঙ্‌মণ্ডলীকে কুয়াশাবৃত করে দিলেন। তারপর মিলিত হলেন ঐ কন্যার সাথে। পরাশরের স্পর্শে ঐ কন্যার গায়ের মৎস্য-গন্ধ দূর হল। মৎস্যগন্ধা রূপান্তরিত হল পদ্মগন্ধায়। তারপর তাঁর কোলে জন্ম-নিলেন ব্যাসদেব।

[এই পদ্মগন্ধাই সত্যবতী। শান্তনু একে বিয়ে করেছিলেন।]

ব্যাসদেবের পূর্ণনাম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। যমুনা নদীর দ্বীপে জন্মেছিলেন বলে তিনি দ্বৈপায়ন। বেদকে (মন্ত্র-গীত-কাহিনী-স্তোত্র) চারভাগে ভাগ করেছিলেন বলে তিনি বেদব্যাস। তাঁর গায়ের বর্ণ কালো ছিল—তাই তিনি কৃষ্ণ। তাঁর পিঙ্গলবর্ণ দাড়ি ও সুবৃহৎ জটা এবং চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত ছিল। কালক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন মহাপণ্ডিত। তারপর রচনা করলেন অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত। এছাড়া তিনি আঠারোখানা পুরাণও লিখে গেছেন।

তবু তাঁর মনে ছিল না শান্তি। ছিল না তৃপ্তি। তাঁর লেখার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। বসে বসে একা ভাবছেন নিজের আশ্রমে। মুখ তাঁর ম্লান। শ্রীভগবানের লীলাখেলার মধ্যে কোথায় যেন শূন্য রয়ে গেছে।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত। ব্যাসদেবকে বিমর্ষ দেখে নারদ তাঁকে শ্রীহরির গুণ ও লীলা বর্ণনা করতে উপদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে ব্যক্ত করলেন শ্রীভগবানের শত শত বিচিত্র রহস্যময় কাহিনী। ব্যাসদেবও অতীব প্রীত হয়ে দেবর্ষিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখালেন। দেবর্ষি তখন স্বীয় পূর্বজন্মের একটি বৃত্তান্ত না বলে থাকতে পারলেন না।

নারদ বললেন—"কোনও এক জন্মে আমি ঋষিগণের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি। যখন আমার বয়স পাঁচ বছর তখন কয়েকজন ঋষির সেবায় নিযুক্ত হলাম। আমি সর্বদা তাদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করতাম। এই অন্ন ভোজনের ফলে আমার পূর্বজন্মের পাপ দূর হল এবং সেই ঋষিগণের মুখে হরিকথা শুনে ভগবানের প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হল। মন হয়ে উঠল চঞ্চল। আমি ভগবৎ বিরহে হয়ে উঠলাম কাতর। তারপর উম্মাদ হয়ে পড়লাম সংসার ছেড়ে শ্রীহরির সন্ধানে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু মাতার স্নেহ-মমতা আর প্রীতি বাৎসল্য ছেড়ে যেতে পারলাম না। অবশেষে একদা সর্পাঘাতে মাতার মৃত্যু হয়। মাতৃবিয়োগকে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ মনে করে উত্তরাভিমুখে গমন করতে লাগলাম।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমি ক্লান্ত হয়ে একটি বৃক্ষের তলায় করলাম উপবেশন।

চক্ষুতে সামান্য একটু তন্দ্রা উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরটা হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত। তৎক্ষণাৎ চেয়ে দেখলাম, শ্রীহরি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত।

আহা! সেই রূপময়ের কী অপূর্ব রূপ! মুখ দিয়ে আর কোন কথা উচ্চারণ করতে পারলাম না। সারা বুকটা তখন আমার কাঁপছে। তাঁর সেই প্রাণ আকুল করা রূপে আর জ্যোতিতে আমি নিমেষেই নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। সেই জ্যোতি—সামান্য আলোর শিখা নয়—সে জ্যোতি অসামান্য—অভূতপূর্ব—

নবীন জলদশ্যাম ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
পীতাম্বর পরিহিত অতি মনোহর॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বদন।
চন্দ্রমুখে কিবা শোভা বঙ্কিম নয়ন॥

আমার স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী বনমালী হরি আমাকে করলেন আশীর্বাদ। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যশরীর ধারণ করে আমি চলে গেলাম নিত্যধামে।"

অতএব হে ঋষিবর! তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, নামস্মরণ, নাম শ্রবণ আর কীর্তনের একমাত্র পরিণতিই হচ্ছে আমাদের পরমপুরুষের প্রতি অচলাভক্তি। তাই আপনি ভক্তিসহকারে অতিসত্বর মৎকথিত ভগবানের লীলা কাহিনী রচনা করতে আরম্ভ করুন। এতে আপনার মনের তৃপ্ত হবে। আমার পিতৃদেব প্রজাপতি ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট হবেন। কারণ আমি পিতার কাছ থেকে এইলীলা কাহিনী শুনেছি।

নারদের মুখে এইসব কথাশুনে ব্যাসদেব শ্রীভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং গ্রন্থ রচনা করে স্বীয়পুত্র শ্রীশুকদেবকে তা অধ্যযন করালেন।

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব। সংসারে এসে মায়াবিষ্ট হওয়ার ভয়ে শুকদেব মাতৃ-গর্ভ থেকে কিছুতেই ভূমিষ্ট হতে চান না। তাই মায়ের জঠরেই তার ষোড়শ বছর কেটে গেল। গর্ভভারে নিপীড়িতা স্ত্রীর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে ব্যাসদেব ধ্যানের দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ট হতে আদেশ দিলেন। তখন সেই শিশু গর্ভে থেকেই পিতার কাছে বর চাইলেন যেন সংসারের মায়ামোহ তাকে বিমোহিত করতে না পারে।

ব্যাসদেব 'তথাস্তু' বলে পুত্রলাভে অপেক্ষা করতে থাকলে শুকদেব তৎক্ষণাৎ মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হন এবং গৃহত্যাগ পূর্বক অনির্দিষ্ট পথে গমন করতে লাগলেন। ব্যাসও ছুটে চললেন পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে।

এক সরোবরে অপ্সরাগণ নগ্নদেহে স্নান করছিল। উলঙ্গ ষোড়শবর্ষীয় শুকদেব সেই জলাশয়ের তীর দিয়ে গমন করছিলেন কিন্তু যুবতীগণের স্নানকার্যে কোন ব্যাঘাতের লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর পুত্র অনুসরণকারী বৃদ্ধ ব্যাসদেব যখন সেখানে উপস্থিত হলেন তখন যুবতীগণ লজ্জা নিবারণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। বৃদ্ধ ব্যাসদেব বিস্মিত হয়ে ভাবছেন—যুবককে দেখে রমণীগণ লজ্জা প্রকাশ করল না অথচ তাকে দেখে স্ত্রীসুলভ লজ্জা প্রদর্শন করছে। ব্যাসদেবের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য রমণীগণ উত্তর দিল,—"শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞ, সংসারের মায়ামোহের ঊর্ধ্বচারী,

তার স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান নেই, তাই তাকে দেখে আমাদের লজ্জা আসেনি। কিন্তু আপনি স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।"

লজ্জিত হলেন ব্যাসদেব। তিনি সেখান থেকে দ্রুত চলে গেলেন। তারপর পুত্রকে ধরে এনে পরম যত্নসহকারে ভাগবত শ্রবণ করালেন।

এই ভাগবত কথা কণ্ঠে নিয়ে শ্রীশুকদেব গঙ্গাযমুনার মিলনক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থের বিস্তৃর্ণ তটভূমিতে গঙ্গাতীরে বসে কলিযুগ আরম্ভ হওয়ার ত্রিশ বছর পরে ভাদ্র মাসের শুভশুক্লা নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই সাতদিন তিনি শ্রীভাগবত কীর্তন করেন। [কোন কোন গ্রন্থে আছে—ব্রহ্মশাপগ্রস্থ রাজা পরীক্ষিতের কক্ষে শুকদেবের আগমন ও ভাগবত কথন হয়।]

শ্রীশুকদেব ভাগবত বর্ণনা করছেন। সভামণ্ডপ মুনি ঋষি ও রাজর্ষিতে পূর্ণ। শ্রীউগ্রশ্রবাসূত অতি দূরে বসে এই ভাগবত কথামৃত শ্রবণ করছিলেন। হঠাৎ সূতমহাশয়ের প্রতি শ্রীশুকদেবের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। হস্ত কৃতাঞ্জলিবদ্ধ, আয়ত নয়ন যুগলে নিমেষ নাই, দেহ চিত্রের ন্যায় ধীর স্থির—গুরুদেবের মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। যখন শুকদেবের কথা শেষ হল, তখন ঋষিদের চমক ভাঙল। তাঁরা ভাবলেন, এমন একটি অপূর্ব বস্তু জগতে থাকবে না! এই শুকদেবতো স্বৈরবিহারী, কোথায় কখন চলে যাবেন তার স্থিরতা নেই। তাহলে এই অমূল্য রত্ন রক্ষার উপায় কি?

ঋষিগণের মুখে নীরব প্রশ্ন চিন্তায় মগ্ন হয়ে উঠেন তারা। তখন অন্তর্যামী শুকদেব তা জানতে পেরে মৃদুহাস্যে শ্রীউগ্রশ্রবার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করে বললেন—"এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নিমিষালয়ে।" মানে—এই উগ্রশ্রবার কাছে সমস্ত ভাগবত রেখে গেলাম। এব নিকট থেকে আপনারা সবই পাবেন।

সত্য সত্যই সূত উগ্রশ্রবার নিকট সমস্ত ভাগবত রয়ে গেল। জগতে এমন শ্রুতি-ধর আর কেউ আছেন কিনা জানি না। এমন কি শ্রীশুকদেব কখন হেসেছিলেন, কখন কি ভঙ্গী করেছিলেন, কখন কিভাবে কোন শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন—কিছুই বাদ যায়নি। সবই মনে রেখেছিলেন শ্রীউগ্রশ্রবাসূত।

উগ্রশ্রবা রোমহর্ষণ মুনির পুত্র। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান। তথাপি অসামান্য স্মরণশক্তির অধিকারী। মুনি ঋষিরা কোনদিন ধারণা করতে পারেননি যে সামান্য একজন সূতপুত্র এমন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। এই শ্রুতিধর পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যে বহুকাল অনুষ্ঠিত যজ্ঞে শৌনকাদি সহস্র সহস্র ঋষির নিকট ভাগবতকথা বিশ্লেষণ করেছিলেন। উগ্রশ্রবা বর্ণসংকর হয়েও আজ সহস্র সহস্র মানুষের প্রণম্য। তাই জন্মের দ্বারা মানুষ বড় হতে পারে না, বড় হয় কর্মে।

দিন যায়। একের পর এক মাস বিদায় নেয়। সূত উগ্রশ্রবা শ্রীভাগবত বহন করে একদা নৈমিষারণ্যের শৌনকাদি ঋষিগণের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন এবং ঋষিগণের

প্রার্থনা শুনে সেইস্থানে ভাগবত কীর্ত্তন করলেন। এইরূপে ভাগবত কথা জগতে প্রচার হল।

তবে এই ভাগবত প্রচারের মূলে আছেন পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ যদি না শাপ-গ্রস্ত হয়ে গঙ্গারতীরে প্রয়োপবেশন করতেন তাহলে শ্রীশুকদেব আবির্ভূত হতেন না তাঁর কাছে। আর শুকদেব না এলে সূত উগ্রশ্রবাও এসব জানতেন না। ভাগবত কথা অন্তহীন অন্ধকারেই রয়ে যেত।

অতএব মহাভাগবত রাজা পরীক্ষিতের বুদ্ধিবৈক্লব্য, ব্রহ্মশাপ, শ্রীভাগবত প্রচার সবই বিধির বিধান। অমোঘ ব্রহ্মশাপের সম্মুখে পরীক্ষিতের আয়ুকে কেউ রোধ করতে পারলেন না। একটি ফলের মধ্যে কীটরূপী তক্ষকের আঘাতে রাজা প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু শুককৃপার ফলে তাঁর যশ, শ্রী, ইহলোক পরলোক সমস্তই রক্ষা পেল। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে ঋষির বজ্রবাক্য বরমাল্যসম নিজমস্তকে গ্রহণ করে জগতে শ্রীভাগবত কথা প্রচার করতে সাহায্য করে গিয়েছেন। পরীক্ষিতের এই আত্মবিসর্জন শ্রীমদভাগবত কথা প্রচারের মূল স্তম্ভস্বরূপ।

শ্রীভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাই এর পূজা করে থাকেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধ শ্রীভগবানের দ্বাদশটি অবয়ব। পদ্মপুরাণে আছে—

> স্বকীয়ং যদ্ভবেৎ তেজস্তচ্চ ভাগবতেঽধাৎ
> তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্।
> তেনেয়ং বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষাবর্ত্ততে হরেঃ
> সেবনাৎ শ্রবণাৎ পাঠাৎ দর্শনাৎ পাপনাশিনী।।"

—ভগবান তাঁর আপন তেজ ভাগবতে রেখে সেই ভাগবত সমুদ্রেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। সেইজন্য এই ভাগবত শ্রীহরির প্রত্যক্ষ বাঙ্‌ময়ী মূর্তি। এর সেবা, শ্রবণ, পঠন বা দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয়। যেখানে ভাগবত পাঠ হয় সেখানে গঙ্গা যমুনাদি সমস্ত তীর্থ বিরাজ করে। ভক্ত, ভগবান ও তীর্থের সম্মিলনে সেই স্থান পরম পবিত্র হয়ে যায়।

> যেই স্থানে সদা হয় ভাগবত পঠন।
> সেই স্থানে শ্রীহরি করেন গমন॥
> ভাগবত শ্রবনে হয় পাপের বিনাশ।
> দুঃখ জ্বালা দূরে গিয়ে পূরে মনের আশ॥
> একমনে যেই জন ভাগবত পড়ে।
> স্বর্গীয় আনন্দেতে তার গৃহ ভরে॥
> কায়মনে ভাগবত পূজা করে যেই জন।
> মৃত্যু পরে বৈকুণ্ঠ ধামে করেন গমন॥

শুদ্ধানুরাগী বক্তা (যারা অর্থের আশায় ভাগবত পাঠ করেন না) এবং শ্রদ্ধাবান শ্রোতার সম্মিলনে শ্রীমদ্ভাগবত পঠন ও শ্রবণ সফল এবং সার্থক হয়ে থাকে। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতিহি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ ১০।১।১৬

—নারায়নদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করে থাকে—সেইরূপ শ্রীভাগবত কথা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তা, বক্তা এবং শ্রোতা—এই তিন জাতীয় ব্যক্তিকেই সমানভাবে ধন্য ও পবিত্র করে।

অতএব হে ভক্তপাঠকবৃন্দ! আপনারা সবান্ধবে আমার এই ভাগবত আলোচনার আসরে সাড়া দিন আসুন, সবাই একত্রে মিলিত হয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করি এবং সেই সঙ্গে জগতের একমাত্র সত্যবস্তু পরমেশ্বর কৃষ্ণেরই ধ্যান করি। সত্যং পরং ধীমহি।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি।

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● সূত উগ্রশ্রবার ভাগবত প্রচার ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যাঁদের কৃপায় দেখি বিচিত্র সংসার ।
সেই পূজ্যজন পদে কোটি নমস্কার ॥
সর্ব্ব অগ্রে পূজ্য সেই জনকজননী ।
মস্তকে রাখিনু দোঁহা চরণ দুখানি ॥

সেই সাথে লহ নতি যত দেবগণ ।
কৃপা কর এই গ্রন্থ করিতে রচন ॥
দয়া কর মা সারদা পূর্ণ কর আশ ।
ভাগবত রচি পূর্ণ হোক অভিলাষ ॥

জন্মাদস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ (১।১।১)

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও মোক্ষ যা থেকে হয়ে থাকে, যিনি 'স্বরাট' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেছিলেন, সেই "সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" অর্থাৎ সেই স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান করি ।

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ সহস্র বছর ব্যাপী যজ্ঞ করছিলেন, এমন সময় উপস্থিত হলেন রোমহর্ষণপুত্র সূত উগ্রশ্রবা । সূত মানে একশ্রেণীর সুগায়ক ও সুবক্তা মুনি । এঁরা একবার যা মন দিয়ে শুনেন তা মুখস্থ হয়ে যায় । তাই এদের বলা হয় শ্রুতিধর । ঋষিগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়ে উগ্রশ্রবাসূত মহাশয় সুখাসীন হলে শৌনক ঋষি বললেন—হে মহাভাগ ! কলির জীব সাধারণত অলস, অল্পবুদ্ধিও অল্পায়ু । আবার সেই অল্পপরমায়ুই বৃথাকর্ম ও অলস নিদ্রায় কেটে যায় ।

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্যবয়ো নন্দায়ুষশ্চবৈ ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥ (১।১৬।১০)

তাছাড়া এই কলিকালের মানুষেরা অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, হতভাগ্য এবং রোগাদি দ্বারা পীড়িত ও জর্জরিত । তাতে আবার বিভিন্ন প্রকার কর্মে তারা সর্বদা ব্যস্ত । অতএব হে সাধু ! যাতে আমরা অতি অল্প আয়াসে পরমদয়াল প্রাণগোবিন্দের

কথা বুঝতে পারি এবং যাতে তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি আসে ও কলির আপামর জীবের মঙ্গল হয় তা কৃপা পূর্বক বলুন। আপনার মুখনিঃসৃত সুললিতবাণী শুনে আমাদের পাপতাপক্লিষ্ট হৃদয় যেন শান্তি পায়।

হে মুনিপুঙ্গব! অনুপম হরিকথা করিতে শ্রবণ।
অভিলাষী হইয়াছি মোরা ঋষিগণ॥
ভগবান লীলাক্রমে আপন মায়ায়।
যে যে রূপে অবতীর্ণ হইলা ধরায়।
সেইসব পুণ্যকথা অতি মনোহর।
আমাদের কাছে আজ কহ মুনিবর॥
নাহি তৃপ্ত হই মোরা নাম মাত্র শুনি।
কহ তাব লীলা সব ওহে মহামুনি॥

সূত উগ্রশ্রবা তখন বললেন, আপনারা অতি উত্তম প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। ভগবৎকথায় আপনাদের অশেষ প্রীতি দেখে আমি খুবই আনন্দিত। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। ভগবৎকথায় প্রীতি না থাকলে সকল অনুষ্ঠানই বৃথা। সমস্ত বস্তুতে সমস্ত কর্মে ভগবান বাসুদেব বিরাজমান। সকল বেদের প্রতিপাদ্য বাসুদেব, সকল যজ্ঞের লক্ষ্য বাসুদেব, সকল যোগের লভ্য বাসুদেব ও সকল ক্রিয়ার গতি বাসুদেব জ্ঞান-তপস্যা ও ধর্ম বাসুদেবেই নিহিত। তিনিই জীবের একমাত্র গতি।

বাসুদেব—পরাবেদাঃ বাসুদেব পরমখাঃ।
বসুদেব—পরোধর্মঃ বাসুদেব পরাগতি॥ ১।২।২৮
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ।
বাসুদেব পরোধর্মঃ বাসুদেব পরা গতি॥ ১।২।২৯

—বাসুদেবই সমগ্র বেদের একমাধ প্রতিপাদ্য বিষয়, যজ্ঞ সকল বাসুদেবের তুষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত। যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ বাসুদেব প্রাপ্তির জন্যই বিধেয় এবং আশ্রমোক্ত কর্মসকলও বাসুদেবেই অর্পিত হয়ে থাকে। বাসুদেব সম্বন্ধে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বাসুদেব প্রাপ্তিই তপস্যার উদ্দেশ্য, দান ব্রতাদি ধর্ম বাসুদেবের জন্যই অনুষ্ঠিত এবং সেই বাসুদেবই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ গতি। অতএব যিনি বাসুদেবকে জানতে পেরেছেন তাঁর আর করণীয় কিছুই নেই।

সেই পতিতপাবন বাসুদেবের বিভিন্ন অবতারের কথা আপনারা অতি ভক্তিসহকারে এবার অনুধাবন করুন।

● অথ অবতার কথা ●

উগ্রশ্রবা বলতে আরম্ভ করলেন—

সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান মানবসৃষ্টির জন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও মন—এই ষোলটি অংশে রচিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই পরম

পুরুষ বিষ্ণু যখন মহাসমুদ্রে যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলেন তখন তাঁর নাভিকমল থেকে জন্ম হয় ব্রহ্মার।

পরম পুরুষ বিষ্ণুই হলেন সমস্ত অবতারের উৎসস্থল। সাধারণতঃ দশটি অবতারের কথা আমরা জানি। কিন্তু ভাগবতে ২৪টি অবতারের কথা ছাড়া আরো অসংখ্য গৌন অবতারের কথা বলা হয়েছে। তবে আসল অবতার হচ্ছে ২৪টি। (১) সনকু সনন্দাদি (২) বরাহ (৩) নারদ (৪) নর ও নারায়ণ (৫) কপিলমুনি (৬) দত্তাত্রেয় (৭) যজ্ঞ (৮) ঋষভ (৯) পৃথু (১০) মৎস্য (১১) কূর্ম (১২) ধন্বন্তরি (১৩) মোহিনী (১৪) নৃসিংহ (১৫) বামন (১৬ পরশুরাম (১৭) ব্যাসদেব (১৮) রামচন্দ্র (১৯) বলরাম (২০) কৃষ্ণ (২১) বুদ্ধ (২২) কল্কি (২৩) হয়শীর্ষ (২৪) হংস। এইসব অবতারই শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।"

ভগবান বাসুদেব যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্যপীড়িত লোকসমূহকে রক্ষা করেন। এই বাসুদেবই—

বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
কল্কিরূপে আসিবেন কল্যাণের তরে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

● শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণন ●

হরিকথা একমনে করিলে শ্রবণ।
হরি তার সখারূপে আবির্ভূত হন।

পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীহরির বিভিন্ন অবতারের কথা শ্রবণ করে শৌনকাদি ঋষিগণ অতীব বিস্মিত হলেন এবং সূতে উগ্রশ্রবাকে শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। তখন মুনিবর উগ্রশ্রবা বললেন—

স্বর্গ আদি লাভ তরে ধর্ম অনুষ্ঠান।
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় হরিগুণ গান॥
স্বার্থশূন্য হরিভক্তি শ্রেষ্ঠ সবাকার।
জীবের পরমধর্ম সংসার মাঝার॥
কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞানলাভ করে জীবগণ।
বৈরাগ্য উদয় হয় শুদ্ধ হয় মন॥
ধর্মবলে যাহা কিছু পরিচিত হয়।
হরিভক্তি শূন্য হ'লে ব্যর্থ সমুদয়॥
ধর্মের লাগিয়া যত কর আয়োজন।
হরিভক্তি শূন্য হলে সব অকারণ॥

হরির নাম স্মরণ করতে করতে পথ চললে হরি সহায় হন। হরি সখারূপে তাঁর ভক্তকে সর্বকর্মে সাহায্য করেন। আমরা হয়ত তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারি না কিন্তু তাঁর উপর জীবন সমর্পণ করলে তিনি নিশ্চয়ই করুণা করবেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীহরি সর্বদা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত। আমরা যখন একমনে অন্তর দিয়ে তাকে ডাকব কিংবা তাঁর উপর নির্ভরশীল হব তখন তিনি নিশ্চয়ই দয়া করবেন ; তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

—যে সকল ভক্ত অনন্যমনে নিত্যযুক্ত হয়ে আমার ভজনা করেন তাদের দেহাদি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু আমিই বহন করে থাকি। (অলব্ধ বস্তুর সংস্থানকে যোগ আর লব্ধ বস্তুর রক্ষণকে ক্ষেম বলে।) তিনি আরও বলেছিলেন—আমার পূজায় বহুব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। আমি ভাবের ভিখারী আর ভক্তির কাঙাল। গভীর ভালবাসাতে আমি ভক্তদের কাছে ধরা দিই।

আমি তোমাকে ভালবাসি—এটা শুধু মুখে বললেই হয় না। অন্তর দিয়ে ভালবাসতে হবে। অন্তর দিয়ে ভালবাসার সময় চক্ষু অশ্রুজলে ভরে যাবে আর কণ্ঠ কান্নাবিজড়িত হয়ে উঠবে। ভক্তি আর ভালবাসাতে চাই রাত্রি জাগরণ, চাই কান্না, চাই বিরহ। যে ভালবাসায় চোখের জল পড়ল না সে কিসের ভালবাসা? যে প্রেমে রাত্রি জাগরণ হল না সে কিসের প্রেম আর যে ভক্তিতে বিরহ যন্ত্রণা নেই সে তবে কিসের ভক্তি—কিসের অনুরাগ?

এই অনুরাগ বা ভালবাসা আসবে কোত্থেকে? আসবে হরিকথা শ্রবণ থেকে।

শ্রদ্ধাসহ হরিকথা করিলে শ্রবণ।
অনুরাগে পূর্ণ হয় মানবের মন ॥

হরিকথা শ্রবণে মানুষের রজঃ ও তমঃ গুণ দূরীভূত হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও মাৎসর্য পলায়ন করে। মনের মধ্যে সত্ত্বগুণ আসে। মানুষ তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জ্ঞানীজন আত্মার দর্শন পান। দূর হয় আমিত্ব—দূর হয় মনের সংশয়। আর—

অনায়াসে ক্ষয় তার হয় কর্মফল।
যে জন হরির নাম শুনে অবিরল ॥
বেদ যজ্ঞ যাগ দান তপস্যা ধরম্।
একমাত্র নারায়ণ সবার চরম ॥
বাসুদেব ভিন্ন ভবে নাহি অন্য গতি।
বুঝিয়া করহ কার্য যতেক সুমতি ॥

এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের মানুষীলীলা এতই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী যে, নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী (যিনি সকল প্রকার কর্ম থেকে বিরত) আত্মারাম শ্রীশুকদেব

সমগ্র বিষয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করেও আনন্দ সহকারে শ্রীভাগবত শ্রবণ ও বর্ণনা করেছিলেন। কারণ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥ ১।৭।১০

—যে সকল মুনিগণ আত্মারাম, অর্থাৎ যাঁদের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাঁরাও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন—এমনই ভগবানের আকর্ষণী শক্তি ও গুণ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই শ্লোকের ১১টি পদের সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। এগারটি পদ হচ্ছে—(১) আত্মারামাঃ (২) চ (৩) মুনয়ঃ (৪) নির্গ্রন্থাঃ (৫) অপি (৬) উরুক্রমে (৭) কুর্বন্তি (৮) অহৈতুকিম্ (৯) ভক্তিম্ (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ (১১) হরিঃ।

'আত্মারাম' বলতে যিনি আত্মাকে রমণ করেন,। 'আত্মা' শব্দে সাতটি অর্থ বুঝায় (১) ব্রহ্ম (২) দেহ (৩) মন (৪) যত্ন (৫) ধৃতি (৬) বুদ্ধি (৭) স্বভাব। 'রাম' শব্দের অর্থ যিনি রমণ করেন।

মুনয়ঃ বা মুনি শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমহাপ্রভু বলেন—যাঁরা মননশীল তাঁদের মুনি বলে। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যাঁরা মৌনব্রত অবলম্বন করেন—তারাই মুনি।

'নির্গ্রন্থ' শব্দে অবিদ্যাগ্রন্থমুক্ত বা মোহবন্ধন মুক্ত বুঝায়। আবার নির্গ্রন্থ বলতে—যিনি শাস্ত্রের বিধি নিষেধ জ্ঞানহীন।

'উরুক্রম' শব্দে অসীম শক্তিমান পুরুষকে বুঝায়। 'ক্রম' শব্দে পদক্ষেপ আর 'উরুক্রম' অর্থে যিনি অসীম দূরদেশে পদক্ষেপে সক্ষম। যেমন—বামনদেব। ইনি দুইপদক্ষেপে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করেন।

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্য সদনাদুরুকম্পয়ানম্॥

—কেউই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি পরিমাপ করতে পারে না। জগতের সকল অনুকণা কারো পক্ষে গণনা করা সম্ভব হলেও শ্রীভগবানের বিভিন্ন শক্তির পরিমাপ করা তার সাধ্যাতীত। শ্রীভগবানের পরাক্রম এমনই যে বামনরূপে তিনি পাতাল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অতিক্রম করেন।

'কুর্বন্তি' মানে অন্যের জন্য কর্ম করা। এখানে স্বখের জন্য কর্ম করাকে 'কুর্বন্তি' বলা হয়েছে।

বিভিন্নপ্রকার ভোগ থেকে বিরত থাকার যে অবস্থা হয় তাকে 'অহৈতুকী' বলে।

'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়, যার কাছে ব্রহ্মানন্দ তৃণের সমান। আর 'গুণ'

বলতে কৃষ্ণের অনন্ত দিব্যগুণকে বোঝায়। এই গুণ দ্বারা তিনি সবাইকে আকর্ষণ করেন।

'হরি' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবান ভক্তদের জীবনের সমস্ত অশুভ বস্তু অপহরণ করেন এবং অখণ্ড প্রেম দিয়ে ভক্তের মন হরণ করেন।

'অপি' এবং 'চ'—এ দুটি অব্যয়। 'চ' মানে এবং আর 'অপি' মানে ও।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অদ্বিতীয় তত্ত্ব কিন্তু তিনি বিবিধ কলার মাধ্যমে প্রকাশিত। বিধিভক্তি অনুশীলনকারী ভক্তগণ তাঁর ভজন করে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন আর রাগমার্গে ভজনকারী ভক্তগণ তাঁর ভজনা করে কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন। বিধিভক্তি মানে শাস্ত্র বিধি-সম্মত ভগবৎ সেবা আর রাগমার্গ মানে শুদ্ধ প্রেমময় ভগবৎসেবা।

কিন্তু সব দিক দিয়েই ভক্তি চাই। ভক্তি ছাড়া কোন গতি নাই। ভক্তিহীনের ভজন বৃথা। অজাগলস্তন দলন ও পেষনের মতই নিষ্ফল।

"অতএব কৃষ্ণমূল জগত কারণ।
প্রকৃতিকারণ যৈছে *অজাগলস্তন ॥"

'অজাগলস্তন' মানে ছাগীকণ্ঠস্থিত স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড ; নিষ্ফল বস্তু।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● শুকদেবের উপদেশ ●

কামাদি দারুণ রিপু করি পরিহার।
হরিময় দেখ সদা এ ভবসংসার ॥
যেই দেখে দুই চোখে সব হরিময়।
অন্তিমেতে বিষ্ণুপদে ঠাঁই তার হয় ॥

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে আসীন পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ, আপনার আয়ুষ্কাল এক সপ্তাহমাত্র। তাই পরলোকের জন্য যা করা দরকার, এখুনিই তা করে ফেলা উচিৎ। পবিত্র চিত্তে ওঁ মন্ত্র জপ করুন। এই মন্ত্র জপতে জপতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হবে। আর ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হলে জীবনে পরম শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করবেন। মৃত্যুর ভয় আসবে না।

শুকদেব আরো বললেন যে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির দীর্ঘজীবন সম্পূর্ণ বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ জীবন তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর, যাঁরা সচেতনভাবে ভগবৎ চিন্তায় দিনাতিপাত করেন। শতবর্ষ ভোগসুখে অপব্যয়িত করে যদি কোনও ব্যক্তি আয়ুর শেষ দিনটুকু ভগবৎ আরাধনায় অতিবাহিত করতে পারে তা হলে সেই এক-দিনের মূল্য ও সার্থকতা ভোগসুখ ব্যয়িত শতবর্ষ অপেক্ষা অধিক।

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটেত শ্রেয়সে যতঃ॥ ২।১।১২

—এ সংসারে দেহাদি বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তির ভগবৎচিন্তারহিত বহুবর্ষ পরমায়ু লাভে কোন ফল নাই। পরন্তু "এইটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা যেন বৃথা না যায়"—এই প্রকারে জ্ঞাত মুহূর্ত্তকালও শ্রেষ্ঠ। কারণ সেই মুহূর্ত্ত শুভচিন্তায় অতিবাহিত হলে অশেষ মঙ্গল হয়।

অতএব হে মহারাজ, সামনের এই কয়েকটা দিন আপনি নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করুণ। আপনার ঐ দুর্লভ মানবজনম সার্থক হবে। মৃত্যু একটা বৃহৎ সত্য—সংসারী মানুষ এটা মনে রাখে না বলেই সংসারে তাদের যত অনর্থ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সংসারী মানুষ মৃত্যুর কথা বিস্মৃত হয়ে থাকে বলেই এই পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি, অত্যাচার, দম্ভ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়। মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে দমন করতে হলে মৃত্যু সম্বন্ধে সচেনতা সর্বদাই প্রয়োজন।

মৃত্যু দুই প্রকার। একটি সম্মানের মৃত্যু, অপরটি অপমানের মৃত্যু। ভগবৎ চিন্তাশীল মানুষ মৃত্যুকে আগত দেখে তাকে সাগ্রহে বরণ করতে উদ্যত হন। মৃত্যু যেন তাকে অপমান না করে, তিনি সহজে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুর সাথে অনন্ত লোকে যাত্রা করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে 'মৃত্যু হেথা অমৃতের সেতু'। এ মৃত্যু সম্মানজনক আর বিষয়ীজীবরা মৃত্যুর নামে শিউরে উঠে—পিতামাতা-স্ত্রীপুত্রের বিচ্ছেদ ভয়ে রোদন করতে থাকে। কিন্তু নিমেষেই মৃত্যু এসে তাদের কেশ আকর্ষণ করে আপন আলয়ে নিয়ে যায়। তাই হে রাজন, আপনি অবিরাম কৃষ্ণনাম করুণ। ঐ কৃষ্ণনাম করতে করতে নিজেই কৃষ্ণত্বপ্রাপ্ত হবেন। যমদূতগণ শ্রীকৃষ্ণশরণাগত ব্যক্তিকে দর্শন করতেও ভীত হয়; নিকটে গিয়ে তাকে পাশবদ্ধ করার চেষ্টাতো দূরের কথা।

নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানাঃ।
দ্রষ্টুঞ্চ বিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি স্ম রাজন্॥

মৃত্যুকালে মৃত্যুদর্শন অর্থাৎ মৃত্যু এসেছে এই জ্ঞান সকলেরই থাকে। অজ্ঞান আচ্ছন্ন জীব তা দেখতে পায় না, কিন্তু মৃত্যু তার সামনে দাঁড়িয়ে আগে তাকে সচেতন করে, তারপর তার দেহ থেকে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করে। তাই হে রাজন্, একমাত্র ভক্তিযোগকে আশ্রয় করে শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারা অহরহ কৃষ্ণভজনা করুন। বক্তা থাকলে হরিকথা শুনবেন, শ্রোতা থাকলে কীর্তন করবেন আর বক্তা ও শ্রোতার অভাবে মনে মনে স্মরণ করবেন। শ্রীহরির আশ্রয় ছাড়া কখনো নিরালম্ব অবস্থায় থাকবেন না, আহারে-বিহারে শ্বাস-প্রশ্বাসে পথে-ঘাটে-সুখে-দুঃখে সর্বত্র সর্বকালে হরির স্মরণ করাই বিধেয়।

পোষাকী ধর্ম ত্যাগ করে সর্বদা আটপৌরে ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। বছরে কিংবা মাসে একবার মাত্র পূজার আয়োজন করলে চলবে না। নিত্য অহরহ, শ্বাসে-প্রশ্বাসে ভগবৎস্মরণ করাই প্রকৃত পূজা। এর নাম আটপৌরে পূজা বা ধর্ম। সর্বকর্মে

অভ্যাসযোগের দ্বারা ভগবানের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। আবার ধর্ম ধর্ম করলেই ধর্ম হয় না। ধর্ম বাইরের খোলস নয়, প্রাণের মজ্জার সাথে মিশিয়ে দিলেই ধর্ম সার্থক হয়।

যে সব ব্যক্তি কামনাযুক্ত হয়ে বিভিন্নপ্রকার কামনাপ্রাপ্তিকেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেন, তাদের পক্ষে বিভিন্ন দেবতার উপাসনাই বিধেয়। কিন্তু জীবনের কামনাপ্রাপ্তি বা নিষ্কাম আনন্দ বা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণেরই স্মরণাপন্ন হতে হবে। অখণ্ড সফলতা দান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই করতে পারেন।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেণ-ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২।৩।১০

—সর্ববাসনাশূন্য পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি অথবা সর্ব্বকামী ব্যক্তি অথবা মোক্ষকামী ব্যক্তি গভীর ভক্তিযোগের দ্বারা পুরুষোত্তম কৃষ্ণকেই পূজা করবেন।

পরীক্ষিত শুকদেবের এইসব তত্ত্ব উপদেশ শুনে সমস্ত মন প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পন করলেন। পুনরায় শুকদেবকে বললেন—

কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষে কলেবরম্ ॥ ২।৮।৩

—আমার প্রিয়তমের চরণে মনকে সঁপে দিয়ে কিভাবে আমি দেহত্যাগ করতে পারি, দয়া করে সে কথা বলে আমাকে শান্তি দান করুন।

শুকদেব তখন ভাবে গদগদ হয়ে বিহ্বল চিত্তে ভগবানের চতুঃশ্লোকী ভাগবত কীর্তন পূর্বক তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● শ্রীশুকদেবের চতুঃশ্লোকী ভাগবতকীর্তন ●

তৃণরাশি ভস্ম করে অনিল যেমন।
হরিকথা সেইরূপ পাতক নাশন ॥
যেইজন অতিঘোর পাপে লিপ্ত হয়।
শুনিলে সে হরিকথা ত্বরিবে নিশ্চয় ॥

ব্রহ্মার নিকট স্বয়ং ভগবান যে ভাগবততত্ত্ব বলেছিলেন তা চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। *এই শ্লোক চতুষ্টয়ের মধ্যেই সমগ্র ভাগবতের সারকথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শ্রীভগবান বলেছিলেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২।৯।৩২

* নারদকে ব্রহ্মা এই ভাগবত সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন। দেবর্ষি নারদ সরস্বতী নদীর তীরে ব্যাসদেবকে এই শাস্ত্র উপদেশ দেন। ব্যাসদেবের কাছ থেকে নেন শুকদেব। এই শুকদেব বিশদভাবে পরীক্ষিতকে জ্ঞাত করান।

—হে ব্রাহ্মন্, সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের মূল কারণ যে বস্তু ছিল, তা আমি। অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও যা অবশিষ্ট থাকে তা আমি আর এই যে জগৎ—তাও আমি।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীযেত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ ২।৯।৩৩

—আত্মাতেই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বোধ জন্মে, অথচ আত্মা সম্পর্কে তার জ্ঞান হয় না। এর কারণ মায়া। যেমন—একই চাঁদকে দুটি সরোবরে দুটি চাঁদ বলে মনে হয় আর রাহুকে গ্রহমণ্ডলে থাকা সত্বেও না দেখা।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ২।৯।৩৪

—আমি সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট আছি, কিন্তু আমি সৃষ্ট বস্তু নই। যেমন সূক্ষ্ম মহাভূত সকল স্থূল ভূতের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট আছে, কিন্তু তারা স্থূলভূতের কারণ, স্থূলভূতস্বরূপ নয় : সেইরূপ আমিও সৃষ্টির মধ্যে কারণরূপে আছি কিন্তু কার্যবস্তু (জগত) হয়ে যাইনি।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ২।৯।৩৫

—অন্বয় ও ব্যতিরেক—এই দুই চিন্তাধারা অবলম্বনে আমি লভ্য। আমি কার্যের মধ্যে কারণরূপে থাকি বলেই আমার অস্তিত্ব। আবার যখন শুধু কারণ অবস্থায় থাকি তখন উপলভ্য হইনা। এটি তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু মানুষের বিচার্য।

তৃতীয় অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ●

শয়নে স্বপনে কর শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

বিপদে পড়লেই আমরা কৃষ্ণকে ডাকি। সুখের দিনে আনন্দের মধ্যে থেকে তাঁর কথা আমাদের স্মরণে আসে না। তিনি সুখে দুঃখে সব সময় আমাদের পাশে আছেন। তাই দুঃখের মধ্য দিয়েই দুঃখের ঠাকুরকে লাভ করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় উত্তরা আপন গর্ভস্থ শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁর শরণাগত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করলে কুন্তীদেবী তাঁর স্তব করতে শুরু করলেন।

"হে কৃষ্ণ, যে বিপদ উপস্থিত হলে তোমার দর্শন লাভের জন্য মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে, তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য হৃদয় চঞ্চল হয়, সেই বিপদ যেন আমার জন্মে

জন্মে হয়ে থাকে। যে বিপদে ভগবৎ দর্শন লাভ হয়, সেই বিপদ সম্পদের তুল্য। আর যে সম্পদে ভগবৎ দর্শন লাভ হয় নাই সে সম্পদ তুচ্ছ তৃণ অথবা ঢেলার সমান।

কুন্তীদেবী আরও বলেছিলেন—হে কৃষ্ণ, যেসব মানুষ তোমার লীলা নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্তন করেন, শিষ্যদের প্রতি উপদেশ দেন এবং তোমার ধ্যানে সর্বদা বিভোর হয়ে তোমাকে আপনজন রূপে বুকে ধরে রাখতে চান, সেই সব মানুষ খুব শীঘ্রই জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মভোগ থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে কী বিরাট ব্যক্তিত্ব তা ভীষ্মের স্তুতির মধ্যেও জানা যায়। শরশয্যা-শায়ী ভীষ্মদেব বলেছিলেন—

মম নিশিতশরৈঃ বিভিদ্যমানত্বচ
বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণে আত্মা।

—হে কৃষ্ণ, ক্ষণে ক্ষণে আমি তোমাকে অজস্র শরে ক্ষত বিক্ষত করেছি—তুমি পরমপুরুষ ও পরমাত্মা জেনেও শুধুমাত্র তোমার নির্দেশে মরবার জন্য ও তোমাতে আমার আত্মা সমর্পণ করার লোভে। আজ আমার এই মৃত্যুর মহালগ্নে তুমি আমাকে গ্রহণ কর। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

মুক্তি দুই প্রকার। সদ্যমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি। আবার মৃত্যুর পরে দুটি সনাতন পথ আছে। একটি দেবযান আর একটি পিতৃযান। দেবযানে ক্রম মুক্তি কিন্তু এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান হলে সদ্যমুক্তি হয়ে থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে দেবযান অথবা পিতৃযান কোন মার্গই অবলম্বন করতে হয় না। তিনি দেহ ধারণ করেও জীবন্মুক্ত। মৃত্যুর দরজা দিয়ে তিনি মুক্তির অধিকারী। তাই—

পরম পবিত্র ভাই শ্রীকৃষ্ণের নাম।
যাহার শ্রবণে হয় হৃদয় আরাম॥
এহেন কৃষ্ণের পাদপল্লব প্লাবনে।
সাধুরা করেছে সদা আশ্রয় গ্রহণে॥
সেই পাদপল্লবপল্লব আশ্রয় মাত্রেতে।
সংসার সাগর পার হবে নির্ভয়েতে॥

এ কথা বলতে বলতে শুকদেব ভাবে বিভোর হয়ে মৌন অবলম্বন করে রইলেন। একটা ধ্যান গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হল সেই স্থানে। আসুন, এই অবসরে আমরা পরীক্ষিতের জন্মকাহিনী ও শুকদেবের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করি।

চতুর্থ অধ্যায়

● পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত ●

বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত অভিমন্যুনন্দন।
মাতৃগর্ভে হয় যার কৃষ্ণ দরশন॥

রাজা পরীক্ষিত ছিলেন বীর অভিমন্যুর পুত্র। মাতৃগর্ভেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পকরুণালাভ করেছিলেন। যখন অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র

নিক্ষেপ করলেন, তখন মাতৃগর্ভস্থিত পরীক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধপ্রায় হয়ে কোনও এক পুরুষরত্ন দেখতে পান। সেই পুরুষরত্নটি হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই পরীক্ষিতকে মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেন। পরীক্ষিতের জন্মের পর ব্রাহ্মণগণ বললেন, এই শিশু 'বিষ্ণুরাত' (অর্থাৎ বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত) নামে বিখ্যাত হবেন। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন একমাত্র পরীক্ষিতের ভাগ্যে হয়েছিল। তাই বাল্যকাল থেকেই রাজা পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণের পদে রতি দেখা যেত।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে এই পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হলেন আর অমনি জীবের অমঙ্গল কারণ কলি আবির্ভূত হন। তখন যুধিষ্ঠির জগতের সর্বত্র কলির প্রসার হচ্ছে বুঝতে পেরে (কলিকৃত লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসাদি দর্শন করে) সর্বগুণ সম্পন্ন পৌত্র পরীক্ষিতকে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরূপে হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

● পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ ●

হরির অর্চনা করে হয়ে একমন।
তাদের কাছে শত্রু না আসে কখন ।।
প্রতিকূল গ্রহগণ তাহাদের পথে।
বিঘ্ন নাহি দিতে কভু পারে কোন মতে ।।

হস্তিনার রাজা হয়ে পরীক্ষিত স্বীয় মাতুল উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করলেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে জন্মেজয় প্রভৃতি চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তারপর পরীক্ষিত কৃপাচার্যকে গুরুপদে বরণ করে গঙ্গাতীরে বহুদক্ষিণাযুক্ত তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং কলিকে উচ্ছেদ করার জন্য অসংখ্য সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বহুপথ অতিক্রম করার পর সরস্বতী নদীর তীরে দেখলেন, দণ্ডহস্তে রাজবেশ ধারণ করে এক শূদ্র ত্রিপাদবিহীন একটি বৃষ ও অশ্রুনেত্রী নামক এক গাভীকে নির্দয় ভাবে প্রহার করছে। এই রাজবেশধারী শূদ্র কলি, বৃষ স্বয়ং ধর্ম এবং গাভীটি হচ্ছে ধরিত্রী।

বৃষরূপী ধর্মের চারটি পদ—তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য। এদের মধ্যে পূর্বেই কালবশে তিনটি পদ বিনষ্ট হয়েছে। সত্যরূপ চতুর্থ পদটি কলিকালে এখনো আছে। তাকেও এই কলি বিনাশ করতে উদ্যত। গোরূপধারিণী পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে কলির উৎপীড়নে অশ্রুমোচন করছেন। পরীক্ষিত এই রহস্যের বিষয় অবগত হয়ে কলিকে বধ করতে উদ্যত হলে কলি প্রাণ ভয়ে মহারাজের চরণে পতিত হন।

কলিকে একান্ত শরণাগত দেখে মহারাজ তাকে দয়াপূর্বক বধ না করে বললেন—তুমি আমার রাজ্যে থাকতে পারবে না। তুমি অধর্মের পরম বন্ধু।

কলি বললেন—আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনার ভয়ে কোন স্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে পারব না। অতএব হে মহারাজ, যেখানে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে বাস করতে পারি—এমন স্থান নির্দেশ করে দিন। তবে আমার রাজত্বে পুণ্য কর্মের সংকল্প করলেই তাতে পুণ্য সঞ্চয় হবে কিন্তু মনে মনে পাপচিন্তা করলেও তাতে কিছুমাত্র পাপ হবে না। পাপচিন্তা কর্মে পরিণত করলে তবে পাপ হয়।

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ১।১৮।৭

কলির এই মহৎগুণ থাকার জন্য পরীক্ষিত তাকে বিনাশ না করে দয়াবশতঃ পাঁচটি স্থানে বাস করতে বললেন। পাশাক্রীড়া, মদ্যপান, পরস্ত্রীগমন, প্রাণীহিংসা ও স্বুবর্ণ—অধর্মের আকর এই পঞ্চবিধ স্থান অধিকার করে কলি তখন সানন্দে বাস করতে লাগলেন। তবে কৃষ্ণের মানবলীলা সংবরণের সঙ্গে সঙ্গেই কলি পৃথিবীতে প্রবেশ করলেও যতদিন মহারাজ পরীক্ষিত রাজ্যপালন করেছিলেন ততদিন পৃথিবীতে তিনি নিজ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

বিষ্ণুপরাণেও কলিযুগ মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈঃ ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চমাসেন অহোরাত্রেন তৎ কলৌ ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে যে সিদ্ধিলাভ করতে দশবছর সময় লাগে, ত্রেতায় লাগে একবছর, দ্বাপরে একমাস আর কলিযুগে লাগে একদিন ও একরাত্রি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

● পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ●

বৈষ্ণবজনেরে পূজে যেই সাধু নর।
হরিসহ এক আত্মা চিন্তে নিরন্তর ॥
তারপাশে কৃষ্ণ সদা রহে সর্বক্ষণ।
আপদে বিপদে রহে দেব সনাতন ॥

রাজা পরীক্ষিত একদা মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। কিন্তু কোন প্রাণী দেখতে না পেয়ে অনেকদূর পথ অতিক্রম করে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। এমন সময় সেই বনের মধ্যে দেখলেন—এক মুনি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। বড় আশা নিয়ে রাজা জল প্রার্থনা করলেন সেই মুনির কাছে।

মুনি কোন উত্তর দিলেন না।

তৃষ্ণার্ত রাজা ধৈর্য হারিয়ে দুঃখে, রাগে ও ক্ষোভে একটি মরা সাপ মুনির গলায় জড়িয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। ঐ মুনির নাম শমীক। তথাপি শমীকের ধ্যানভঙ্গ হল না।

মুনির পুত্র বালক শৃঙ্গী তার খেলার সাথীদের মুখে পিতার অপমানের কথা জানতে পেরে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে মহারাজ পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে।

পিতা শমীক ঐ শাপের কথা অবগত হয়ে পুত্রকে শাপ ফিরিয়ে নেবার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। কিন্তু বালক শৃঙ্গী সুমেরুর ন্যায় অচল অনড়। শুধুমাত্র বললেন—পিতা, আমি উপহাস ছলেও কোনদিন মিথ্যা কথা বলিনি। তাই আমার শাপ কোনদিন নিষ্ফল হবে না।"

অমোঘবাক্ পুত্রের কথা বুঝতে পেরে পিতা শমীক নিবৃত্ত হলেন। তিনি 'গুরুমুখ নামক তাঁর এক শিষ্যকে পাঠালেন হস্তিনাপুরে—পরীক্ষিতকে অভিশাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করার জন্য।

পরীক্ষিতের বয়স তখন ষাট বছর। এই দুর্বার অভিশাপ বাক্য শুনে তিনি গভীর চিন্তায় হয়ে পড়লেন মগ্ন। উপায় খুঁজতে লাগলেন ঐ মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। চিন্তায় ভাবনায় শরীর ক্ষিন্ন হয়ে উঠল তাঁর। তারপর 'শাপে বর হয়েছে মনে করে অতি সত্বর পুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে গঙ্গার তীরে করলেন প্রয়োপবেশন। স্থির করলেন অনশনে দেহত্যাগ করবেন।

সপ্তম অধ্যায়

● শুকদেবের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত ●

কহ কহ মহাভাগ কহ গো উপায়।
কিভাবে রাখিবো জীবন শ্রীকৃষ্ণের পায়॥
পরীক্ষিতের এ প্রশ্ন শুকদেব প্রতি।
শুকদেব কহিছেন তা ভাগবতে অতি॥

মাত্র সাতদিনের মধ্যে মহারাজ পরীক্ষিত সর্পাঘাতে মারা যাবেন—একথা যিনি শুনেন তিনিই 'হায় হায়' করতে থাকেন। ক্রমে নানা দেশ থেকে রাজর্ষি, মহর্ষি ও রাজভক্তরা হলেন গঙ্গাতীরে উপস্থিত। ব্যাসদেব ও নারদ সেখানে এলেন। দেবতারা আকাশ থেকে করতে লাগলেন পুষ্পবৃষ্টি। কেউবা মহারাজকে যজ্ঞ করার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন।

কিন্তু রাজা নির্বাক। তিনি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কোন কথা তাঁর ভাল লাগছে না। মৃত্যুর করাল ছায়া যেন বিরাট আকার ধারণ করে তাঁর কাছে ধেয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, এক ষোড়শবর্ষীয় শ্যামবর্ণ, দিগম্বর ধূলিধূসরিততনু, আয়তলোচন, পিঙ্গল কেশকলাপ, আশ্রমচিহ্নবিহীন, তেজপুঞ্জ-কলেবর ঋষিবালকগণে পরিবৃত হয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করলেন। ইনি সেই চির কিশোর শুকদেব। সেই উলঙ্গমূর্তি দেখে কেউ বিরক্তবোধ না করে তাঁকে সাদরে বরণ করে নিলেন। মহারাজ বন্দনা করতে লাগলেন তাঁর চরণ। রাজপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে শুকদেব করলেন উপবেশন।

শুকদেবের অপর নাম শ্রীবাদরায়নি। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলেছিলেন—আপনার পুত্র শুকপাখীর ন্যায় মধুরভাষী, অতএব ইনি শুক নামেই প্রসিদ্ধ হবেন।

এই প্রসঙ্গে শুকদেবের পূর্বজন্মের বৃত্তান্তটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ভাগবতবক্তা শুকদেব পূর্বজন্মে একটি শুকপক্ষী ছিল। একদিন পার্বতী মহাদেবকে পীড়াপীড়ি করে জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকাহিনী। মহাদেব রাজী না হয়ে পারলেন না। সন্ধ্যার অনেক পরে পার্বতীর আগ্রহাতিশয্যে নিরুপায় শিব এক-দুই করে হাততালি দিলেন যাতে সমস্ত পশুপাখী সেই স্থান থেকে দূরে চলে যায়। কারণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকাহিনী পার্বতীকে ছাড়া তিনি আর কাউকে জানাবেন না।

গৃহের সংলগ্ন একটি বৃক্ষতলে শিব পার্বতীকে নিয়ে বসেছেন। সেখানের গাছের পাখীরা হাততালি পেয়ে উড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু একটি শুকপাখীর ডিম ঐ গাছের কোটরে ছিল। তার মা তাকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

হাততালি পেয়ে ঐ ডিম কিন্তু বিধির ইচ্ছায় ফুটে হয়ে গেল বাচ্চা। এদিকে মহাদেব ভাগবতের কথা বলে চলছেন। মা পার্বতী 'হুঁ' দিয়ে আগ্রহশীল শ্রোতার মত শুনছেন। কখন যে পার্বতী নিদ্রামগ্ন হয়েছেন মহাদেব তা বুঝতে পারেন নি। তিনি হরিকথা বলেই চলেছেন। সেই শুকপাখীর বাচ্চা মনে করল, এমন মধুর হরিকথায় 'হুঁ' না দিলেতো মহাদেব আর বলবেন না। একথা ভেবেই ঈশ্বরানুগ্রহে বাচ্চাটি ক্রমাগত 'হুঁ' দিয়ে চলল।

ভাগবতের সমস্ত কাহিনী ও তত্ত্বকথাগুলি বলা প্রায় শেষ হলে মহাদেব দেখলেন পার্বতী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তখন তিনি ভাবলেন, তাহলে কে তার কথায় ক্রমাগত 'হুঁ' দিয়েছিল। সেতো তাহলে সমস্ত গোপনীয় কথা শুনে নিল। একথা ভাবতে ভাবতে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন—একটা শুকপাখীর বাচ্চা বসে বসে কুটু কুটু করে তাকে দেখছে। এই বাচ্চাই এতক্ষণ হুঁ দিচ্ছিল—একথা স্থির করে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশূলকে নির্দেশ দিলেন শুকপাখীকে বধ করার জন্য। ত্রিশূল ছুটে চলল। প্রাণভয়ে শুকপাখীও উড়ে পালাতে লাগল। ত্রিভুবন ঘুরে 'ত্রাহি-ত্রাহি' রব করতে করতে প্রাণভয়ে শুকপাখী ব্যাসদেবের আশ্রমে হল উপনীত।

ব্যাসদেবের স্ত্রী তখন মুখব্যাদান করে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। শুকপাখী যোগবলে সূক্ষ্মদেহে ব্যাসদেবের স্ত্রীর মুখ গহ্বর দিয়ে প্রবেশ করল উদরে। পড়ে রইল স্থূল দেহটি। ত্রিশূল সেই স্থূল দেহটিকেই বিদ্ধ করে ফিরে গেল শিবের কাছে।

অনন্তর দীর্ঘ ষোলবছর পরে জগতের মায়াশূন্য মুহূর্তে শুকদেব রূপে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হল সেই পাখী।

* * *

ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে বাস করতেন বলে তিনি 'বাদরায়ণ'। ব্যাসদেবের বদরিকাশ্রমে বাস করার কারণ ছিল। সেটি হচ্ছে, অন্য তীর্থে দশবছর বাস বদরিকাশ্রমে একরাত্রি বাসের সমান।

* * *

মহারাজ শুকদেবের পূজা করলেন। তারপর মৃত্যুদিন অবধি তাঁর কাছে থাকার জন্য জানালেন অনুরোধ। যে ব্যক্তি পাঁচ মিনিটও বিষয়ীর গৃহে অপেক্ষা করেন না সেই ব্যক্তি মহারাজার ভক্তি প্রেমডোরে আবদ্ধ হলেন সাতদিন।

পরীক্ষিত এরপর বললেন—

কথয়স্ব মহাভাগ। যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্। ২।৮।৩

হে মহাভাগ, আমাকে একটি শ্রেষ্ঠ উপায় বলে দিন—কি ভাবে আমি বিষয় বৈভবরহিত মনকে অখিল বিশ্বের পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে নিজের দেহ বিসর্জন করতে পারি?

এ প্রশ্ন শুধু মহারাজের একার নয়। এ প্রশ্ন—মানবজাতির প্রাণের প্রশ্ন। এ প্রশ্নই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেবের মুখ নিঃসৃত দ্বাদশ স্কন্ধ কথাগুলি এই একমাত্র প্রশ্নের সমাধান করছে—কি করে 'কৃষ্ণে নিবেশ্য নিংসঙ্গং মনস্তক্ষ্যো কলেবরং।'

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আকাশে বাতাসে নবীন সুরের আমেজ। আলোর বন্যায় গঙ্গাতীর রোমাঞ্চিত। ধীরে ধীরে ভগবান শুকদেব গাত্রোত্থান করলেন। তারপর পুনরায় ভাগবত কথনে প্রবৃত্ত হলেন। গল্পের আঙ্গিকে তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সরলভাবে বুঝাতে লাগলেন এক একটি অধ্যায়।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● বিদুর-উদ্ধব সংবাদ ●

গঙ্গাস্নান করি যেই জপে হরিনাম।
অন্তিমেতে গোলোকেতে সে করে প্রস্থান॥
হরিভক্তে দেখি যম কাছে নাহি আসে।
দেবগণও অনুক্ষণ তারে ভালবাসে॥

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বিদুরের তীর্থভ্রমণের কথা উত্থাপন করলে মহারাজ পরীক্ষিত তা সবিস্তারে জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তখন শুকদেব

বিদুরের তীর্থভ্রমণকালে মৈত্রেয় ঋষির সাথে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা বলতে শুরু করলেন।

পুণ্যলেশমাত্রবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন দুর্যোধনের অধর্মাচরণ অনুমোদন করলেন, তখন বিদুর সভায় গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন—মহারাজ, বংশের ঐ কুলাঙ্গার পুত্র দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন!

এই কথা শুনে দুর্যোধন ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে এসে কারও কোন বাধা না মেনে চীৎকার করে গালাগালি দিতে দিতে বিদুরকে রাজসভা থেকে ঘাড়ে ধরে বের করে দেন।

কৌরবগণের বহুপুণ্যে যিনি কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই "কৌরব-পুণ্যলব্ধঃ" বিদুর তখন হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন তীর্থদর্শনে। কুরুবংশের জন্মজন্মান্তরের যে সঞ্চিত পুণ্য বিদুরের দেহ পরিগ্রহ করে এতদিন হস্তিনাপুরে বাস করেছিল, তা বিদুরের নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের সর্ববিধ বিপদ ও ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখা দিল। বিদুর থাকাকালীন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অমঙ্গল হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না অথচ ধৃতরাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিদুরকে হস্তিনাপুর থেকে অপসারিত করাও একান্ত প্রয়োজন।

*　　　*　　　*

দীর্ঘকালব্যাপী তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন বিদুর। এইরূপে যখন তিনি প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হলেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে হস্তিনাপুরে রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেছেন। তথাপি তিনি হস্তিনায় ফিরলেন না।

একদিন যমুনার তীরে বিদুরের সাথে দেখা হল উদ্ধবের। শ্রীকৃষ্ণের কথা জানতে চাইলে উদ্ধব কেঁদে আকুল হয়ে বললেন, আমার প্রাণসখা মানবলীলা সাঙ্গ করে স্বধামে চলে গেছেন।

বাল্যাবধি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন উদ্ধবের সখা। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কত কাহিনীই না বিদুরকে বললেন। কৃষ্ণের জন্মকথা, পুতনাবধ, কালীয় দমন, কংস বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ, বৃন্দাবনলীলা, সান্দীপনী মুনির নিকট (কৃষ্ণের) বেদ অধ্যয়ন, দ্বারকায় ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, যদুবংশ ধ্বংস এবং আরো কত কী! সমস্ত কাহিনীই উদ্ধবের মনের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত ভেসে চলল এবং বিদুর বিমুগ্ধ হয়ে সমস্ত শুনতে লাগলেন।

উদ্ধব বিদুরকে পরামর্শ দিলেন—শ্রীকৃষ্ণের আরো অনেক কথা আপনি শুনতে পাবেন মৈত্রেয় মুনির কাছে। ভগবান মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করার সময় মুনিকে আমার সমক্ষেই আদেশ করে গেছেন। একথা বলে উদ্ধব বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলেন আর বিদুরও মহানন্দে কৌতূহলপরবশ হয়ে মৈত্রেয়কে অনুসন্ধান করতে করতে গঙ্গারতীরে তাঁর দর্শন পেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● মৈত্রেয়-বিদুর সাক্ষাৎ কথাসরিৎসাগর ●

সংসারের অধীনেতে হইয়া বিভোর।
বদ্ধ হয় মায়াজালে সুকঠিন ডোর॥
এই হেতু সেই মায়া ছেদিবার তরে।
আকাঙ্ক্ষা যদ্যপি কর অতি যত্ন করে॥
কৃষ্ণভক্তিরূপ সেই কুঠারের ঘায়।
ছেদন করহ ত্বরা দারুণ মায়ায়॥
হইবে অসীম সুখ লাভ অনিবার।
নশ্বর হইবে সব এ ভব সংসার।

গঙ্গাতীরে মৈত্রেয় ঋষিকে দর্শন করে বিদুর তাঁর পাদবন্দনা করে বললেন—হে ভগবান্! লোকসমূহ সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ কর্ম করে থাকে, কিন্তু সেই সকল কর্মদ্বারা তাদের সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ নিবৃত্তি কিছুই হয় না; বরং সেই সকল কর্ম থেকে পুনঃপুনঃ দুঃখই পেয়ে থাকে। অতএব এই দুঃখময় সংসারে আমাদের যা কর্তব্য তা দয়া করে বলুন! বিদুর আরো বললেন যে তিনি বাসদেবের মুখ থেকে মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত পান করে এখনও পরিতৃপ্ত হন না। সুতরাং মৈত্রেয় ঋষির নিকট শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র শুনবার ইচ্ছা তাঁর প্রবল।

মৈত্রেয় ঋষি পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পেয়েছেন তাই তিনি বিদুরকে হরিকথা শোনানোর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করার সুযোগ এখন উপস্থিত—মৈত্রেয় ঋষির আনন্দের সীমা নাই। এইরূপ উপযুক্ত গুরু ও শিষ্যের মিলনের মত মণিকাঞ্চন যোগ ধর্মজগতের ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না। ব্যবহারিক জগতে দাতা বিরল, গ্রহীতা অসংখ্য কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম এর বিপরীত। দাতা অনেক গ্রহীতা বিরল।

আজ উপযুক্ত দাতা আর সুযোগ্য গ্রহীতা পেয়ে মৈত্রেয় আনন্দের সাথে বললেন, হে ধর্মপরায়ণ কৌরব্য! আজ আমার কী পরম সৌভাগ্য! তোমার সান্নিধ্য লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। তুমি আমাকে উত্তম প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছ। আমি আমি প্রাণভরে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব। তুমি এখন শান্তচিত্তে অবস্থান কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কতক্ষণ বিশ্রাম করার পর শুরু হল তাদের কৃষ্ণালোচনা। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ চকিতের মতো বিদুরের মনে প্রশ্ন উত্থিত হল—ভগবান মায়ার দ্বারা যুক্ত হয়ে কিভাবে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করলেন?

মৈত্রেয় ঋষি বললেন, "সেয়ং ভগবতো মায়া" অর্থাৎ ভগবান সৃষ্টি সময়ে যে মায়াকে অবলম্বন করেন তা ভগবান থেকে পৃথক নয়—তা ভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে অন্যতম শক্তিমাত্র। বহিরঙ্গ শক্তি ও মায়াশক্তি সাধারণতঃ কার্য্যকারণ ভেদে যোগমায়া ও মহামায়া নামে হয়ে থাকে। যোগমায়া অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি। দেহ কখনই আত্মা নহে, তথাপি এই মায়া দ্বারাই জীবের অহংবুদ্ধি বা 'আমি দেহ, আমি স্থূল, আমি বাঁচব'—ইত্যাদি বিপরীত বুদ্ধি হয়।

বিদুরের সন্দেহ দূর হল। তিনি ভাবছেন—এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি অতিশয় মূর্খ, দেহ ও সংসার সুখে আসক্ত—সে সুখী; আবার যিনি পরমেশ্বরকে জেনেছেন তিনিও সুখী—কারণ এদের দুজনের কারো মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি মাঝামাঝি অবস্থায় আছেন—যিনি সংসারী হয়েও অল্পগুণ অর্জন করেছেন—সেই লোকই নানাবিধ সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে দুঃখ পেয়ে থাকেন।

মৈত্রেয় ঋষি এরপর ব্রহ্মার ভগবৎদর্শন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব, বরাহ রূপী ভগবানের পৃথিবী উদ্ধার বর্ণনা করলেন বিদুরের কাছে। মৈত্রেয় বলেন—নারায়ণ যখন কারণসলিলে অনন্ত শয্যায় (যোগনিদ্রায়) চার সহস্র যুগ পর্য্যন্ত শুয়েছিলেন তখন তাঁর নাভিদেশ থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হল এবং সেই পদ্মকোষে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে অনন্তশূন্যে গ্রীবা সঞ্চালন করলেন। চারদিকে এই গ্রীবা সঞ্চালনের ফলে তাঁর চারটি মুখ উৎপন্ন হল—তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হলেন। যিনি পূর্ব-কল্পে শব্দব্রহ্ম নাম ধারণ করেছিলেন এখন পাদকল্পে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপে পরিচিত হলেন।

ঐ পদ্ম কিভাবে সৃষ্টি হল এবং তিনিই বা কে—এই প্রশ্নের সমাধান করতে অক্ষম হয়ে ব্রহ্মা পদ্মনালের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথ দিয়ে নিচের দিকে নামলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে ধ্যানের দ্বারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণকে দর্শন করলেন এবং তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নারায়ণ ব্রহ্মার স্তব স্তুতিতে পরিতৃপ্ত হয়ে আদেশ দিলেন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির জন্য।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা তমঃ, মোহ, মাহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অজ্ঞানের পাঁচটি বৃত্তি সৃষ্টি করলেন,। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে অজ্ঞানতাই তমঃ। সমস্ত বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানই মোহ। অনিত্য বিষয়বস্তু ভোগ করার ইচ্ছাই মহামোহ। ভোগে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে ক্রোধ হয় তাই তামিস্র আর ভোগবাসনালিপ্ত দেহের বিনাশে 'আমিই বিনষ্ট হলাম' এই পশুবুদ্ধিই অন্ধ তামিস্র।

এরপর ব্রহ্মা ধ্যানবলে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারজন নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় মুনিকে সৃষ্টি করলেন। এরা ভাগবতে 'সন' নামে পরিচিত। এরা চিরদিনই বালক। এদের কোনদিন যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু হল না। ব্রহ্মা এই পুত্রগণকে প্রজাসৃষ্টি করতে আদেশ করেন। কিন্তু এরা তাতে অক্ষম হলেন। ফলে প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবানের ধ্যানে হলেন মগ্ন।

ভগবান তখন আপন জিহ্বাগ্র থেকে সৃষ্টি করলেন এক নারীকে।

"হরির জিহ্বাগ্র হতে দেবী মনোহরা।
আবির্ভূত হৈল এক পাপতাপ হরা॥
বিশুদ্ধ স্ফটিক সম দেবীর বরণ।
শ্বেতবস্ত্র পরিধান অতি বিমোহন॥
ভূষণে ভূষিতা দেবী জপমালা করে।
সাবিত্রী তাঁহার নাম ভুবন মাঝারে॥

এই নারীর নাম সাবিত্রী। সুন্দরী সাবিত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রহ্মার কাছে, ধ্যান ভঙ্গ হল ব্রহ্মার। রতিরঙ্গে মগ্ন হলেন সাবিত্রীর সাথে। ক্রমে সাবিত্রীর গর্ভে জন্ম নিলেন ব্রহ্মার দশপুত্র—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, দক্ষ ও নারদ। পরে হয় কর্দম নামে একপুত্র ও সরস্বতী নামে এক কন্যা।

এক সময় সৃষ্টি বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক ব্রহ্মা স্বীয় মনোহারিনী কন্যা সরস্বতীকেই কামনা করেন। সৃষ্টিকর্তার এই বুদ্ধিবৈকল্য দেখে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ স্বীয় পিতাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

ব্রহ্মা লজ্জিত হন। তিনি তখনই কালকলুষিত দেহকে পবিত্র করে তুলেন। তারপর তাঁর চারমুখ থেকে ঋক্, সাম্, যজু, ও অথর্ব নামক বেদের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা ক্রমশঃ শাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র সৃষ্টি করলেন।

তথাপি সৃষ্টিকার্য্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না দেখে তিনি স্বীয় দেহকে দুটি-রূপেবিভক্ত করলেন। সেই বিভক্ত রূপদ্বয় থেকে স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি হল। সেই মিথুনেব মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি হলেন মনু এবং যিনি স্ত্রী তিনি হলেন মনুর শতরূপা নাম্নী মহিষী। এই মনু ও শতরূপার সংযোগে প্রজা সৃষ্টি হতে লাগল।

সেই সময় প্রলয় সলিলে পৃথিবী ছিল নিমগ্না। ব্রহ্মা সেই পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য হতে লাগলেন সচেষ্ট। একদা তাঁর নাসিকাছিদ্র থেকে একটি ক্ষুদ্র শুকর বের হয়ে এল এবং দেখতে দেখতে সেই শুকর হয়ে উঠল বৃহৎ আকৃতি। ঐ বরাহরূপী ভগবান নিজের দন্ত দ্বারা রসাতলস্থিত পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। তারপর হিরণ্যাক্ষ নামক আদি দৈত্যকে করলেন বধ।

—'কিন্তু কিভাবে হিরণ্যাক্ষ বধ হল'?

মৈত্রেয় ঋষির মুখে হিরণ্যাক্ষ বধের কাহিনী শুনবার জন্য বিদুর বারবার অনুরোধ করলেন আর ঋষিবরও সাগ্রহে আরম্ভ করলেন হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর অপূর্ব কাহিনী।

তৃতীয় অধ্যায়

● কশ্যপ ও দিতির কাহিনী ●

(হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কাহিনী)

অজ্ঞানতা দূর হয় শ্রীহরির নামে।
বাসনা বিনষ্ট হয় এই ভবধামে ।।
শুনিলে হরির কথা পাপ ধ্বংস হয়।
আপদ বিনাশ পায় জানিবে নিশ্চয় ।।

প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দিতি। দক্ষ আপন আদরণীয়া কন্যার মনের বাসনা বুঝতে পেরে তাঁকে কশ্যপের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

কশ্যপ ছিলেন মরীচের পুত্র। তিনি অতীব ধর্মপরায়ণ। অসাধারণ তাঁর পৌরুষ।

একদা সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুকে স্মরণ করে ধ্যাননেত্রে সমাহিত চিত্তে বসে আছেন কশ্যপ। এমন সময় দিতি অতিশয় কামপীড়িতা হয়ে আপন কামনা চরিতার্থ করার মানসে স্বামীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং স্বামীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন, হে প্রভু! আমাকে সত্বর কামজ্বালা থেকে মুক্ত কর!

সন্ধ্যাকালে দিতির এহেন অমঙ্গলকর অনুরোধ শুনে কশ্যপ বিরক্ত বোধ করে দিতিকে আপন সংকল্প থেকে বিরত করবার জন্য নানারূপ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন।

কশ্যপ বললেন, এই অসময়ে এসব তুমি কি বলছ দিতি? গৃহীরা স্ত্রীকে আশ্রয় করে দুর্জয় ইন্দ্রিয়কে বশে রাখেন। দুর্গ যেরূপ শত্রুদের আক্রমণব্যর্থ করে ঠিক সেইরূপ। এই ঘোর সন্ধ্যাকাল ভূতপ্রেতগণের অধিকারভুক্ত। এই সময়ে রুদ্রদেব ববম্-ববম্ রবে ভূতগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তাছাড়া—

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি তিনে এবে সন্ধি হয়।
সেই হেতু সন্ধ্যা এই কালেরে কহয় ।।

এই সময় কেবলমাত্র ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা উচিৎ। কারণ শুভ শঙ্খের নাদে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল মুখরিত হয় সন্ধ্যাবেলা। আবার রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্বকর্মসু—এই সন্ধ্যাকালকে রাক্ষসী বেলা বলে, বিষয়কর্ম এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অনুকূল নয়।

একথা শুনেও দিতির চৈতন্য হল না। বারবনিতার ন্যায় স্বামীর বস্ত্র ধরে বারবার আকর্ষণ করতে লাগলেন। দিবস ও রাত্রি, জীবন ও মৃত্যু এবং দেবচিন্তা ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অবশেষে দিতিই হলেন জয়ী। কশ্যপকে আকৃষ্ট করলেন কামানলে। পূর্ণ হল দিতির কামনা।

কিন্তু হায়! সহসা কেন শিহরণ জাগল তাঁর মনে। দেহে উপস্থিত হল কম্পন। রুদ্রভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন দিতি। কারণ তিনি স্বামীকে জোরপূর্বক টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর আদেশ মেনে চলেননি। সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে মহা অপরাধী হয়েছেন। এর ফল কি হবে তা তিনি জানেন।

কশ্যপ ধ্যানবলে জেনে বললেন, যেহেতু দিতি দেবতাদের অবজ্ঞা করেছেন সেইহেতু তার গর্ভে ঘোর অমঙ্গলজনক ও দুর্দান্ত দুটি অসুর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এই পুত্রদ্বয় পৃথিবীর নিরপরাধ প্রাণীদের বিনাশ করবে—স্ত্রী নিগ্রহ মহাত্মাগণের কোপ বৃদ্ধি করবে। তখন স্বয়ং ভগবান ক্রুদ্ধ হ'য়ে অবতার রূপ ধারণ ক'রে তাদের নিধন করবেন।

দিতি চমকে উঠলেন স্বামীর মুখের ভবিষ্যতবাণী শুনে। মর্মাহতা হলেন ভীষণভাবে। অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে তার মুখখানা কালো হয়ে গেল। কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গেল তাঁর সমস্ত কান্না। চোখের কোনে পড়ে গেল অশ্রুর ছাপ। জীবনের সব রং, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা একাকার হয়ে একেবারে সাদা রংয়ে পরিণত হয়ে গেল।

তাঁর সেই অনুতাপে প্রসন্ন হয়ে কশ্যপ আশ্বাসের সুরে বললেন, দিতি, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন। তোমার এই অনুতাপের কান্না ভগবান শ্রীহরি শুনতে পেয়েছেন। চোখের জল মুছে ফেল দিতি! তোমার আকুলতাভরা অনুতাপই তোমাকে করেছে ভাগ্যবতী। তোমার যে অসুর পুত্রদুটি জন্মগ্রহণ করবে তাদের একজনের কোল আলো করে এক পরম বৈষ্ণবপুত্র আসবে। সেই পুত্রই তোমার বংশকে করবে পবিত্র।

স্বামীর মুখে এহেন বাক্য শুনে দিতির হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সহসা মনের দুয়ারে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা। কিন্তু আনন্দিত হলেন বটে তথাপি ঐ পুত্রদ্বয় জগতের অনিষ্ট করবে, এই আশংকায় তিনি সন্তান কশ্যপের বীর্য্য শত বছর গর্ভে ধরে রাখলেন। গর্ভস্থ ভ্রূণের তেজে চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতি স্তিমিত হল। স্বর্গ পর্য্যন্ত অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। দেবতারা হলেন ভীত ও আশঙ্কিত।

চতুর্থ অধ্যায়

● বৈকুণ্ঠের সপ্তম দ্বারে জয়-বিজয় ●

কিবা জপ কিবা তপ কিবা যজ্ঞচয়।
হরিকথা সম কিছু সমান না হয়॥
হরিকথা একচিত্তে করিলে শ্রবণ।
অনায়াসে মোক্ষপদ পায় জীবগণ॥

ব্রহ্মার পুত্র চারজন। সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ। এরা ছিলেন চিরকুমার। প্রৌঢ় বয়সেও এদের গঠন ছিল পাঁচবছরের বালকের মত। অতি দীনভাবে সাধন ভজন

নিয়ে মুনির মত জীবন যাপন করতেন। আর সর্বদা থাকতেন উলঙ্গ। একদা ঐ উলঙ্গ অবস্থাতেই বিষ্ণুকে দর্শন করতে বৈকুণ্ঠের সপ্তমদ্বারে পৌঁছলেন তাঁরা।

সেখানে তখন পাহারা দিচ্ছিলেন জয় ও বিজয় নামে দুই দ্বারী। তাঁরা ঐ পুত্র চতুঃষ্টয়ের দীন হীন উলঙ্গবেশ দেখে লাঠি তুলে করলেন পথ অবরোধ।

উলঙ্গ সে মুনিগণে / হেরি দ্বারী দুজনে
উপহাস করে বার বার।
মুনিদের তুচ্ছ করি / বেত্রদণ্ড হাতে ধরি
পথরোধ করিলে সবার ॥

মুনিরা বহু অনুরোধ করে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে সক্রোধে অভিশাপ দিলেন—

করিলে যেমন পাপ দিনু মোরা অভিশাপ
বৈকুণ্ঠেতে নাহি রবে আর।
কাম ক্রোধ লোভ নামে জন্ম লবে মর্ত্যধামে
বৈকুণ্ঠ করিয়া পরিহার ॥

—তোমরা শীঘ্রই বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করে কাম-ক্রোধ ও লোভ সংকুল পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।

ভীত হলেন জয় বিজয়। তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু জ্যামুক্ত তীরের মত মুনিদের অভিশাপ কোনমতেই ধনুকের মধ্যে ফিরে গেল না।

শ্রীবিষ্ণু তা জানতে পেরে লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে পদব্রজে উপস্থিত হলেন মুনিগণের সমীপে। ভক্তের দুর্দশায় ভক্তবৎসল অন্তর্যামী নারায়ণ দ্রুতপদক্ষেপেই উপস্থিত হলেন। তারপর সেই চতুঃসনকে বললেন—আমার দ্বারীদ্বয়ের প্রতি আপনাদের প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ কিন্তু আপনারা আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ করুন। এই ভৃত্যদ্বয় যেন শীঘ্রই নির্বাসন শেষ করে আমার কাছে ফিরে আসে।

সনকাদি মুনিগণ ভগবানের কথায় প্রসন্ন হলে ভক্তবৎসল শ্রীহরি বললেন যে দ্বারপালদ্বয় অবিলম্বেই অসুর জন্ম লাভ করুক। অসুর জন্ম লাভ না করলে শীঘ্র ফিরে আসতে পারবে না। শত্রুভাবে মনে একাগ্রতা নিয়ে জীব যত সহজে আমার কাছে আসতে পারে মিত্র ভাবে তত সহজে পারে না।

সনকাদি মুনিগণ প্রসন্নচিত্তে সায় দিলেন সেই কথায়। তারপর শ্রীহরি দর্শন ও কথনের পর করলেন প্রস্থান।

অভিশাপগ্রস্থ জয় বিজয় কাতর হয়ে পড়লেন শ্রীভগবানের চরণে।

তখন বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই বৎস। তোমারা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করে আমার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন পূর্বক অবিলম্বেই ফিরে আসবে।

অশ্রু বিসর্জন করতে করতে শাপভ্রষ্ট দ্বারীদ্বয় তখন প্রভুর পায়ে ধরে বললেন—আপনি বলুন প্রভু, আমরা কতদিন পরে ফিরে আসব ?

—খুব শীঘ্রই। মাত্র তিন জন্ম পরে।

—তিন জন্ম পরে! হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল জয়-বিজয়।

মায়াবদ্ধ জীবের মতো কেঁদে কোন লাভ হবে না বাছা! দেখতে দেখতে কেটে যাবে সামান্য তিনটি জন্ম। আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে জীব দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে। সেই তুলনায় তিনটি জন্ম কিছুই নয়। এর চেয়ে অল্প সময় কোন মতেই হতে পারে না। যাও, তোমরা অবিলম্বেই বৈকুণ্ঠ থেকে বিচ্যুত হও!

একথা বলে অন্তর্ধান করলেন শ্রীহরি। জয় ও বিজয় পতিত হলেন রসাতলে। তারপর ভগবানের অমোঘ বিধানে তাঁরা কশ্যপের বীর্য অবলম্বন করে দিতির গর্ভে জন্ম নিলেন দৈত্য হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে।

শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করে পুত্র প্রসব করলেন দিতি। সহসা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে সূচিত হল অমঙ্গল ধ্বনি। আকাশ বাতাস তোলপাড় করে উল্কা বৃষ্টি হতে লাগল। বাজ পড়তে লাগল বিনা মেঘে। অনুভূত হতে লাগল ঘন ঘন ভূমিকম্পের তাণ্ডবলীলা। প্রজ্বলিত দাবানলের মত জ্বলতে লাগল পৃথিবী। আর—

দুর্গন্ধে ভরিল বায়ু শব্দ তাহে বয়।
বেগ তার ঝড় সম সদা ধূলিময়॥
ঘেরিল প্রলয় মেঘ ঢাকিল তপন।
চতুর্দিক অন্ধকার নিস্তেজ কিরণ॥
পেঁচা ডাকে দিবা নিশি কুকুর চীৎকারে।
অকস্মাৎ গাভীদুগ্ধ রক্ত হয়ে ঝরে॥
জীবগণ ভ াকুল হইল শঙ্কিত।
প্রাণভরে কোলাহল করে অবিরত॥

অতি অল্পদিনের মধ্যেই দৈত্যর মত তেজ ও ভঙ্গী নিয়ে উদ্ধত পুত্র হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবন তোলপাড় করে এক বিরাট ভীতির শিহরণ তুলে ছুটে গেলেন তপস্যায়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তপ্ত মধ্যাহ্নে অগ্নিবেষ্টিত বেদীর মধ্যে এবং ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্র সংক্ষুব্ধ বর্ষারজনীতে নির্বিবাদে দণ্ডায়মান হয়ে আর প্রচণ্ডতুষারঝঞ্ঝা সমান্বিত শীতের রাত্রিতে আকণ্ঠ মগ্ন হলেন। তারপর তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন।

সেই প্রবল তপস্যার ফলে ব্রহ্মার আসন উঠল নড়ে। তিনি আর থামতে পারলেন না দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ভরা আহ্বানে। নেমে আসতে বাধ্য হলেন পাতালে। তারপর বর দিলেন দৈত্যসম্রাটকে—তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সমস্ত প্রকার যুদ্ধে তুমি হবে নর ও দানবদের অবধ্য। জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষ কেউ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না।

ওদিকে হিরণ্যাক্ষের অত্যাচারে ও জর্জরিত হয়ে উঠল পৃথিবী। কালক্রমে তিনিও একদিন যুদ্ধকরার মানসে গদাহস্তে স্বর্গে গমন করলেন। তাকে দেখে—

'ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ'।

গরুড়কে দেখে সাপ যেমন ভয়ে পালিয়ে যায়, সেইরূপ হিরণ্যাক্ষকে দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ পলায়ন করতে লাগলেন।

স্বর্গে যুদ্ধের পিপাসা মিটল না দেখে হিরণ্যাক্ষ রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে সমুদ্রের ভেতরে করলেন প্রবেশ। উত্তাল সমুদ্রের প্রলয় কল্লোলকে উপেক্ষা করতঃ তাথৈ তাথৈ নৃত্যে দন্তবিস্তার পূর্বক অট্টহাসি হাসতে হাসতে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে তিনি বরুণদেবকে করতে লাগলেন উপহাস। তারপর 'যুদ্ধং দেহি' বলে তাঁকে করলেন আহ্বান।

ভীত সন্ত্রস্ত বরুণদেব বিনীত বচনে তাঁরে বললেন, হে দুর্ধর্ষ, তুমি এ মুহূর্তে রসাতলে যাও! সেখানে ভগবান শ্রীহরি আছেন। তিনিই এই তিনলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাকে পরাজিত কর। তবেই তোমার বীরত্ব প্রকাশ পাবে।

একথা শুনে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করানোর অভিপ্রায়ে উম্মাদের মতো বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছুটতে লাগলেন হিরণ্যাক্ষ। পথে নারদের সাথে দেখা হয়। নারদ তাঁকে রসাতলে যাওয়ার পথ নির্দেশ দিলেন।

দেবর্ষির পথনির্দেশ নিয়ে হিরণ্যাক্ষ প্রবেশ করলেন রসাতলে। দেখলেন এক প্রকাণ্ড বরাহমূর্ত্তি দন্তদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে।

অতঃপর বরাহরূপী শ্রীভগবানের সাথে হিরণ্যাক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। বহুদিন ধরে চলল এই যুদ্ধ। ক্রমশঃ হিরণ্যাক্ষ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। একদা পরাজিত হয়ে পতিত হলেন মৃত্যুমুখে।

এই জয় ও বিজয় দ্বিতীয় জন্মে হয়েছিলেন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, তৃতীয়জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র। [শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক প্রথম দিনের ভাগবত আলোচনা সমাপ্ত]

পঞ্চম অধ্যায়

● কর্দমঋষি ও দেবহূতির কাহিনী ●

যেই বলে হরি কথা এ জগতে সার।
সপ্তজন্ম কৃত পাপ নাহি থাকেতার॥
গরুড়ে দেখিয়া যথা ভীত সর্পকুল।
হরিভক্তে দেখি যম ভয়েতে আকুল॥

মৈত্রেয় ঋষি বললেন যে, ব্রহ্মা কর্দম ঋষিকে প্রজাসৃষ্টি করতে আদেশ করলে কর্দম ঋষি প্রথমে সরস্বতী নদীর তীরে দশসহস্র বছর তপস্যা করেছিলেন। ভগবান তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলে কর্দম তাঁর কাছে পিতার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

তখন ভগবান শ্রীহরি বললেন—স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে বাস করে সপ্তসাগরা ধরণী শাসন করছেন। সেই মনু আগামী পরশুদিন স্ত্রী শতরূপাকে নিয়ে তোমার

আশ্রমে উপস্থিত হবেন। মনুর দেবহূতি নামে একটি কন্যা আছে। তিনি সেই দেবহূতিকে তোমার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্যই আগমন করছেন। তুমি তাকে গ্রহণ করিও।

এত বলি অন্তর্ধান করেন নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হন তখন মহর্ষি কর্দ্দম॥
আমি ঋষি ঐশ্বর্যহীন গৃহহীন অতি।
কন্যা মোরে কেমনে সে দেবে নরপতি॥

মহর্ষি কর্দ্দম চিন্তা করছেন—কবে আসবেন রাজর্ষি মনু। তাছাড়া মনু কি তাঁর কন্যাকে একজন ঋষির হাতে তুলে দেবেন? সন্দেহের দোলায় দুলছে কর্দ্দমের মন।

সত্য সত্যই নির্দ্দিষ্ট দিনে সস্ত্রীক মনু এসে উপস্থিত। ব্রহ্মর্ষিকে দেখে রাজর্ষি মনু নতজানু হয়ে পদধূলি মাথায় নিলেন।

দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষা মে ভবতঃ শিরম্। ৩।২২।৬

—অর্থাৎ আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে আপনার মঙ্গলময় পদধূলি আমি মাথায় ধারণ করতে পেরেছি।

রাজর্ষির সাথে মহর্ষির এই যে সাক্ষাৎকার তা ধর্মজগতের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ। কী অসাধারণ ভক্তি রাজর্ষি মনুর!

তারপর মনু নিজ কন্যা দেবহূতির সাথে কর্দ্দমের বিয়ের প্রস্তাব করলে ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দম তা সাদরে গ্রহণ করলেন।

বিয়ে হল দেবহূতির সাথে কর্দ্দম ঋষির। তারপর কর্দ্দম দেবহূতির পরিচর্য্যায় প্রীত হয়ে প্রজাবৃদ্ধির আদেশ স্মরণ করলেন এবং আপন বিভূতিশক্তি প্রয়োগে এক কামচারী সুবৃহৎ বিমান সৃষ্টি করে তার মধ্যে সুখভোগের নানা উপকরণ সংগ্রহ করলেন এইরূপে সেই বিমান মধ্যে ঋষি দম্পতির শতবর্ষ কেটে গেল। দীর্ঘদিন স্বামীসুখ ভোগ করে দেবহূতি একই দিনে কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভু, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তি নাম্নী নয়টি কন্যা প্রসব করলেন।

কেটে গেল বহুদিন। অবশেষে শ্রীহরি আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য কপিলদেব রূপে দেবহূতির গর্ভে করলেন জন্মগ্রহণ। কর্দ্দম নিজ জীবনের উদ্দেশ্য এখন সফলপ্রায় দেখে সাংসারিক জীবনের শেষ কর্ম সম্পাদন করবার জন্য নয়টি কন্যাকে সম্প্রদান করলেন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের হস্তে। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে যাবার জন্য ইতস্ততঃ করতে থাকলে পুত্ররূপী ভগবান কর্দ্দমকে অনুমতি প্রদান করে বললেন—হে মুনে, আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করছি, তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের কারণ সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করতঃ বনে গমন কর এবং মোক্ষলাভের জন্য আমাকে ভজনা কর।

হে মহর্ষে, আমি স্বপ্রকাশ এবং পরমাত্মস্বরূপ। প্রাণিগণের অন্তরে আমি সর্বদ

বিরাজ করে থাকি। তুমি নিজের মনের দ্বারা আমাকে দর্শন করে অচিরেই মোক্ষপদ লাভ করবে। মায়ের জন্য চিন্তা নেই। আমি মাতা দেবহূতিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করব, ঐ জ্ঞান দ্বারা মাতা মোক্ষলাভ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

● মাতা দেবহূতিকে কপিলদেবের উপদেশ প্রদান ●

একমাত্র ভক্তিযোগ সকলের সার।
ইহা মাত্র পথ নাই জ্ঞান লভিবার॥
সাধু সহবাসে মাতঃ উপজয়ে জ্ঞান।
তাহাতেই ভক্তিলাভ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

পুত্রের কাছ থেকে ঐরূপ আশ্বাসবাক্য শুনে পিতা কর্দম ঋষি সংসার ত্যাগ করে বনগমন করলেন আর পুত্র কপিলদেব মায়ের সান্নিধ্যে বাস করতে লাগলেন বিন্দুসরোবরের এক আশ্রমে।

একদা মাতা পুত্রকে বললেন, বাবা, আমি জানি তুমি পরমেশ্বর ভগবান, জীবের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা। বদ্ধ জীবকে তুমিই সংসার মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পার। মানুষ প্রতি নিয়ত দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তিতে বিরত বোধ করছে। ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারে হচ্ছে পতিত। কিন্তু কিভাবে ঐ মোহান্ধকার কাটিয়ে তারা লাভ করবে মুক্তি?

ভগবান কপিলদেব তখন তাঁর মাতাকে বললেন—তুমি তাহলে শোন মা! মনই আত্মার বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মানুষের মন সর্বদা সত্ত্ব-রজ ও তমোগুনে আসক্ত হয় আর তাতেই উপস্থিত হয় মোহ ও বন্ধন। বিষয়সমূহে আসক্ত মনই বন্ধনের কারণ আর পরমাত্মাতে আসক্ত মনই মুক্তির দিশারী।

—কিন্তু কিভাবে পরমাত্মাতে মন আসক্ত হবে?

—তার জন্য চাই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি মানে মনের শোধন।

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥ ৩।২৫।১৫

তবে এই চিত্তশুদ্ধির জন্য চাই ভক্তি। ভক্তি ছাড়া ভগবান লাভ হতে পারে না। ধ্যানযোগ অবলম্বন করে ব্রহ্মলাভের জন্য ভক্তিই একমাত্র উপায়। ভক্তি সার্বত্রিক।

—কিভাবে মনের মধ্যে ভক্তির ভাব আসবে?

—ভক্তিলাভের জন্য চাই সাধুসঙ্গ। বিষয় সম্পদে আসক্তিরূপ ব্যাধি একমাত্র সাধুসঙ্গরূপ ঔষধে আরোগ্য লাভ করে থাকে। তাছাড়া ভক্তি ও ভগবৎ কৃপা হচ্ছে 'সাধুকৃপাবাহনা'। সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা হয়, ফলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা

জাগে। এই শ্রদ্ধা থেকে আসে ভগবৎ কথায় রুচি আর সেই রুচি থেকে আসে ভক্তি। সাধুসঙ্গ বলতে কেবলমাত্র সাধুর কাছে বসা কিংবা সাধুর সাথে ঘোরাফেরা বোঝায় না। সাধুর সঙ্গে বসে বিষয়চিন্তা করলেও সাধুসঙ্গ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। অতএব হৃদয় নিঃসৃত গভীর ভক্তিদ্বারা একমনে একপ্রাণে পরস্পর ভগবানের কথা আলোচনাই সাধুসঙ্গ।

এই সাধুসঙ্গ থেকে আসে নাম করার ইচ্ছে। নাম করতে করতে জাগে নামীর প্রতি শ্রদ্ধা। আর শ্রদ্ধা থেকে রুচি এবং রুচির পরিপাকে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির পথে শ্রদ্ধা কিন্তু প্রথম সোপান। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই জ্ঞান প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। আর সেই জ্ঞান থেকে আসে শুদ্ধ ভক্তি ও পরা শান্তি।

কপিলদেব বলছেন—সংযতচিত্ত মানবের শ্রীহরিতে নিষ্কাম ভক্তি—মুক্তি থেকেও শ্রেষ্ঠ। 'অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী'। ঐ পরাভক্তি সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরকে ক্ষয় করে দেয়। এই ভক্তিদ্বারাই জীবের জীবন হয় সার্থক।

এরপর কপিলদেব সাংখ্যশাস্ত্র ও ভক্তিবর্দ্ধক ধ্যানযোগ সম্পর্কে বলতে লাগলেন তাঁর মাতাকে—জানলে মা, 'যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্'—যাদের নিকট আমি আত্মার ন্যায় প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, আত্মীয়ের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজ্য—মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ কখনো জন্মমৃত্যুর অধীন হয় না। সর্বভয়হারী শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কোন দেবতাও মানুষের সংসার ভয় দূর করতে পারেন না, কারণ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র তাঁরই শক্তিতে পরিচালিত।

মদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ ৩।২৫।৪২

অর্থাৎ আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, সূর্য উত্তাপ প্রদান করছে, দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ করছেন, অগ্নি দগ্ধ করছে ও যম সর্বত্র বিচরণ করছে—আমারই শাসনের ভয়ে এই সকল দেবতা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছে। এই জন্যই যোগিগণও বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা অনন্তশক্তিশালী শ্রীহরির অভয়পদ আশ্রয় করে থাকেন; 'ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্তি অকুতোভয়ম্।'

ভক্তি তিন প্রকার। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসভক্ত হিংসা ও ক্রোধের অধীন, রাজসভক্ত যশ ও ঐশ্বর্যকামী আর সাত্বিক ভক্ত পাপ ক্ষয় করার জন্য ভগবানে কর্ম সমর্পন করে তাঁর অর্চনা করেন।

এই তিন প্রকার সগুণ ভক্তিই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও আত্মনিবেদন—এই নয় ভাবে প্রকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু এ ছাড়াও নির্গুণ ভক্ত আছেন যারা শ্রীহরির সেবা ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না বা অন্য কোন মুক্তি চান না। মুক্তি পাঁচ প্রকার—(১) সালোক্য—ভগবানের সাথে একত্রে বাস (২) সার্ষ্টি—ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া (৩) সামীপ্য—ভগবানের নিকট

অবস্থিতি (৪) সারূপ্য—ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তি (৫) সাযুজ্য—ভগবানের সাহিত অভিন্নত্ব হয়ে থাকা।

এই পাঁচ প্রকার মুক্তি নির্গুণ-ভক্ত গ্রহণ করেন না। তিনি চান 'মৎসেবনং'—অনন্তকাল ধরে শ্রীহরির চরণ সেবারূপ আনন্দ। তাই নির্গুণ ভক্তগণ সর্ব প্রাণীতে ভগবান বিরাজমান জেনে "মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহুমানয়ন্"—বহু সম্মান করে সকল প্রাণীকে প্রণাম করে থাকেন। এই ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

*　　　　*

এর পর কপিলদেব তাঁর মাতাকে জানালেন পুরুষ প্রকৃতি ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্), পঞ্চতন্মাত্র : (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, ও স্পর্শ)।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক , পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)। এর সাথে যোগ হবে মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্ত। মোট ২৪টি। তিনি তাঁর মাকে অষ্টাঙ্গ যোগের কথাও বললেন।

এরপর কপিলদেব বদ্ধজীবের শেষ জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরলেন তাঁর মায়ের কাছে।

মানুষ এমনই মোহাচ্ছন্ন যে, বৃদ্ধবয়সে রোগগ্রস্ত হয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রদত্ত অন্ন কুকুরের মত ভোজন করে এবং কাশির উপদ্রবে নিশ্বাস টানবার কষ্টে-দুর্বল হয়ে গলায় ঘুর ঘুর শব্দ তুলতে তুলতেও বাঁচবার জন্য সাধ করে। ঈশ্বর বা ভগবানের নাম স্মরণ করে না। তাই আমি বলছি মা, তুমি সিদ্ধযোগ অনুষ্ঠান করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ কর। অচিরেই মুক্তি লাভ করবে।

এই আশ্বাসবাণী প্রদান করে কপিলদেব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হয়ে ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য যোগসাধনায় মনোনিবেশ করলেন। সমুদ্র তাঁকে পুজার অর্ঘ্য ও বাসস্থান দান করল। তিনি আজও ত্রিভুবনের মঙ্গল কামনায় যোগ সমাহিত হয়ে আছেন সাগরসঙ্গমে।

এদিকে জননী দেবহূতি পুত্র উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গিক যোগ সাধনার দ্বারা দিনাতিপাত করতে লাগলেন। অষ্টাঙ্গিক যোগ বলতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

দেবহূতি ভগবানের স্তব করে বললেন, হে ভগবান্ তোমাকে যে নিয়ত স্মরণ করে সে চণ্ডাল হলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যে তোমার নাম উচ্চারণ করে, তার তপস্যাই সার্থক তপস্যা।

এইরূপে কপিলোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বন করে অল্পকালের মধ্যেই তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। আজও সেই পুণ্যক্ষেত্র 'সিদ্ধপদ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

দেবহূতি সিদ্ধিলাভ করে যেই স্থানে।
'সিদ্ধপদ' নামে খ্যাত হয় ত্রিভুবনে॥

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● দক্ষযজ্ঞ ●

সতীনারী গৃহকর্ম করিবে সতত।
স্বামী অভিলাষপূর্ণ করিবে নিয়ত ॥

কপিলদেব ও দেবহূতির কাহিনী শুনে আগ্রহী বিদুর ভাবে বিহ্বল হয়ে প্রজাপতি দক্ষের সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

তখন মৈত্রেয় বললেন, পুরাকালে প্রজাপতিগণের সত্র নামক যজ্ঞে ঋষি, দেব ও মুনিগণ সকলে সমবেত হয়েছিলেন। এমন সময় প্রজাপতি দক্ষ সেখানে প্রবেশ করলে ব্রহ্মা ও মহাদেব ছাড়া অপর সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে দক্ষকে জানালেন অভ্যর্থনা। এতে দক্ষ মহাদেবের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে তিনি শিবকে মর্কটলোচন, অবিনয়ী, উন্মাদ বলে তিরস্কার করে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন। ঐ সময় আরও একটি অভিশাপ দিলেন—দেবগণের মধ্যে শিব কোনদিন যজ্ঞভাগ পাবে না।

নন্দী দাঁড়িয়েছিল সামনে। মহাদেবের নিন্দা শুনে ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে দক্ষকে দিল অভিশাপ—তুমি যেমুখে শিবের নিন্দা করেছ সে মুখে আর শুভবাণী উচ্চারিত হবে না। তোমার দেহাত্মবুদ্ধি জাগবে। মকুটশোভিত মস্তকের পরিবর্তে তোমার ছাগমুণ্ডু হবে।

এই কথা শুনে ভৃগুমুনি দক্ষের পক্ষ অবলম্বন করে শিবভক্তগণকে পাষণ্ড ও স্বেচ্ছাচারী বলে নিন্দা করতে লাগলেন—দূর হ পাষণ্ড। তা না হলে এক নিমেষেই ভস্মীভূত করে ফেলব।

সভায় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হল। কিন্তু মহাদেব একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না। মহাযোগী মহেশ্বর বহুদূরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরিণামের কথা ভাবতে লাগলেন শুধু।

কেটে গেল বহুদিন। শ্বশুর জামাইয়ের মনোমালিন্য কিন্তু দূর হল না। ঐ দুই আত্মীয়ের আত্মীয়তার মাঝখানে একটা অশান্তির কালো ছায়া গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

তারপর ব্রহ্মা একদা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করলে দক্ষের মনে অতিশয় গর্ব উপস্থিত হয়। এই গর্বের দ্বারা শিবকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি 'বৃহস্পতিসব' নামে একটা বিরাট যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞে মহাদেব ব্যতীত—অপর দেবতাগণ, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও পিতৃগণ সকলেই নিজ নিজ পত্নীসহ আমন্ত্রিত হলেন।

সতী কৈলাস পর্বত থেকে লক্ষ্য করেছেন, বেশ কয়েকদিন ধরে কলহংসের ন্যায় আকাশপথ দিয়ে বিমানশ্রেণী উড়ে চলেছে। পরে নারদের মুখে জানতে পারলেন যে তাঁর পিত্রালয়ে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। তাই সস্ত্রীক দেবতাগণ গমন করছেন।

মনে মনে বিরত বোধ করলেন দক্ষরাজ নন্দিনী। তাঁর মানসনেত্রে ভেসে উঠল মাতা পিতা আর ভগ্নীদের মুখচ্ছবি। পিতৃসকাশে যাওয়ার জন্য হয়ে উঠলেন ব্যাকুল।

সেই ব্যাকুলতায় মুহ্যমান হয়ে দাক্ষায়নী স্বামীর পদপ্রান্তে গমন করে বললেন —ওগো তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি পিতার যজ্ঞালয়ে যাব।

মহাদেব বললেন—তোমার পিতা যে যজ্ঞ করছেন তা তোমাকে জানাল কে?

—আমি দেবর্ষির কাছ থেকে শুনেছি। তাছাড়া সমস্ত দেবতারা আকাশপথে বিমানে চড়ে চলছে আমার পিতৃগৃহে। পিতামাতাকে দেখার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠছে। তুমি আমাকে অনুমতি দাও প্রভু!

মহাদেব বললেন—পিতার নিমন্ত্রণ না পেয়ে তুমি সেখানে যাবে কেমন করে ভবানী? সেখানে গেলে সমাদর পাবে না। আমি তোমার স্বামী—এই পরিচয় প্রজাপতি দক্ষ কোনদিন সহ্য করতে পারেন নি।

কিন্তু জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী মাকে দেখার জন্য আমার মন বারবার ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তুমি তো জানো প্রভু—পিতৃগৃহে, গুরুগৃহে ও পতিগৃহে আমন্ত্রিত না হয়েও যাওয়া যায়। এতে সম্মান অসম্মানের কোন ব্যাপার নেই। আমি যাই স্বামী—তুমি আমাকে অনুমতি দাও!

সতীমায়ের বারবার অনুরোধ শুনে ধূর্জটি একটু কঠোর ভাবেই বললেন— তোমার সব কথাই ঠিক কিন্তু দক্ষরাজার সেদিনকার সেই কটূক্তি ও নিন্দার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তুমি কি জানো না যে পতিনিন্দা পত্নীদের কাছে সবচেয়ে বেশী অপমানজনক। আমি তাই বলছি সতী, সেখানে গেলে তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে। অশান্তিতে ছেয়ে যাবে যজ্ঞালয়। দুঃখের কালো মেঘ এসে অন্ধকার করে দেবে সমস্ত দক্ষপুরী।

—স্বামী!

সম্মান ও প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তব্যক্তি যখন আত্মীয়গণের নিকট অপমানিত হন তখন তা মরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যোমরণায় কল্পতে।'

তথাপি সতী নাছোড়বান্দা। অবশেষে যখন উনষাট জন ভগ্নী যজ্ঞালয়ে যাওয়ার পথে কৈলাসে নেমে সতীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন সতী আর থেমে থাকতে পারলেন না। পিতৃযজ্ঞ দর্শনের কৌতূহল, মাতা ভগ্নীদের সাথে

[illegible]ত হওয়ার বাসনা, পতি নিন্দার আশংকা, [illegible]
একসাথে মিলে মা দাক্ষায়ণীর কোমল হৃদয়ে [illegible] তুলেছে। তাঁর মনের মধ্যে
সৃষ্টি হল গভীর দ্বন্দ্ব।

তাই স্বদেশের [illegible] একবার ঘরের ভেতর যাচ্ছেন আর একবার বাইরে। একস্থানে স্থির হয়ে [illegible] থাকতে পারছেন না। কখনো বা কাঁদছেন কখনো বা ভাবছেন—কখনো বা অভিমান করে বসে থাকছেন।

কিন্তু বাবা ভোলানাথ সংকল্পে অটল। মহাযোগী মহাধ্যানে মগ্ন।

মহাদেবের এইরূপ নির্বিকার ছবি দেখে সতীর ক্রোধ ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল। তিনি ক্রোধে গরগর করতে করতে সাধারণ গৃহবধূর মতো উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগলেন এবং স্বামীর দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি দিতে লাগলেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র আজ শিথিল ও বিপর্যস্ত। চক্ষে দরদর বিগলিত অশ্রুধারা—কখনো বা অগ্নিবর্ষণকারী দৃষ্টি। ওষ্ঠাধরে অব্যক্তভাষার ইঙ্গিত। ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠে তাঁর হাতের বলয়। পদঝংকারে কৈলাশ কম্পমান।

তা লক্ষ্য করে মহাদেব অতি ধীরভাবে পুনরায় বললেন—[illegible] সত্ত্বেই সেখানে যাওয়া চলবে না। [illegible] আমাকে অপমান করে তাদের [illegible] তোমার এতটুকু নেই? তবু যদি যেতেই চাও তাহলে [illegible] ত্যাগ করে চলে যাও!

ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত মুখবিকৃত করে গর্জন করতে করতে বললেন মা ভবানী—তুমি আজ আমাকে যতই বাধা দাও—যতই তিরস্কার কর আমি যাবোই। তোমার কোন কথাই শুনব না। মাতা আর ভগ্নীদের দেখার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমার মাতা আমার জন্য কত না কাঁদছেন আমার অদর্শনে ভগ্নীরা কাতর হয়ে উঠছেন। তাঁদের মুখস্মৃতি আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলছে। তাইতো আত্মীয়স্বজনদের দেখার জন্য আমি আজ উন্মাদিনী—আমি পাগলিনী।

পাগল মহাদেব কিন্তু ধীর স্থির। আত্মবিস্মৃতা সতী আজ পাগলিনী। সেই পাগলিনীর মনে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা—দক্ষ পুরীতে যজ্ঞ দেখে পিতার গৌরবে গরবিনী হবেন—পিতার মর্য্যাদায় হবেন মর্য্যাদাসম্পন্না। তাইতো তাঁর আজ এত চঞ্চলতা—এত উদ্বিগ্নতা—এত অনমনীয়তা।

এইভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সতীমা আমার একাকিনী কৈলাস পরিত্যাগ করে দক্ষভবনের দিকে যাত্রা করলেন। দাক্ষায়নীর জীবনের সে কী এক ভয়ংকর মুহূর্ত! সে কী ভীষণ পরিস্থিতি! তাঁর দুরন্ত পদঝংকারে ধরিত্রী কম্পমান। তথাপি মহেশ্বর যোগযুক্ত—নির্বাক-নিস্পন্দ।

সতী ছুটছেন প্রচণ্ড উত্তেজনায়—দ্রুতবেগে। বন্ধুর পথ পার হয়ে মাঠ ঘাট বন প্রান্তর গিরি গুহা অতিক্রম করে ভয়ংকর পদবিক্ষেপে সবুজের দেশে বনানীর কোলে যেন মিলিয়ে যাচ্ছেন তিনি। অনন্ত আকাশের হাতছানি, দিকচক্রবালের

মাতাল আহ্বান উপেক্ষা করে চলেছেন সতী। পথের দুপাশের তরুরাজি যেন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। সতীর মন যেন মুহূর্তের মধ্যেই যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হতে চায়। সতীমা ছুটছেন দুরন্ত গতিতে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই…তিনি আজ আগে আগে…সবার আগে… ছুটে চলেছেন এক নিবিড় ছন্দে।

দ্রুতগমনকারিণী সতীকে পথে একাকী দেখে বিস্ময়াবিষ্ট নন্দীভৃঙ্গী তাঁকে অনুসরণ করল। সাথে নিয়ে গেল মহাদেবের বৃষভকে।

তারপর পথিমধ্যে সতীকে সেই বৃষভের উপর আরোহণ করিয়ে হস্তে একটি পদ্ম প্রদান করল। শ্বেতচ্ছত্র তুলে ধরল মাথার উপর। গলদেশে সুরভিত পুষ্প-সমূহের মালা প্রদান করে চামর হস্তে তাঁকে ব্যজন করতে করতে দুন্দুভি শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে মুখরিত করে তাঁর সাথে দূরপথভূমি অতিক্রম করতে লাগল।

রাজরাজেশ্বরী একাকিনী পিতৃসকাশে চলেছেন। তাঁর সুচারু অঙ্গে আজ কোন অলংকার কিংবা মহাদেবের আশীর্বাদস্বরূপ মহামৃত্যুঞ্জয় রক্ষাকবচ নেই। শিবানীর সাথে নেই আজ শিব। ভবানী চলেছেন ভবানীপতিকে ছেড়ে। অন্তর তাঁর যাচ্ছে পুড়ে। সমস্ত পথটা তিনি কি ভেবে ভেবে যাচ্ছিলেন তা তিনিই জানেন।

আর মহাযোগী মহেশ্বর! তিনি যে কিরূপ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তা নারায়ণ ভিন্ন আর কেউ জানতেন না।

ক্রমে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন সতী। সেখানে তখন বলিপ্রদত্ত পশুর চীৎকারের সাথে বেদমন্ত্র সমুচ্চারিত হয়ে চারিদিক হয়ে উঠেছিল মুখর। ব্রাহ্মণ, ঋষি ও দেবগণ সেখানে সমাদৃত হয়ে ছিলেন উপস্থিত। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, কাঞ্চন, কুশ, চর্ম, নৈবেদ্য, কদলীপত্র, যজ্ঞীয় দ্রব্য নিমিত্ত পাত্রসমূহ চতুর্দিকে সুবিন্যস্ত। কদলী বৃক্ষ বিল্ব আম্রপত্র ও ঘটে সেই স্থান ছিল সুসজ্জিত। স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞের মধ্যভাগে সগৌরবে দণ্ডায়মান।

কন্যা সতী এসে প্রণাম করলেন পিতাকে। কত আশা নিয়ে; কতশত মানসিক দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য পূর্বক আজ দাক্ষায়নী মা আমার পিতৃগৃহে এসেছেন।

কিন্তু হায়! একি হল? সহসা যেন চমকে উঠল যজ্ঞস্থল। স্নেহময় পিতা একটি স্নেহপূর্ণ কথাও বললেন না। অনাদৃতা ভিখারিণীর মত সেই বিরাট যজ্ঞস্থলীতে সমগ্র দেব-ঋষি ও ব্রহ্মণগণের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে স্থির হয়ে রইলেন দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে অপসারিত পিতার চক্ষু আর দাক্ষায়নীর অশ্রু ছল-ছল চোখদুটি পিতার মুখের উপর অনিমেষ দৃষ্টিতে বিন্যস্ত। সে এক দুর্বিষহ মর্মান্তিক মুহূর্ত! সেই ভীষণ মুহূর্তের সুনিপুণ রেখাচিত্র অংকন করা মাদৃশ শফরী জনের পক্ষে সুদূরপরাহত।

সেই যজ্ঞসভায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ছাড়া অন্যান্য দেবতারা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু প্রজাপতি দক্ষের ভয়ে কেউ সতীকে সমাদর করতে সাহস করলেন না।

তখন সেই অনাদৃতা কন্যাকে দক্ষের অবজ্ঞা ও দেব ঋষিগণের উদাসীনতা থেকে রক্ষা করার জন্য কেবলমাত্র স্নেহশীলা মাতা অন্তঃপুর থেকে যজ্ঞসভায় এসে উপস্থিত হলেন এবং সতীর উত্তপ্ত হৃদয়ে শীতল স্নেহবারি সিঞ্চন করার জন্য স্বীয় কোড়ে আকর্ষণ পূর্বক স্নেহভরে করলেন আলিঙ্গন।

বিরাট যজ্ঞশালা, ঋষিগণের বেদধ্বনি আর দক্ষের কঠোরতা সব ঢাকা পড়ে গেল মা আর মেয়ের মিলনে—দক্ষপত্নী আর দাক্ষায়নীর আলিঙ্গনে। পশুবধের চীৎকার আর শোনা গেল না—থেমে গেছে সব মন্ত্রধ্বনি শঙ্খধ্বনি আর সংগীতের রাগ-রাগিণী। যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সহসা যজ্ঞসভা স্তম্ভিত হয়ে গেল—সব গীত থেমে গেল আর সেই নীরবতাকে ভঙ্গ করে নারীকণ্ঠোত্থিত মা ও মেয়ের স্নেহপূর্ণ কয়েকটি অস্পষ্ট কথাকলি সেই পরিবেশকে করে তুলল দুঃসহ বেদনাময়।

দক্ষ কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না এই দৃশ্য। সক্রোধে সতীকে গালিগালাজ করতে লাগলেন। শিবনিন্দায় সারা সভাকে করতে লাগলেন ব্যতিব্যস্ত।

আর তখনই সতীর মন হয়ে উঠল চঞ্চল। তথাপি তিনি করুণ ও বিনীতভাবে পিতাকে বললেন—পিতা, আমার স্বামী পবিত্রকীর্তি। তাঁর শাসন অলঙ্ঘনীয়, দুটি অক্ষরযুক্ত তাঁর পবিত্র শিব নাম কেউ যদি অমনোযোগেও উচ্চারণ করে তাহলে তার জন্মজন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব আমার স্বামীর নিন্দা আপনার পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলজনক বাবা!

—আজ আমি তোর কোন কথাই শুনব না। সেই পাশবিক শক্তিধর জ্ঞানহীন আত্মমর্যাদাশূন্য শ্মশানচারীটার নাম আমার সামনে আর উচ্চারণ করিস না। তুই ধ্বংস হ।

—একি বলছেন পিতা! আপনার জামাতা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তিনি সর্বভূতের আত্মা। তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই—তিনি সকল বৈরিতার উপরে। আপনি অযথা তাঁর সাথে শত্রুতা করছেন কেন?

—সতী!!

—আমি আর পতিনিন্দা সহ্য করতে পারছি না পিতা—আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

তথাপি দক্ষের রোষ বেড়েই চলল। এতটুকু দয়ার উদ্রেক হল না তার হৃদয়ে। কর্কশবচনে অশ্রাব্য ভাষায় আরো গালিগালাজ করতে লাগলেন জামাইকে।

আর সতীমা অসহ্য স্বামীনিন্দা বুকে নিয়ে তীব্রভাবে রোষ কষায়িত নেত্রে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে বলে উঠলেন—

অতস্তব উৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে
শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো জুগুপ্সিতস্য
উদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥ ৪।৪।১৮

আপনি নীলকণ্ঠের নিন্দা করলেন—এ নিন্দা আমারই। তাই আপনার দেহ থেকে উৎপন্ন আমার এ দেহ আমি এখুনিই পরিত্যাগ করব। অজ্ঞানবশতঃ যদি কেউ অপবিত্র অন্নভক্ষণ করে, তাহলে সেই অপবিত্র অন্ন বমন করে শরীর থেকে বের করে দেওয়াই ভাল। সেটাই আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায়।

পাপ হইতে জন্ম যার পাকে কে নিলয়।
ধিক্ শত ধিক্ এই দেহ ইহা পাপের আলয় ॥

'সতী' বলে সস্বরে চীৎকার করে উঠলেন দক্ষ।

—না না, ঐ মুখে সতীর নামোচ্চারণ আর মানায় না। আপনার ন্যায় দুর্জনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থাকায় আমি লজ্জিত 'ব্রীড়া মমাভূৎ কুজন প্রসঙ্গত'—একথা বলে সতী তাঁর পতিদেবতা মহাদেবের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই যোগ প্রভাবে নিজ দেহকে ভস্মীভূত করে ফেললেন।

ত্রিভুবনে পড়ে গেল কান্নার রোল। কন্যার শোকে দক্ষপত্নী হলেন মূর্চ্ছিতা। আর প্রজাপতি দক্ষ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই ভস্মীভূত কন্যার-পানে। কি দারুণ শোক! বিস্ময়!!

[কিন্তু কালিকাপুরাণে ও দেবীভাগবতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করার বিবরণ আছে।]

উপরের শ্লোকটির উচ্চারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ 'দ্ধ, দ্ধি, ন্ধ' যুক্তাক্ষরগুলি একটি স্বল্প পরিসর পংক্তির ভেতর পাঁচবার ব্যবহার হয়ে সতীকণ্ঠের নিনাদ ক্রমে ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর, গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়েছে। ভাষার ক্রমবর্দ্ধমানশীল 'ঝংকারধ্বনির' ভিতর দিয়ে কন্যার সাথে পিতার মনের সংঘাত ও রুক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে। দ্ধি, দ্ধ, ন্ধ অক্ষরগুলি নতুন শক্তি সংগ্রহ করে দৃঢ় ঝংকারের সৃষ্টি পূর্বক দক্ষের প্রতি সুতীব্র তিরস্কারের সূচনা করছে।

এদিকে কৈলাসে বসে দেবর্ষি নারদের মুখে সতীর দেহ ত্যাগের কথা শুনে—

ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটিঃ
জটাং তড়িৎ বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্
গম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি ॥ ৪।৫।২

—অতিক্রুদ্ধ মহাদেব অধরোষ্ঠ দংশন পূর্বক ভয়ংকর মূর্ত্তি ধারণ করে বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন স্বীয়জটা ছিঁড়ে গভীর হুংকারে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটা ভূতলে নিক্ষেপ করলেন।

তা থেকে জন্ম নিলেন এক ভয়ংকর বিপুলাকার দানব। নাম তার বীরভদ্র।

বিধিবিষ্ণুশিবস্তুত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

সেই স্তবস্তুতি শুনে মহাদেব আসন থেকে উঠে তাদের আলিঙ্গন করলেন। তখন ব্রহ্মা বললেন—হে যজ্ঞধ্বংসকারী মহাদেব, আজ দেবগণ বিপন্ন। হে শান্তিময়, আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে আপনি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করবেন চলুন।

ভবানীপতি কোনমতেই ব্রহ্মাদি দেবগণের বাক্য অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। পত্নীর মৃত্যুতে কাতর হওয়া সত্বেও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি দেবগণসহ চললেন দক্ষের যজ্ঞালয়ে। আজ তাঁর হাতের ত্রিশূল নড়ছে না। ধূর্জটির ডমরু আজ নিঃশব্দ। শিঙাতেও কোনরূপ শব্দ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে না। বিরাট শোক ও দুঃখের বোঝা বুকে নিয়েও শান্তির পথদর্শনকারী বাবা ভোলানাথ ভুলে গেছেন প্রতিহিংসা। মহতের এমনই গুণ। মহাদেব এমনই উদার।

ক্রমে তাঁরা উপনীত হলেন যজ্ঞালয়ে। মহাদেব নির্বাক। সতীর ভস্মস্তূপ দেখেও অবিচল।

কিন্তু দক্ষকে বাঁচানোর উপায় কি? দক্ষ না বাঁচলে যজ্ঞ সম্পন্ন হবে কি ভাবে?

তখন মহাদেব বললেন—দক্ষরাজ বেঁচে উঠতে পারে কিন্তু ওর নিজের মাথা থাকবে না। কারণ সেটা ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

তারপর মহাদেবের আদেশে ছাগমুণ্ড পরিয়ে দেওয়া হল দক্ষের কাঁধে। মন্ত্রপূত জল দিতে সেই মুণ্ড নিমেষেই লেগে গেল জোড়া।

প্রজাপতি দক্ষ যেন নিদ্রা থেকে উত্থিত হলেন। সহসা আশুতোষকে দেখে তাঁর স্তব করতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু কন্যার কথা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল।

আবার যজ্ঞ আরম্ভ হল। ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে দক্ষ শ্রীহরিকে করলেন স্মরণ।

তখন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণ গরুড়ে আরোহণ করে সেই যজ্ঞভূমিতে হলেন সমাগত। মহাদেবকে করলেন আলিঙ্গন।

দক্ষ বললেন—হে নারায়ণ! মহেশ্বরকে যে অপমান করেছিলাম তার উপযুক্ত শাস্তি আমি পেয়েছি। এই শাস্তিই যেন আমার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে।

মহাদেব নিন্দার দিনে যেমন নির্বাক ছিলেন আজ স্তুতিতেও তেমনি নির্বাক।

নারায়ণ তখন হাসতে হাসতে বললেন—

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্! স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪।৭।৫৪

—যারা সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান শ্রীহরির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কোন প্রভেদ দর্শন করেন না, তাঁরাই পরমশান্তি লাভ করে থাকেন।

মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হল।

তারপর সমস্ত দেবতাগণ নারায়ণের স্তব আরম্ভ করলেন।

শ্রীহরি তখন তুষ্ট হয়ে বললেন—হে দেব, ঋষি ও প্রজাপতি দক্ষ! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-

মহেশ্বর তিনজনে একই সত্তা। মাথা আর হাতকে কি কেউ নিজের থেকে পৃথক মনে করে? সেইরূপ আমরা তিনজন এক। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন করে দেখা অপরাধ। তাছাড়া আমিই স্বীয় শক্তিভূতা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় করে থাকি।

[আলোচনা]

শ্রীনারায়ণের কথাগুলি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি মহাপাপ। গোপীগণ কাত্যায়ণীর পূজা করে কৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন দুর্গার স্তব করে তবে জয়লাভ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও সীতা উদ্ধারের সময় মহামায়ার পূজা করেছিলেন। অতএব আমার বক্তব্য, কৃষ্ণভক্তগণ যেন শ্রীদুর্গার প্রতি বিভেদবুদ্ধি না আনেন।

কৃষ্ণের বলে বলীয়ান অর্জুনও যুদ্ধ জয়ের আশায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রণোদিত হয়ে দেবী দুর্গার স্তব করেছিলেন। এই স্তব মানুষকে অভীপ্সিত ফল দান করে। তাই কৃষ্ণ পূজার পরেও এই স্তব মানুষের আধিব্যাধি বিপদ আপদ দূর করে। এই দেবীস্তুতি মন্ত্রশক্তি অর্জন করে ধর্মজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্যে! মন্দরবাসিনি।
কুমারি, কালি, কাপালি, কপিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলে॥
ভদ্রকালি, নমস্তুভ্যং মহাকালি, নমোঽস্তুতে।
চণ্ডি, চণ্ডে, নমস্তুভ্যং তারিণি, বরবর্ণিনি॥
কাত্যায়ণি, মহাভাগে, করালি বিজয়ে, জয়ে।
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে, নানা ভরণ ভূষিতে।
অট্টশূলপ্রহরণে, খড়্গাখেটকধারিণি।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে, নন্দগোপকুলোদ্ভবে॥
মহিষাসৃক্ প্রিয়ে! নিত্যং কৌশিকি, পীতবাসিনী।
অট্টহাসে কাকমুখি, নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে॥
উমেশাকম্ভরি, শ্বেতে, কৃষ্ণে, কৈটভনাশিনি।
হিরণ্যাক্ষি, বিরূপাক্ষি, সুধূম্রাক্ষি, নমাঽস্তুতে॥
বেদশ্রুতি মহাপুণ্যে, ব্রহ্মণ্যে, জাতবেদসি।
জম্বুকটকচৈতেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে॥
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রাচ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি, দুর্গে, কান্তারবাসিনি॥
স্বাহাকারঃ স্বধাচৈব কলাকাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে॥
স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎ প্রসাদাৎ রণাজিরে॥

কান্তার ভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥
ত্বং জম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈবচ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥
তুষ্টি পুষ্টি-ধৃতি দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্দ্ধিনী।
ভূতি ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবভক্তগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতায় যে সমস্ত বিভূতি আরোপ করে থাকেন সেই সমস্তই উল্লেখ করে অর্জুন শ্রীদুর্গাদেবীর কৃপা ভিক্ষা করেছেন। আমাদের শাস্ত্রসমূহে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিরোধিতার কোন প্রশ্রয় কোথাও দেওয়া হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

● ধ্রুবের ভগবৎদর্শন ●

একান্ত মনেতে ভজ হরির চরণ।
অনায়াসে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন ॥

দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করে মৈত্রেয় ঋষি মহাভক্ত ধ্রুবের উপাখ্যান আরম্ভ করলেন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একদিন ইচ্ছা করলেন—আপন দেহকে দুভাগে ভাগ করবেন। দেবতাদের ব্যাপার তো! তারা সব কিছু সম্ভব করতে পারে। নারায়ণের নাভিস্থল থেকে যদি তাঁর নিজের জন্ম হয় তাহলে তিনিও নিঃসন্দেহে যা খুশী সৃষ্টি করতে পারেন আর করেছেনও তাই।

যাই হোক, ধ্যান করতে করতে স্বয়ং ব্রহ্মা নিজের অংশ দিয়ে একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী সৃষ্টি করলেন। পুরুষটি হলেন মনু আর স্ত্রী হলেন শতরূপা। ঐ মনু আর শতরূপাকে একত্রে রেখে দিলেন কিছুদিন। ক্রমে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে মিলনেচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। আর এই ইচ্ছার ফলেই রতিক্রীড়ায় মগ্ন হয়ে কাটাতে লাগল দিনের পর দিন। ফলে তাদের দুটি সন্তান জন্মাল। একটির নাম উত্তানপাদ আর একটির নাম প্রিয়ব্রত।

উত্তানপাদ ক্রমে বড় হয়ে রাজা হন। মহাপরাক্রমশালী সেই রাজা। তাঁর দুটি রানী—সুরুচি আর সুনীতি। সুরুচির গর্ভে একটি ছেলে জন্মায়। তার নাম উত্তম আর সুনীতিরও একটি ছেলে হয়—নাম তার ধ্রুব।

রাজা সুরুচিকে বেশী ভালবাসেন। কারণ তিনি বড় রানীতো—তাই। আর সেজন্যই তাঁর ছেলে উত্তমকে কোলে নিয়ে সিংহাসনে বসেন, আদর সোহাগ আর চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে রাখেন।

একদিন উত্তানপাদ সিংহাসনে বসে আছেন—তা দেখে ধ্রুব বাবার কোলে উঠে সিংহাসনে বসতে চাইল। সুরুচি বললে—ধ্রুব, তুমি সুনীতির ছেলে। রাজসিংহাসনে তোমার কোন অধিকার নেই। শ্রীহরির তপস্যা কর, যদি পরের জন্মে আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে পার, তবেই এই রাজসিংহাসনে বসার অধিকার পাবে।

বিমাতার কথা শুনে পাঁচ বছরের বালক ধ্রুব কাঁদতে কাঁদতে গেল মায়ের কাছে। মা আদর করে কোলে নিয়ে বললেন—কেঁদো না বাছা! কেঁদে কোন লাভ হবে না। যে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে সে নিজেই একদিন দুঃখ পাবে। এ সংসারে আঘাতের প্রতিঘাত আছে আর আছে ব্যথার প্রতিফল। এমনকি মনে মনেও অপরের অনিষ্ট চিন্তা করলে তার প্রতিঘাত অনিষ্ট চিন্তাকারীর জীবনে অবশ্যম্ভাবী। মন নিয়েই মানুষের ধর্ম। ইন্দ্রিয়গণ মনের আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র। অন্তর যদি পাপচিন্তায় কলুষিত হয়ে থাকে, তাহলে ভগবানকে পত্র-পুষ্প দিয়ে পূজা করলে সে পূজা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অপরের অনিষ্ট চিন্তা করে মানুষের জীবনে যে কতদূর ক্ষতি হয় তা মানুষ জানে না। তাই শাস্ত্রকারগণ বলেন যে সুরাপূর্ণ কুম্ভকে ছিপি এঁটে যদি সহস্র বছর গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলেও সুরাকুম্ভ পরিশুদ্ধ হয় না। মনের ভেতর অসৎ চিন্তাকে ছিপি এঁটে রেখে বাইরের সৎ ক্রিয়াকলাপ সবই নিরর্থক। আমাদের সর্ববিধ পাপের মধ্যে অপরের অনিষ্ট চিন্তাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। আর সুরুচি তোমাকে ঠিকই বলেছেন। তুমি একান্তভাবে শ্রীহরির ভজনা কর। হরির ভজনা না করে কেউ কখনো কি রাজা হতে পারে বাবা? যাঁর পাদপদ্ম সেবা করে ব্রহ্মা পেয়েছেন ব্রহ্মপদ, মুনিরা যাঁর পাদবন্দনা করে হয়েছেন মননশীল আর পেয়েছেন ঋদ্ধি—তুমি সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে প্রাণভরে তোমার মনের কথা জানাও। ব্যাকুল হয়ে ডাকো। ব্যাকুলতাই সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়। শ্রীহরি ছাড়া তোমার এ দুঃখ আর কেউ দূর করতে পারবে না বাছা!

শ্রীহরি দুঃখের সহায়—বিপদের বন্ধু। তিনি বিপদ ভঞ্জন পতিত পাবন। অধম পতিতদের উদ্ধার করাই তাঁর কাজ। তাঁকে যে ব্যক্তি যেমন ভাবে ডাকে সে সেই ভাবেই সিদ্ধি লাভ করে। তাঁরই কৃপায়—

গ্রহগণ চলে রবি শশী দেয় কর।
জীবের জীবন রাখিতে পবন সেবিছে নিরন্তর॥

তাঁর করুণায় বৃক্ষে ফুটছে ফুল—বর্ষা দিচ্ছে বৃষ্টি—মাঠ দিচ্ছে ফসল—পাখীরা করছে গান, সূর্য দিচ্ছে আলো আর চন্দ্র দিচ্ছে জ্যোৎস্না। এমনকিও যমদূতগণ তাঁর ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত।

তাই তুমি সেই পরমপিতাকে ডাকো বাবা—তাঁরই আশ্রয় নাও। এ সংসারের মায়া মোহ-ঈর্ষা-হিংসা, অনাচার আর কুআচারকে দূরে ফেলে দিয়ে হরির নাম গানে হয়ে উঠ মাতোয়ারা। এই মায়াময় সংসারসমুদ্রে হরিচরণই একমাত্র ভেলা। ঐ ভেলায় চড়ে আমাদেরকে পার হতে হবে।

মায়ের কথা শুনে ধ্রুব আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সর্বদা 'হরি—দেখা দাও—দেখা দাও' বলে ব্যাকুল ভাবে ডাকতে লাগল। এধার ওধারে অন্ধকার কক্ষে গিয়ে শুধু বলতে লাগল উন্মাদের মতো—কোথা তুমি নারায়ণ দেখা দাও—আমি মহাদুঃখে পড়ে কাতর হয়ে উঠেছি। আমার দুঃখ দূর কর হে হরি! ওগো ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু পতিতপাবন জনার্দন—ওগো নিখিল সংসারের সন্তাপহরণকারী হরি! ওগো অভয় করুণাসাগর দীনবন্ধু, সর্বজীবের জীবন—তুমি একবার এ অধমে দয়া করে দেখা দাও!

পঞ্চমবর্ষীয় বালকের একী অসামান্য হরিপ্রেম! কি নিবিড় হরিভক্তি—কী অসাধারণ মনোবল! হরিকে তার চাই। সে হরিপ্রতিজ্ঞ—হরিপ্রাণ। প্রাণ পুরুষের আকর্ষণ লেগেছে তার দেহের কানায় কানায়। তার রক্তের তরঙ্গে তরঙ্গে হরি প্রেমের সুধা বয়ে যাচ্ছে। এ তার পূর্ব জন্মের সুকৃতি ছাড়া আর কি হতে পারে?

দিনের পর দিন হরি অন্বেষণে ব্যর্থ হয়েও তার মনে আসছে না বিতৃষ্ণা। হরির জন্য কখনো সে কাঁদছে অতি সন্তর্পণে। আচম্বিতে চীৎকার করে উঠছে। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে তার মাকে—মা, তুমি বলে দাও, কোথায় আছে সেই হরি? আমার বাবা আমাকে বলেছে—"ঐ বনের দিকে তোর হরি আছে—তুই ঐ দিকে চলে যা"। আমার বিমাতা বলেছে—'ঐ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়। তবে হরিকে দেখতে পাবি!' তুমি বল মা—এসব কি সত্যি?

পঞ্চম বছর বয়স্ক বালকের কথা শুনে মায়ের চোখ দুটি ভরে যায় জলে। সপত্নী বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মানসিক যন্ত্রণার নামাবলী গায়ে দিয়ে করজোড়ে ডাকতে থাকেন প্রাণ গোবিন্দকে—ওগো প্রাণনাথ, আমার বাছাকে তুমি রক্ষা কর। তোমার হাতে তুলে দিয়েছি ওকে—ওগো জল স্থল অন্তরীক্ষের প্রভু! তোমার অভয় হস্ত দ্বারা বালক ধ্রুবকে তুমি রক্ষা কর।

শ্রীহরির জন্যে কাঁদছে জননী—কাঁদছে সন্তান। তবুও টলছে না বৈকুণ্ঠের আসন। টনক নড়ছে না প্রিয়তম-পূর্ণতম ভগবানের। তবে ভক্তকে আর কি করতে হবে? কেমন ভাবে ভজনা করতে হবে! ফল মূল দিয়ে কি তাঁর পূজা করতে হবে?

না-না। ব্যাকুলতাই শ্রেষ্ঠ পূজা। ব্যাকুলভাবে ডাকাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি। ব্যাকুল কণ্ঠে (হরিবিরহে) কান্নাই ভক্তের শ্রেষ্ঠ ভজন—শ্রেষ্ঠ সাধন আর আরাধনা। ব্যাকুল ভাবে ভক্তি সহযোগে ডাকতে ডাকতেই তাকে পাওয়া যাবে।

'ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ নাম স্মরণ—ক্রন্দন॥'—চৈঃ ভাগবত

এইভাবে কাঁদতে থাকলে বৈকুণ্ঠের বাঁশরীর শব্দ এসে পৌঁছায় তার কানে। বুঝি সেই পাগলকরা বাঁশরীর তানে তন্ময় হয়ে মায়ের ভালবাসার মোহ কাটিয়ে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে রাজপুরী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বনপথে শ্রীহরির সন্ধানে।

পুত্রকে না দেখতে পেয়ে মাতা সুনীতি হয়ে উঠলেন পাগলিনী। পুত্র শোকাতুরা

মাতা আকাশ বাতাস ব্যাকুল করে ডাকতে লাগলেন —ধ্রুব—তুই কোথায় গেলি বাপু ফিরে আয়—ফিরে আয়—

অনন্ত আকাশ প্রতিধ্বনি করে যেন বলে—সে নাই হেথায়—

প্রতিবেশীরা বলে—বোধ হয় জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে তোমার ঐ পাগল ছেলে। তাকে ডাকলে আর পাবে কোথায় !

সুরুচি বলে—তার জন্যে কেঁদে লাভ নেই, তাকে যমেই নিয়েছে, তুই এখন শান্ত হয়ে কাজ কর।

কিন্তু সুনীতির মাতৃহৃদয় বাঁধন মানে না, একমাত্র নয়নের মণিকে হারিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন যেন—'মণি হারা ফণী'।

ওদিকে 'কোথা তুমি নারায়ণ—দেখা দাও' বলতে বলতে ধ্রুব ছুটছে শ্বাপদসংকুল বনপথে। হিংস্র জন্তুকে আজ তার ভয় নেই, বুকের মধ্যে অদম্য সাহস, অপরিমিত প্রাণোন্মাদনা। ভাবতরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছে তার মন। ছল ছল করছে আঁখি দুটি দিন নাই, রাত নাই—ভয় বাধা অন্ধকার, অনন্ত দিক্‌চক্রবালের হাতছানি আর দিবাকরের প্রচণ্ড তেজকে উপেক্ষা করে সে ছুটছে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে।

এ দৃশ্য দেখে দেবর্ষি নারদ আর থাকতে পারলেন না। তিনি তার সামনে দেখা দিয়ে তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন—কে তুমি অবোধ বালক ? তুমি কি পথ হারিয়ে ফেলেছ ? তোমার বাড়ী কোথায় ? চলো তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

—না গো ঋষি না। আমি পথ হারাইনি। নাম আমার ধ্রুব। আমি শ্রীহরির সন্ধানে এসেছি। শ্রীহরিকে পাওয়ার জন্য আমি এই বনে তপস্যা করব।

—তুমিতো নিতান্ত শিশু, কি করে তপস্যা করবে ? তপস্যা সে বড় কঠিন ব্যাপার। আর ভগবানকে পাওয়া—সে আরো দুঃসাধ্য ! তাঁর জন্য কত মুনি-ঋষি-সাধু আজীবন তপস্যা করে হয়েছেন ব্যর্থ—ভক্ত করেছে প্রাণপাত—মুনিগণ জন্মে জন্মে নিষ্কাম ভক্তি যোগযুক্ত সমাধির দ্বারা অন্বেষণ করেও তাঁকে জানতে পারেন না। অতএব তুমি বৃথাই ঘুরছ তাঁর জন্যে। যখন সময় হবে, তখন এই বিষয়ে যত্ন করিও। এখন বাড়ী ফিরে যাও। বলেই দেবর্ষি ধ্রুবের মাথায় হস্তস্পর্শ করলেন।

ধ্রুব উত্তর দিলেন—আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি তো দেবর্ষি নারদ—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্বত্র ভ্রমণ করছেন। তবে আমিতো আর জগতের বাইরে নয় যে আমাকে আপনি ছলনা করবেন। এখন আমাকে একটি পথ বলে দিন—কেমন করে কোথায় গেলে পরমপুরুষকে দেখতে পাবো ?

ভক্তের কাছে পরাজিত হয়ে চেয়ে রইলেন নারদ।

—কি হল গুরুদেব ! আমাকে তাড়াতাড়ি বলুন, কিভাবে শ্রীহরির দর্শন পাব ? আমি তাকে না দেখতে পেয়ে যে আর থামতে পারছি না।

দেবর্ষি তখনো নিশ্বাক। করুণার দৃষ্টি দিয়ে পলকহীন নেত্রে চেয়ে রইলেন ধ্রুবের পানে।

ধ্রুব তাঁকে এইরূপে গুরুপদে বরণ করে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বললেন – বিমাতা আমাকে অপমান করেছেন। আপনার ঐ উপদেশ আমাকে ভাল লাগছে না। আমি শ্রীহরির অভয়পদ লাভ করার জন্য পাগল। ছেড়েছি মাতা-পিতা আর রাজপ্রাসাদ। আপনি আমাকে দয়া করে পথ বলে দিন গুরুদেব। শ্রীহরিকে ছাড়া আমি আর কিছু চাই না। আপনার পায়ে ধরি, আপনি আমাকে পথ বলে দিন।

নারদ করুণাঘন কণ্ঠে বললেন—নিশ্চয় বলে দেবো। তুমি অবিলম্বেই তাঁর শ্রীপাদলাভ করবে বৎস। শ্রীহরির চরণবন্দনাই জীবনের একমাত্র পথ ও শ্রেষ্ঠ গতি। যমুনার তীরে মধুবৃন্দাবনে যাও, সেখানে তিনি নিত্য অবস্থান করেন। সেখানে গিয়ে তুমি তাঁকে একমনে ডাকবে আর এই মন্ত্র জপ করবে—

'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

এইরূপে 'দ্বাদশাক্ষরী' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে নারদ সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। আর মনের আনন্দে ধ্রুব ছুটতে লাগল শ্রীবৃন্দাবনের পথে; অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে মুরলীধর শ্যামের সাথে মিলিত হতে ছুটে চলেছে সে। জগতের মানুষের কাছে ধ্রুবতারকা হয়ে থাকার জন্যেই বুঝি সে ধ্রুবের পথে ছুটছে। তার হাঁটার যেন বিরাম নেই। অর্ধাহারে অনাহারে—কখনো বা গাছের ফল খেয়ে তার দিন কাটে। তাছাড়া হরি চিন্তায় তার ক্ষুদে তৃষ্ণা সব শেষ হয়ে গেছে। ছুটছে তো ছুটছে। কী অনন্ত তার হরিপ্রেম। কী দুঃসাহসিক মিলনেচ্ছা একটা পাঁচ বছরের ছেলের।

এইভাবে হরিপ্রেমে নাচতে নাচতে ধ্রুব যমুনার তীরে মধুবৃন্দাবনে প্রবেশ করল। পঞ্চমবর্ষীয় বালক হয়েছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ধ্রুব সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। মাতৃক্রোড় ত্যাগ করে আসাই পঞ্চবর্ষীয় বালকের পক্ষে সর্বস্ব ত্যাগ—সর্বাপেক্ষা কঠিন ত্যাগ।

মহাতীর্থ মথুরায় এসেছে ধ্রুব। মথুরার বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, অণু পরমাণু, সাধুসজ্জন সকলেই যেন তার সাধনার জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে তপস্যায় মগ্ন হল ধ্রুব। তার চোখে সেই রূপ—সেই মুখ—সেই চোখ ভাসতে লাগল ক্রমে ক্রমে—

নবদূর্বাদলশ্যাম যেন জলধর।
পীতাম্বর পরিধান অতীব সুন্দর॥
চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নারায়ণ।
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বদন॥

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভক্তের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে একনিষ্ঠমনা ধ্রুব তার মনকে-

সকল বিষয় থেকে আকর্ষণ করে শ্রীহরির ধ্যানে রত হয়েছে আজ। এরই নাম ভগবৎ প্রেম।

সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদিভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্।
ধ্যায়ং ভগবতোরূপং না দ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্ ॥ ৪।৮।৭৭

—সেই রূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু চোখ খুললেই সব অন্ধকার দেখছি কেন? শ্রীহরি কোথায় লুকিয়ে পড়লেন; ভগবান কি আমার সাথে তাহলে লুকোচুরি খেলা খেলছেন! যেখানেই লুকাও, আজ আমাকে দেখা দিতেই হবে। তুমি দেখা দাও ঠাকুর তুমি দেখা দাও—

কোথা হে পদ্মপলাশলোচন—দেখা দাও—দেখা দাও—

তুমি দাওগো দেখা
প্রাণসখা রাখো পায়—
হরি, মন মজায়ে
লুকালে কোথায়?
তোমা লাগি আমি ছাড়িয়াছি ঘর
ভুলিয়াছি দেশ কাল,
দেখা দাও হরি—কোটি প্রণাম করি
দেখা দাও ব্রজেরই দুলাল।

ধ্রুবের সে কী আকুল কান্না! ব্যাকুল করা আত্মনিবেদন! প্রাণের সাথে প্রাণের সংযোগ। কী অফুরন্ত প্রানোন্মাদনা! সরল বালক ধ্যানযোগের ফলে ছ'মাসের মধ্যে তড়িৎ শিখার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ভগবানকে স্বীয় হৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থলে প্রকাশিত দেখতে পেলেন। কিন্তু তড়িৎ গতিতে আবার তিরোহিত হতে দেখে চক্ষু খুলে সেই রূপকে এবার প্রত্যক্ষ করলেন। ভগবান হরি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

এইরূপে ধ্রুবের অন্তর্বাহিঃ যখন হরিময় হয়ে গেছে, তখন তার প্রতি অঙ্গ যেন হরি ক্ষুধাতুর হয়ে হরিকে মুখের দ্বারা চুম্বন করতে লাগল আর বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করে তাঁকে প্রণাম করল ভূমিষ্ট হয়ে।

তখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ বললেন—

উঠ বৎস ত্যাগ কর পূর্ব যোগাচার।
যোগের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে তোমার॥
যাহা ইচ্ছা মাগ বর আমি দিব তায়।
কি কাজ বিমর্ষ ভাবে থাকিয়া হেথায়॥

ধ্রুব তখন নতজানু হয়ে করজোড়ে বললে—

তুমি কি প্রাণের হরি ওহে নারায়ণ।
সুখ দুঃখ পায় জীব তোমার কারণ॥

হও যদি তুমি নাথ শ্রীমধুসূদন।
বেদেতে যাহার গুণ করিছে কীর্ত্তন॥
হৃদয়ের ব্যথা মোর মিটাও মাধব।
এই মাত্র বর দাও সর্বত্র বৈভব॥

কথাগুলো বলতে বলতে ভাবব্যাকুল নেত্রে অধোদণ্ডায়মান ধ্রুবের উদ্বেলিত মনোভাব ভাষায় প্রকাশিত হতে চাচ্ছে অথচ মুখ থেকে আর ভাষা বেরুচ্ছে না—সর্বান্তর্যামী ভগবান তা বুঝতে পেরে

'কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে।' ৪।৯।৪

—কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান বালকের কণ্ঠদেশ বেদমূর্ত্তি শঙ্খের দ্বারা স্পর্শ করলেন।

আর সেই সঙ্গেই বালক ধ্রুব ভক্তিগদগদচিত্তে বলে উঠল—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যাদ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব মম দেবোদেব॥
জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্য ধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

তার এই স্তুতি শুনে পরমদয়াল প্রাণগোবিন্দ বর দিলেন—বৎস ধ্রুব, গ্রহ, নক্ষত্র ও শিশুমার নামক জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত ধ্রুবলোক তোমার জন্য নির্দিষ্ট রইল। তুমি ভবিষ্যতে সেখানে অবস্থান করবে। আর তোমার বাবা উত্তানপাদ তোমাকে রাজ্য-প্রদান করে বনগমন করবেন। তখন তুমি ছত্রিশ হাজার বছর রাজ্যশাসন করবে। সুরুচির পুত্র চিরকুমার উত্তম হিমালয়ে মৃগয়া করতে গিয়ে যক্ষ কর্তৃক নিহত হলে তার মা পুত্রান্বেষণের জন্য বনে গিয়ে দগ্ধ হবে। তারপর তুমি স্বাধীন রাজ্য উপ-ভোগ করে বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ সমাপন পূর্বক স্বর্গারোহন করবে।

এই বর প্রদান করে শ্রীহরি স্বধামে গমন করলেন।

হঠাৎ চমকে উঠল ধ্রুব। একটা দুঃখ ব্যথার তরঙ্গ এসে তার মনে বারবার আঘাত করতে লাগল।

কিন্তু কেন তার এই দুঃখ?

কারণ সে ভগবানকে পেয়েও বৈকুণ্ঠলাভ করতে পারল না। সে শিশুসুলভ মনোবৃত্তির বশে বৈভব প্রার্থনা করেছিল।

এখন আপনারা হয়ত বলবেন—ধ্রুব শিশু হলেও জ্ঞানবৃদ্ধ। সেতো রাজ্য-প্রাপ্তির সাথে মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠলাভের কথা বলতে পারত।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তার অক্ষয়লোক লাভের আশঙ্কায় ঈর্ষ্যাযুক্ত হয়ে দেবগণ

সেই সময় তার মতিভ্রম ঘটিয়েছিলেন। তাছাড়া নারদও তাকে বৈকুণ্ঠ লাভের কথা বলতে শিখিয়ে দেন নি।

ধ্রুব দুঃখিত চিত্তে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলে রাজা উত্তানপাদ, রাজমহিষী সুরুচি, সুনীতি, ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও বন্ধুগণ তাকে মহাসমাদরে অভিনন্দন জানালেন।

পিতামাতাকে প্রণাম করলেন ধ্রুব। তাঁরাও স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন। খুবই আনন্দিত হলেন সবাই। রাজা নারদের কাছে পূর্বে শুনেছিলেন, ধ্রুবের সাধনার কথা। নিজের তপস্যার বলে পুত্র শ্রীহরির দর্শন পেয়েছে—এ কথা জেনে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না।

ধ্রুবের সমস্ত কথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক। মা সুনীতির গর্বের শেষ নাই। পুত্রকে এক মুহূর্ত না দেখে আর থাকতে পারছেন না।

ধ্রুব বড় হচ্ছে। মা বাবা আর আত্মীয় স্বজনের সোহাগ মেখে, ঈশ্বরের বর লাভ করে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলেন তিনি। তাঁর মুখের জ্যোতিতে ভাসতে লাগল বিশ্বভুবন।

অনন্তর রাজা উত্তানপাদ তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে তপস্যার নিমিত্ত করলেন বনগমন।

শ্রীহরির নির্দেশমত রাজ্য পালনে ব্রতী হলেন ধ্রুব। কিন্তু রাজা হয়েও তাঁর মনে নেই শান্তি। ভগবানকে কাছে পেয়েও তিনি মুক্তি কামনা করতে পারেনি। তাই অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে মনে চিন্তা করেন—দরিদ্রব্যক্তি যেমন মোহবশতঃ রাজার নিকট তুষযুক্ত চাউল প্রার্থনা করে সেইরূপ আমি শ্রীহরির নিকট রাজ্য প্রার্থনা করে মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছি।

তবে তার এ অনুতাপ তপস্যাসম্ভূত সুকৃতির ফল, এই অনুতাপের ফলেই ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অচল ও অনঢ়।

ধ্রুব রাজ্য শাসন করছেন অমিত বিক্রমে।

এদিকে একদা ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গেলে এক যক্ষ তাকে বধ করে। পুত্রের সন্ধানে গিয়ে বিমাতা সুরুচিও প্রাণ হারালেন দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে।

একথা শুনে ধ্রুব যক্ষগণকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য কুবের রাজার অলকাপুরী করলেন আক্রমণ। উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হল। পরে পিতামহ মনুর উপদেশে কুবেরের সাথে করলেন সন্ধি।

শ্রীগোবিন্দকে আপনার এবং সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করে ধ্রুব বহুকাল রাজ্য পালন করলেন। প্রায় ছত্রিশ হাজার বছর। (সে যুগে মানুষের আয়ু ছিল অনেক। তাই ছত্রিশ হাজার বছর শুনে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই।)

অনন্তর রাজা ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুন্য ক্ষয় ও ব্রতনিয়মাদির দ্বারা অশুভ ক্ষয় করে অবশেষে নিজপুত্র উৎকলকে রাজসিংহাসনে প্রদান করত যোগসাধন করার জন্য তিনি বদরিকাশ্রমে হলেন উপস্থিত।

সেই পরম রমণীয় তীর্থে সমাধিমগ্ন হয়ে একদিন চন্দ্রের ন্যায় দশদিক উদ্ভাসিত

করে একটি সুন্দর রথকে আকাশ থেকে নামতে দেখলেন।

ক্রমে সেই রথ ধ্রুবের কাছে এসে হল উপস্থিত। তা থেকে নামলেন শ্রীহরির পার্ষদগণ—সুনন্দ, নন্দ, পদ্মলোচন, শ্যামবর্ণ ও গদাধারীদ্বয়। এই বিষ্ণুদূতেরা ধ্রুবকে তুলে নিলেন সেই রথে। কিন্তু জননী সুনীতির কথা মনে পড়ল ধ্রুবের। মায়ের জন্য তার আজ এই স্বর্গপ্রাপ্তি। ধ্রুবের মনে এই চিন্তা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোভাব বুঝতে পেরে পার্ষদগণ বললেন যে অগ্রেই সুনীতিদেবীর রথে চড়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেছেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বিষ্ণুদূতেরা ধ্রুবকে নিয়ে গেলেন পূর্বনির্দিষ্ট ধ্রুবলোকে। আজও ধ্রুবের কথা মনে করিয়ে দিতে ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে।

* * *

[শিশুমার নামে এক রাজার কন্যা ভ্রমির সাথে ধ্রুবের বিয়ে হয়। ভ্রমির গর্ভে জন্মে ধ্রুবের দুই পুত্র—কল্প ও বৎসর। ইলা নামে এক বায়ুর কুমারীকেও বিয়ে করেন ধ্রুব। ইলার গর্ভে জন্মে উৎকল নামে এক পুত্র। বৎসর গুণবান হলেও উৎকল হরিভক্ত। তাই উৎকল ধ্রুবের পরে রাজা হলেন। উৎকলের পর রাজা হন বৎসরের পুত্র পুষ্পার্ণ ও পৌত্র ব্যুষ্ট। ব্যুষ্টের পর রাজা হন সর্বতেজা। সর্বতেজার পুত্র মনু। মনুর পর রাজা হন উল্মুক। উল্মুকের পর অঙ্গ। অঙ্গের পর রাজা হন বেণ'।]

● বেণ ও পৃথুর প্রতি ভগবৎ কৃপা ●

সব ছাড়ি হরি পদে যে করে আশ্রয়।
সেই জনের হয় সদা বৈরাগ্য উদয়॥

ধ্রুবের বংশাবলীর পরিচয় প্রদান করে মৈত্রেয় ঋষি মহারাজ অংগের উপাখ্যান বর্ণনা করলেন। অংগের বেণ নামে এক দুশ্চরিত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই পুত্রের আচরণে দুঃখিত হয়ে সংসারে বৈরাগ্যবশতঃ মহারাজ অঙ্গ বনগমন করেছিলেন।

বিদুর বললেন—মহারাজ অঙ্গ সচ্চরিত্র অথচ তার কুপুত্র হল কেন?

মৈত্রেয় বললেন—অঙ্গের সংসারাসক্তি কাটানোর জন্য ভগবান কুপুত্র পাঠিয়েছিলেন।

বিদুর বিস্মিত হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে মৈত্রেয় বললেন—অঙ্গ মহারাজ পুত্র কামনা করে একদা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়েও দেবতাগণ এবং শ্রীহরি এলেন না। যজ্ঞ সমাধা হয়ে যাবার পর অঙ্গ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কাছে

জানতে চাইলেন—দেবতাদের না আসার কারণ কি?

ব্রাহ্মণেরা তখন কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে পরে বললেন—মহারাজ, আপনার মহিষীর পিতা অধর্মের অংশ সম্ভূত। ফলে ঐ মহিষীর গর্ভে কোনদিন সুপুত্র জন্মগ্রহণ করবে না। তাই দেবতারা উপস্থিত হন নি।

—তাহলে এই কুপুত্র থেকে আমি বাঁচব কেমন করে?

—সে ভয় নেই মহারাজ। ঐ কুপুত্রই আপনার সংসার মুক্তির কারণ। এ সবই তো ভগবানের ইচ্ছে। তাঁরই লীলা। অতএব দুঃখ করার কিছুই নেই।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস পরে চিন্তিত রাজা আর রাজমহিষী সুনীতার কোলে নেমে এল এক ফুলের মত সুন্দর শিশু। আদর করে শিশুটির নাম রাখা হল বেণ। ক্রমে বড় হয়ে উঠে বেণ। মাতামহের প্রভাবে দৌহিত্র বেণ হয়ে উঠে দুরন্ত চঞ্চল। জগতে হেন কুকর্ম নেই যা সে করেনি। পিতা তাকে বাধা দিয়েও ঠিকপথে পরিচালিত করতে পারেন নি।

ঐ পুত্রের কীর্ত্তিকলাপ দেখে মহারাজ অঙ্গ ভাবছেন—সংসারের অতুল ঐশ্বর্য আজ আমার মোটেই ভাল লাগছে না। সব যেন তিক্ত লাগছে। সুপুত্র যদি হোত তাহলে আমি মায়া মোহে জড়িয়ে পড়তাম। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা হোত না। তাই কুপুত্রই বরং ভাল। ভগবান যথার্থই বিচার করেছেন। সংসারের প্রতি অনাসক্তি আনানোর জন্য ঈশ্বর বুঝি পুত্র-স্ত্রী এবং ভ্রাতা থেকে অশান্তি সৃষ্টি করেন। এইরূপ চিন্তায় কাতর হয়ে দিনাতিপাত করতে করতে একদিন গভীর রাত্রে নিদ্রিতা স্ত্রী-পুত্র ও অতুল বিভবপূর্ণ রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে মহারাজ অঙ্গ বনগমন করলেন। মনের মধ্যে শুধু কৃষ্ণের চিন্তা। তিনি চান নিত্যানন্দ সুখ। তিনি চান শ্রীভগবানের চরণযুগল।

এরপর পিতৃসিংহাসনে বসেন বেণ। কিন্তু তার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন হল না। উদ্ধত ও অবিনয়ী হয়ে নিজেকে বড় মনে করে মহৎগণের অপমান করতে লাগলেন।

নিন্দা করতে লাগবেন শ্রীহরির। মুনি ঋষিদের উপহাস করতে থাকলেন। দেখা দিল ঘোর বিশৃঙ্খলা। বেণের শ্রী, যশ, আয়ু ধ্বংস হতে লাগল। ক্রমে অকাল মৃত্যুর পথে চলে পড়লেন বেণ।

আর তার ফলে সাম্রাজ্যে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। তখন ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করলেন যে 'অঙ্গের' বংশ ধ্বংস হওয়া উচিত নয়। একথা ভেবে তাঁরা শ্রীনারায়ণের ধ্যান করতে লাগলেন। নারায়ণ সাড়া দিলেন ব্রাহ্মণদের ডাকে। ব্রাহ্মণগণ বললেন—হে প্রভু, বেণের বংশ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য একটি উপায় ঠিক করুন!

বেণের স্ত্রীও শ্রীহরির ধ্যানে আত্মনিয়োগ করলেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সহ্য করে বেণের স্ত্রী অবশেষে নারায়ণের কৃপা লাভ থেকে বঞ্চিত হলেন না। নারায়ণ তাকে দেখা দেন।

এই নারায়ণের শক্তিপ্রভাবে বেণের স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তানের জন্ম হয়। শিশু-

ভূমিষ্ট হলে ব্রাহ্মণগণ সানন্দে তার নামকরণ করেন পৃথু।

পৃথু নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে অবতাররূপে খ্যাত হন।

অতি অল্পদিনের মধ্যে পৃথু অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করে খ্যাতি, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করতে লাগলেন। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হলেন তিনি।

ইতিমধ্যে পৃথিবীতে দুঃভিক্ষ উপস্থিত হল। চারিদিকে খাদ্যাভাব।

পৃথু নামে যবে 'হরি' লয় সিংহাসন।
যখন করেন নিজে পৃথিবী শাসন॥
ছলিবারে ইচ্ছা করি মেদিনী সুন্দরী।
লইলেন শস্য বীজ আপনি আহরি॥

জ্ঞানবীর পৃথু বুঝতে পারলেন যে পৃথিবী ওষধি সকল গ্রাস করে ফেলেছে। তাই শস্য উৎপন্ন হচ্ছে না। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে তখন পৃথিবীকে বিনাশ করতে হলেন উদ্যত। অগত্যা পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করে তাঁর কাছ থেকে পলায়ন করতে লাগলেন। কিন্তু পৃথুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। ধরা পড়লেন তাঁর হাতে। তখন ভীতা পৃথিবী পৃথুর স্তব করতে লাগলেন—

'হে রাজন! বর্ষাকাল অতীত হলেও যে প্রকারে বৃষ্টির জল আমার সর্বত্র বর্তমান থাকতে পারে—সেইরূপভাবে আপনি আমাকে সমতল করুন। তাহলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে'।

পৃথু তখন আনন্দে দরদর বিগলিত আনন্দ ধারায় স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করে আপন হস্তরূপ দোহন পাত্রে নিজেই পৃথিবী থেকে ওষধি বীজ রূপ দুগ্ধ দহন করলেন। দোহন শেষ হলে ঋষিরা সমবেত হয়ে পৃথু বশীভূতা পৃথিবীকে ইচ্ছা-মত দোহন করলেন। এইরূপ মানবসমাজে সোম—অর্থাৎ অমৃত, অনিমাদি, সিদ্ধি ও অন্যান্য সমাজ রক্ষণের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হল।

তারপর সর্বকাম প্রসবিনী পৃথিবীকে স্নেহবশতঃ কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। মহারাজ পৃথুর পূর্বে এই ভূমণ্ডলে গ্রাম ও নগর সৃষ্টি হয় নি। তিনিই এসব সৃষ্টি করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

● প্রচেতাগণ ও পুরঞ্জনের সংস্কার মোচন ●

গুটীপোকা যথা গুটি করিয়া গঠন।
আপন শরীর মধ্যে না থাকয়ে বন্ধন।
তেমনি লভিয়া জন্ম এ সংসারে নর।
মুক্তির উপায় নাহি ভাবি নিরন্তর॥

মৈত্রেয় ঋষি পৃথুর বংশাবলী বর্ণনা করে পৃথুর বংশধর প্রাচীনবর্হির দশজন

পুত্রের উপাখ্যান বিদুরকে শ্রবণ করালেন। এরাই ভাগবতে প্রচেতা নামে পরিচিত। এরা তপস্যাবলে মহাদেবের দর্শন লাভ করেছিলেন। তারপর তাঁর উপদেশ অনুযায়ী দশসহস্রবছর তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির সাধনা করেছিলেন। 'রুদ্রদেব' প্রচেতাগণকে শ্রীহরির যে স্তব শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ভাগবতে রুদ্রগীত নামে প্রসিদ্ধ।

প্রচেতাগণের তপস্যায় সন্তুষ্ট শ্রীহরি আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন—তোমরা সংসারী হয়ে নিষ্কাম ভাবে জীবন যাপন কর।

—কিন্তু যদি সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ি?

শ্রীহরি উত্তর দিলেন—গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেই তোমাদের বন্ধন হবে—এরূপ মনে করো না। গৃহে থেকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হয়েও যারা আমাকে কর্মফল অর্পণ করে কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং আমার কথা আলোচনা পূর্বক দিনাতিপাত করে গৃহ তাদের কোনদিন বন্ধনের কারণ হতে পারে না।

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥ ৪।৩০।১৯

প্রচেতাগণ বললেন—তবে এই বর দিন—যতদিন আমরা সংসারে থাকব ততদিন যেন আপনার ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়।

শ্রীহরি 'তাহাই হউক' বলে শরণাগতদের বরদান করলেন।

তখন প্রচেতাগণ সমুদ্রের দক্ষিণ তীর ধরে পৃথিবীতে হলেন উপনীত। দেখলেন, পিতা প্রাচীনবর্হির সন্ন্যাসগ্রহণে পৃথিবী হয়ে উঠছে অরাজক। ভূমিসমূহ চাষের অযোগ্য।

এ দৃশ্য দেখে তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। সক্রোধে মুখ থেকে অগ্নি ও বায়ু নির্গত করে বৃক্ষসমূহকে দহন করতে আরম্ভ করলেন।

ব্রহ্মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তার সৃষ্টি বুঝি লয় পায়। তিনি নেমে এসে শান্ত করলেন প্রচেতাদের। তারপর সুবৃষ্টি দানে ধনধান্য আর পুষ্পে ভ'রয়ে দিলেন বসুন্ধরাকে।

এক্ষণে সবুজ পৃথিবীকে দেখে এক গভীর মায়ায় আবদ্ধ হলেন প্রচেতারা। সবুজ বনানীর আলোঝলমলরূপ, সোনালী ধানের সমারোহ, নির্মল স্রোতস্বিনীর কুলুকুলু কলধ্বনি সুগন্ধ পুষ্পরেণুযুক্ত বাতাসের শিহরণ আর সোনালী সূর্যের ঝিকিমিকি রূপ পাগল করে দিল প্রচেতাদের। তাঁরা ভুলে গেলেন শ্রীহরির স্তুতি।

তখন অন্তরীক্ষচারী হাসছেন বৈকুণ্ঠ থেকে।

এমনি সংসার মায়া। এইরূপে বহুদিন অতীত হলে প্রচেতাগণের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হল। তাঁদের মনে পড়ল শ্রীহরির কথা। কিন্তু কিভাবে তারা কৃষ্ণের দর্শন পাবে? সব যেন ভুল হয়ে গেল। মোহের ঘোরে পড়ে থেকে এতদিন তাঁরা শ্রীহরির কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই আক্ষেপ করেছেন বারংবার। অনুতাপের অনলে দগ্ধ হচ্ছেন প্রচেতারা।

তাঁদের সেই অনুতাপে দয়ার্দ্রচিত্ত নারদের হৃদয় হয় দ্রবীভূত। তিনি এসে সান্ত্বনা

দিয়ে বললেন—দেহ ধারণ করলেই বিষয়ভোগের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। এমন কি আত্মবিদ্যা গ্রহণ করেও চিরজীবন আত্মবিদ্যার অনুশীলন না করলে সেই মহামূল্য ধর্ম বীজ অঙ্কুরিত হয়েও ফলবান বৃক্ষরূপে পরিগণিত হতে নাও পারে। ধর্মজীবনে 'সব পেয়েছি' মনে করে কেউ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে তাহলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই সর্বদা হরিকে ছুঁয়ে থাকতে হবে। মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে যজ্ঞেশ্বরের যাগপ্রদীপ। স্মরণ কীর্ত্তন ও মননে নিযুক্ত থাকতে হবে সর্বদা। মুহূর্ত্তের জন্যও অমনোযোগী হলে কখন যে প্রাপ্তবস্তু হারিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। অতএব হে রাজকুমারগণ!

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মানি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥ ৪।৩১।৯

মনুষ্যগণের সেই জন্মই সার্থক—যে জন্মে শ্রীহরি আরাধিত হয়ে থাকে। সেই কর্মই কর্ম—সেই জীবনই জীবন—সেই মনই মন—সেই বাক্যই বাক্য—যার দ্বারা সর্বাত্মা ও সর্বনিয়ন্তা শ্রীহরি আরাধিত হয়ে থাকেন। ভগবৎ সেবাবিহীন সব কর্মই ব্যর্থ।

দেবর্ষি আরো বললেন—বেদান্ত, তপস্যা, ব্যাক্‌পটুতা, সুতীক্ষ্ন বুদ্ধি, দীর্ঘায়ু লাভ, বিশুদ্ধ কুলে জন্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য সবই বৃথা—যদি এই সমস্ত বস্তু মানুষের মনকে ভগবৎমুখী না করতে পারে।

আবার বৃক্ষের মূলেই জল দিলে যেমন সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র, কাণ্ড ও পুষ্পাদি পরিতৃপ্ত হয়, জীব আহার করলে যেমন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হয় সেইরূপ শ্রীহরির অর্চনা করলে সর্বদেবতার অর্চনা করা হয়, সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধি হয়—পৃথকভাবে আর কোন অন্য দেবতার আরাধনার প্রয়োজন হয় না।

যথাতরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজো প্রশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ৪।৩১।১৪

তারপর দেবর্ষি প্রচেতাগণকে ধ্রুবচরিত ও অন্যান্য ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়ে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন।

প্রচেতাগণও মগ্ন হলেন শ্রীহরির ধ্যানে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন। এইভাবে ধ্যানাসনে বসে যোগপ্রভাবে তারা পেলেন শ্রীহরির সাক্ষাৎ। প্রাপ্ত হলেন বিষ্ণুলোক।

বিদুরের চোখ দুটি অশ্রুতে ছল ছল করে। এ অশ্রু কিসের? ভালবাসার না দুঃখের? এ অশ্রু শ্রীহরির প্রতি ভালবাসার অশ্রু।

এরপর বিদুর হস্তিনাপুরে গমন করেন।

অতএব বিষয়ভোগী ব্যক্তিগণের পক্ষেও হরির সেবা অসম্ভব নয় আমাদের প্রত্যেকের উচিত শ্রীহরির চরণ স্মরণ করতে করতে সমস্ত মন তাঁকে সমর্পণ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এরপর প্রাচীনবর্হি'র কথা বলি। প্রাচীনবর্হি স্বর্গলোকের আশায় যাগযজ্ঞ করে পশুবধ করতেন। সেই পশুবধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য নারদ তাকে একটি সুন্দর কাহিনী বলেছিলেন। কাহিনীটি হচ্ছে—

অনেকদিন আগে পুরঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। নতুন নতুন দেশ ভ্রমণ করা ছিল তার শখ। তিনি নিজের পছন্দমত একটি নগর খুঁজে সেখানে বাস করতে চান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হিমালয়ের পাদদেশে পেলেন সেই মনোরম নগর। নগরটির ছিল নয়টি সিংহদ্বার। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাতে পূর্ণ। চারদিকে পুষ্পোদ্যান। দেখে মনে হয় যেন মহামায়ার মায়া ঘেরা স্বর্গের আলয়। আবার সেই বাগানগুলি ছিল শত শত রঙিন পাখীদের কলতানে মুখরিত। প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে দশদিক সুরভিত।

রাজা যা চেয়েছিলেন পেলেন তাই। দিন যায়। রাজার সাথে দেখা হয় এক পরমা-সুন্দরীর। প্রথম দর্শনেই উভয়ের প্রতি হয় উভয়ের অনুরাগ। পুরঞ্জন বিয়ে করলেন সুন্দরী রাজকন্যাকে।

পরম সুখে দিন কাটছে পুরঞ্জনের। রাজকন্যা যা বলেন পুরঞ্জন তাই করেন। এই সুন্দরী রমণীই তার ধ্যান জ্ঞান। রাজকন্যার দুঃখে তাঁর দুঃখ—সুখেই তাঁর সুখ।

একদিন রাজা পুরঞ্জন দশটি অশ্বযুক্ত এক সুন্দর রথে চড়ে গেলেন মৃগয়ায়। মনের সুখে বহুপশু শিকার করে যখন ফিরলেন, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। দেরী হওয়ার জন্য রাজকন্যা অভিমান করে বসে আছেন।

অভিমানিনী পত্নীকে অনেক কষ্ট করে তিনি শান্ত করলেন। কালক্রমে তাদের অনেকগুলি পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

কিন্তু চিরদিন কারো সমান নাহি যায়। ভোগসুখে যখন পুরঞ্জন আকণ্ঠ মগ্ন, তখন আক্রমণ করল গন্ধর্বপতি চণ্ডবেগ। তার সঙ্গে আছে ৩৬০ জন গন্ধর্ব এবং তাদের পত্নীরা। চণ্ডবেগ প্রচণ্ডবেগে পুরঞ্জনের সাধের রাজধানীটি দিল চুরমার করে।

তখন ঘটে গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার। এক যবনরাজা এসে পুরঞ্জনকে বন্দী করে নিয়ে গেল। যবনেশ্বর ছিল যাদুবিদ্যায় খুব পারদর্শী। সে যাদুবলে পুরঞ্জনকে একটি রূপসী রমনীতে পরিণত করে দিল।

পূর্বস্মৃতি লোপ পেল পুরঞ্জনের। ভুলে গেলেন বিষয় বৈভব তার নিজের পুত্র কন্যাদের। মলয়ধ্বজ নামে এক রাজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর মলয়ধ্বজ মারা গেলেন কিছুদিনের মধ্যে। পুরঞ্জন তাঁর রাণী। তাঁকে সহমরণে যেতে হবে। প্রস্তুত হল চিতা, বেজে উঠল শঙ্খ, বেজে উঠল ঘণ্টা। রাণী সহমরণে যাচ্ছেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে আচম্বিতে এক সৌম্যকান্তি ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল—পুরঞ্জন! তুমি কি নিজেকে একেবারে ভুলে গেছ? পূর্বের স্মৃতি কি তোমার স্মরণে আসছে না। চিন্তা করে দেখ, তুমি স্ত্রীলোক নও, কেন তবে সহমরণে যাবে? মৃতব্যক্তির সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি রাজা ছিলে। তুমি ও আমি বহু-

দিনের পুরাতন বন্ধু। আমরা মানস সরোবরে দুটি হংস ছিলাম। বিষয় সুখের জন্য লালায়িত হয়ে তুমি আমাকে ভুলেছিলে। বন্ধুর কথা শুনে পুরঞ্জনের ধীরে ধীরে চৈতন্য হল। দেখতে দেখতে পূর্বস্মৃতি ফিরে এল তার।

ব্রাহ্মণ বেশী ভগবান আরও বলেছিলেন—

মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্ ॥ ৪।২৮।৬১

—তুমি যে কারণে পূর্বজন্মে আপনাকে পুরুষ বলে মনে করেছিলে এবং এ জন্মে আপনাকে স্ত্রী বলে মনে করছ উহা আমারই সৃষ্ট মায়া। পুরুষত্ব অথবা স্ত্রীত্ব জীবে নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই শুদ্ধ। সেই জীবাত্মা তোমার ও পরমাত্মা আমার স্বরূপ দর্শন কর।

নারদমুনি কথিত গল্পটি খুবই অর্থবহ। ব্যাখ্যা করার জন্য রাজা নারদকে অনুরোধ করায় নারদ বললেন—স্বীয় কর্মের দ্বারা "পুর" অর্থাৎ শরীর সৃষ্টি হয় বলে জীব পুরঞ্জন। পুরঞ্জন জীব আর তার বন্ধু হল ঈশ্বর। যে রমনীর দ্বারা রাজা পরিচালিত হতেন সে হল বুদ্ধি। পুরঞ্জনের নগরীর দরজার সংখ্যা নয়টি। আমাদে প্রত্যেকের দেহে নয়টি দরজা—দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি নাক, একটি মুখ, একটি মলদ্বার ও একটি মূত্রদ্বার। ৩৬০টি গন্ধর্ব ও গন্ধর্বী হল ৩৬০ দিন ও রাত্রি। চণ্ডবেগ মহাকাল, যবনেশ্বর মৃত্যু এবং হংস দুটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুজনে পরমবন্ধু। পরমাত্মা লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে। তাকে দেখা যায় না। তবে জীব বিপদে পড়লে তাকে পথ দেখাতে সে ছুটে আসে। জীবাত্মা ভোগবাসনাময়। কখনও সুখ পায় না। আমি ও আমার এই অভিমান প্রচণ্ড. তা থেকে আসে কর্মবন্ধন। জন্ম জন্মান্তর। জন্ম মানেই দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন আমাদের কষ্ট দান করে। আমরা যখন মোহনিদ্রা ছেড়ে জেগে উঠি তখনই আমাদের দুঃখের অবসান হয়। তাই হে রাজন্, হিংসা থেকে বিরত হও। পশুবধ করে স্বর্গলাভের কামনা করো না। পশুবধে পাপ হয়। পশুবধ কর্ম নয়। পশুবধে মোক্ষলাভ হয় না।

প্রাচীনবর্হি বিস্মিত হয়ে বললেন—তাহলে বলুন দেবর্ষি, আমি কিরূপে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করব—

'ন জানামি মহাভাগ, পরং কর্মাপবিদ্ধধীঃ।
ব্রূহিমে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্মভিঃ' ॥ ৪।২৪।৫

তখন নারদ উপদেশের মাধ্যমে বলতে লাগলেন—জীব যখন পরমগুরু পরমাত্মাকে ভুলে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে তাতে আসক্ত হয়, তখন ঐ জীব অবশ হয়ে কর্মসমূহ করতে থাকে আর ঐ কর্মের ফলেই ত্রিতাপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া—

'ক্ষুৎপরীতো যথাদীনঃ সারমেয়ঃ গৃহং গৃহম্।
চরণ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদন মেব বা ॥ ৪।২৯।৩০

তথাকামাশয়ো জীব উচ্চাবচ পথাভ্রমণ্ ।
উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৪।২৯।৩১

—হতভাগ্য কুকুর যেমন ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে অদৃষ্ট অনুসারে কখনো তাড়না, কখনো বা অন্নগ্রাস প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেইরূপ বিষয় বাসনা আসক্ত-জীব উচ্চ ও নীচ যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে দেবদেহ, মনুষ্যদেহ অথবা পশুদেহ লাভ করে আত্মবুদ্ধি আরোপণ পূর্বক সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে।

অতএব হে রাজন্, সুবিদ্যা, সুকর্ম ও ভক্তসঙ্গলাভের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর।

—সুবিদ্যা ও সুকর্ম কি ? মুক্তি কখন হয় ? জন্মমৃত্যু প্রবাহের জনক কে ? শ্রেষ্ঠ বর ও শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?

—শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদনই শ্রেষ্ঠ বা সুকর্ম। আর যে বিদ্যার দ্বারা শ্রীহরির চরণে মতি হয় তাই সুবিদ্যা। বাসনাবিক্ষুব্ধ মনকে বাসনানির্মুক্ত করতে পারলেই মুক্তি। মনই-জন্মমৃত্যু প্রবাহের জনক। চিরদিন ভক্তসঙ্গ লাভই শ্রেষ্ঠ বর আর শ্রীহরির চরণ ভজনই শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব তুমি সর্বদা হরিভজন কীর্ত্তন ও উপলব্ধি দ্বারা জগৎকে হরিময় দেখে মুক্তিলাভের চেষ্টা কর।

অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্ব্বাত্মনা হরিম্ ।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ। ৪।২৯।৭৯

দেবর্ষি এই উপদেশ প্রদান করে সিদ্ধলোকে গমন করলে প্রাচীনবর্হি তপস্যার নিমিত্ত কপিলাশ্রমে গমন করলেন।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● প্রিয়ব্রতর উপাখ্যান ●

ভক্তিভরে যেই জন হরি সেবা করে।
অন্তিমেতে হরি দেখা দেন তার ঘরে ॥
বিশ্বাস রাখিয়া হরি ভজ ভাইগণ।
ভগবৎ কৃপা পেতে ভুল হবে না কখন ॥

মনুর দুই ছেলে। উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রত দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতেন। তিনি একদা পণ করলেন যে রাত্রিকেও দিনের মত আলোকিত করে রাখবেন। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে রথে চড়ে সূর্যের পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগলেন। তাঁর রথচক্রের

ঘর্ষণে যে সাতটি গর্ত হয়েছিল তাই সপ্ত সমুদ্র নামে পরিচিত। অবশেষে তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক নিবারিত হয়ে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন।

ব্রহ্মা বললেন—সূর্য অনন্ত শক্তির আধার। তার তেজের নাগাল পাওয়া তোমার কোনদিন সম্ভব নয়। জগৎ বেঁচে আছে তার কৃপাতে। সে ত্রিলোকবিজয়ী। তাই তুমি সর্বশক্তিদাতা পরমপুরুষের তপস্যায় আত্মনিয়োগ কর। রাজ্য ও রাজত্বের অহংকার ত্যাগ করে শীঘ্রই তাঁর চরণে মিলিত হও।

প্রিয়ব্রতের মন হয় চঞ্চল, তিনি চিন্তা করলেন—ঠিকইতো। অযথা অহংকার দেখিয়ে মিথ্যা কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করা ভাল।

এমন সময় নারদ এসে বললেন—তুমি অহংকার ত্যাগ করে অবিলম্বেই হরিপদে মনোনিবেশ কর। হরি ছাড়া আমাদের গতি নাই। হরির ইচ্ছায় তুমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে, আর অহংকার পতনের মূল কারণ। হরি পূজা বা আরাধনা করলে মনে শান্তি আসবে—তৃপ্তি পাবে—অহংকার নষ্ট হবে।

নিত্য নিত্য যে করে ধর্ম অনুষ্ঠান।
নিষ্কাম হইয়া করে পূজার বিধান॥
প্রতিমা দর্শন আর স্পর্শন পূজন।
নিত্য নিত্য যে করে স্তবন বন্দন॥
সর্বভূত যেইভাবে অস্তিত্ব তাহার।
ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যশালী হয় চিত্ত যার॥
সাধুরে সম্মান করে দয়া করে দীনে।
ইন্দ্রিয় দমন যেই করে প্রতি দিনে॥
তাঁর নাম গান সহ সাধু সঙ্গ করে।
সদা দীন ভাব যে দেখায় অন্তরে।
সেইজন ভাগ্যবান ভুল নাহি আর।
অনায়াসে পায় সেই চরণ তাহার॥

নারদের কৃপায় বৈরাগ্য উপস্থিত হল প্রিয়ব্রতের। সর্বস্বত্যাগ করে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন হলেন তিনি।

প্রিয়ব্রতের পর তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র ও তারপর নাভি রাজ্যশাসন করলেন। আগ্নীধ্র পুত্র নাভি অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্র কামনায় করলেন শ্রীহরির যজ্ঞ। ফলে শ্রীহরি দর্শন প্রদান করে নাভির পুত্ররূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

সত্যই তাই হল। ভগবানের অংশে নাভির পুত্র রূপে ঋষভদেব অবতীর্ণ হলেন।

ঋষভদেব ভগবানের অংশ কলা। ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন বিরাট পণ্ডিত ও জ্ঞানী। গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীকে করেন বিবাহ। জয়ন্তীর গর্ভ আলো করে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর একশ' পুত্র। তাঁদের মধ্যে ভরত ছিলেন জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান গরিমার তুলনা ছিল না ভরতের।

ঋষভদেব পুত্রদের বলতেন—বিষয় সমূহ পরিণামে দুঃখপ্রদ। মনুষ্যদেহ বিষয়-ভোগ করবার জন্য সৃষ্ট হয়নি। বিষ্ঠাভোজী শূকর যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে থাকে, মানুষ তার চেয়ে বেশী সুখ পায় না। মানবদেহ ভগবৎ ভজনের জন্য। ঐ ভজনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির পরে হয় মুক্তিলাভ। সাধুসঙ্গই মুক্তির প্রথম ও প্রধান উপায়। মহতের সেবায় মুক্তি লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ থেকে বাসুদেব প্রীতি আসে বলেই সাধুসঙ্গ বাঞ্ছনীয়। 'প্রীতিন' যাবং ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবং'—অর্থাৎ যতদিন বাসুদেবের প্রতি ভক্তিভাব উৎপন্ন না হয় ততদিন দেহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। অতএব যিনি সংসাররূপ মৃত্যুর কবলে পতিত জীবকে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলে দিতে না পারেন, তিনি গুরু হয়ে শিষ্য করবেন না, পিতা হয়ে পুত্রউৎপাদন করবেন না। জননী হয়ে সন্তান প্রসব করবেন না, দেবতা হয়ে উপাসকের পূজা গ্রহণ করবেন না। পতি হয়ে পত্নী গ্রহণ করবেন না এবং স্বজন হয়ে আত্মীয়তা করবেন না।

'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ,
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্ ॥'

এই উপদেশ প্রদান করে ঋষভদেব গৃহ থেকে নির্গত হলেন এবং মৌনব্রত অবলম্বন করে অপরের নিকট জড়, অন্ধ, মূক, বধির, পিশাচ ও উন্মাদের মত হয়ে জীবন যাপন করতে লাগলেন। পথে দুষ্ট লোকেরা তাঁকে প্রহার, গাত্রে মূত্রত্যাগ, থুতু-ধূলি-শিলা-বিষ্ঠা নিক্ষেপ করলেও তিনি উদাসীন হয়ে নানা দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই অবস্থান নিরন্তর ভগবৎ চিন্তনের ফলে তাঁর নানাবিধ যোগৈশ্বর্য্য উপস্থিত হল। আকাশগমন, দূরদর্শন, অন্তর্ধান প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যগুলিকে কিন্তু তিনি মনের মধ্যে স্থান দিতেন না। কারণ এই বিভূতিলাভে সাধকের মন যদি সেদিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে ভগবৎ প্রাপ্তি দূরে সরে যায়। এগুলি সাধন ভজনের বিঘ্নস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার ঋষভদেব এই বিভূতি শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। শুকদেবও গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট সহস্র সহস্র যোগী ঋষিগণকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। শুকদেব আরো বলেছিলেন—কোনও চরিত্রহীনা পত্নী যেমন স্বামীর অতিরিক্ত বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে উপপতিকে নিজ স্বামীর অনিষ্ট সাধন করবার উপায় বলে দেয় সেইরূপ কোনও যোগী আপনার মনকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে ইন্দ্রিয়-গণকে কুপথে চলার সুযোগ প্রদান করে।

এইজন্য ঋষভদেব স্বীয় যোগৈশ্বর্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে কুটক পর্বতের সামনে উপস্থিত হলেন। তারপর সেখানে এক বনের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করে যোগপ্রভাবে ভস্মীভূত হয়ে যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● জড়ভরতের কাহিনী ●

অর্চন দাসত্ব সখ্য স্মরণ সংযম।
শ্রবণ কীর্তন বন্দ আত্ম নিবেদন॥
হরিভক্ত জানে নাই যমের শাসন।
পুষ্পবানে বিষ্ণুপাশে সে করে গমন॥

ঋষভদেব বদরীধামে চলে গেলে ভরত রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অতি সুচারুরূপে প্রজা পালনে করলেন মনোনিবেশ। কিন্তু বেশীদিন তাঁর রাজ্যসুখ ভাল লাগল না। পুত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে তপস্যার জন্য পুলকাশ্রমে বাস করতে লাগলেন।

অতি মনোরম সেই আশ্রম। উত্তর দিক দিয়ে কুলুকুলু রবে গণ্ডকী নদী বয়ে চলেছে। বইছে মলয় পবন। ক্রীড়ারত অসংখ্য হরিণ হরিণী। সেই নদীতীরে তিনি ধ্যান করেন—বিভোর হয়ে থাকেন ভগবানের নামে।

কিন্তু একদিন ঘটল এক বিরাট ঘটনা। একটা সিংহ তর্জন গর্জন করে হাজির হল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক গর্ভবতী হরিণী প্রাণভয়ে নদীপারের জন্য দিল লাফ। ফলে তার গর্ভের শাবকটি নদীর জলে পড়ে ভাসতে লাগল। নদীটি অবশ্য ছোট ছিল। জলও বেশী ছিল না। নদীর পরপারে গিয়ে হরিণীটি ঢুকল একটি গুহায়। কিন্তু হায়! সে মারা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

এই দৃশ্য দেখলেন ভরত। কোমল হৃদয় মুনি তখনই ছুটে গিয়ে ভেসে যাওয়া অসহায় হরিণ শিশুটিকে জল থেকে তুলে আনলেন। বেঁচে গেল হরিণ শিশুটি। সেদিন ভরতের জপ ধ্যান ধারণা কিছুই হল না। সমস্ত সময় হরিণ শিশুর সেবাতেই কেটে গেল। অতুল ঐশ্বর্য ও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে যে মহারাজ নির্জন বনপ্রদেশে সাধন ভজন আরম্ভ করেছিলেন তাঁর সেই অখণ্ড ভগবৎ স্মরণ ও চিন্তনকে খণ্ডিত করে সেদিন একটি ক্ষুদ্র পশু তাঁর অন্তর ও বাহির অধিকার করে বসল। মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন মুনিবর।

যে মহারাজ তাঁর বৈরাগ্যের জন্য বিপুল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ভোগ ত্যাগ করেছেন, নিজ পুত্র কলত্রাদির প্রতি মোহবন্ধন ছেদন করেছিলেন, তাঁরই হৃদয়ের একপ্রান্তে অতি ক্ষুদ্র এক ছিদ্রপথ অবলম্বন করে এক মৃগশিশু মায়ায় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই হরিণশিশু তাঁর হৃদয়ে পুনরায় জাগিয়ে তুলল বিষয় পিপাসা। তপস্বী ভরতের পতন হল।

বহু সন্ন্যাসীর জীবনে এইরূপ পতন পরিদৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসী নিজ গৃহের কোমল আবেষ্টনী পরিত্যাগ করেছেন, পিতার ঐশ্বর্য, মাতার কান্না সবই উপেক্ষা করে

গৃহত্যাগ করেছেন কিন্তু তাঁর জীবনের অমূল্য সময় আশ্রম পরিচালনার কাজে কেটে গেল অথবা অনুগত শিষ্যের ব্যাধির জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। এটা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তাই শুধু গেরুয়া পরে নাম বদলালেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। মহামায়ার হাত এড়ান বড়ই কঠিন।

মৃগশিশুর চিন্তাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল ভরত মুনির। ক্রমে এসে গেল তাঁর অন্তিম সময়। মৃগশিশুর চিন্তা করতে করতে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর পাশেই মৃগশিশু শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিশ্চল হয়ে বসে আছে—ঠিক যেমন বদ্ধ গৃহীর মৃত্যু-শয্যা প্রান্তে তাঁর মোহাচ্ছন্ন পুত্রকন্যাগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় বসে থাকে।

মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যা চিন্তা করে; সে পরজন্মে তাই হয়। কাজেই রাজা হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

'যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥'

ভরতমুনি হরিণ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেও একটি বহুমূল্য সম্পদ তার মৃগজন্মেও রয়ে গেল। পূর্বজন্মের সাধন ভজন, মোহপ্রাপ্তি, মৃত্যুসময়ে হরিণের চিন্তা তার মৃগ দেহেও বিলুপ্ত হল না। কারণ ভরত চিরদিন যে ভক্তি ও জ্ঞান সাধন করেছিলেন তা তাঁর কিছুদিনের মোহ প্রাপ্তিও সম্পূর্ণরূপে চাপা দিতে পারল না। তিনি ভক্তি ও জ্ঞান প্রভাবে পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে পরজন্মে জাতিস্মর হয়ে মৃগদেহ প্রাপ্ত হলেন।

কপিলমুনি তার মাতাকে বলেছিলেন—'অমোঘা ভগবৎ সেবা নেতরেতিমতিমর্ম"—অর্থাৎ ভগবৎ ভজন যতটুকু করা যায় ততটুকুই সার্থক। ভগবৎ ভজনের ফল কখনো কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হয় না।

তাই ভরতকে পূর্বজন্মের স্মৃতি কণ্টকের মত বিদ্ধ করতে লাগল। তিনি মৃগী মাতাকে পরিত্যাগ করে নিজ জন্মস্থান কালঞ্জর নামক পর্বত থেকে দূরে বহুদূরে চলে গেলেন এবং চিন্তায় ও অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

তারপর এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করলেন রাজা ভরত। এই ব্রাহ্মণের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে নয়টি পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। ভরতের পূর্ব দুটি জন্মের স্মৃতি এ জন্মে আরও বেশী কাজ দিল। পাছে আবার কারুর প্রতি আসক্তি আসে তাই কারো সাথে বেশী মেলা-মেশা করতেন না। সাধারণ লোকের নিকট উন্মত্ত, জড়, ও বধিররূপে প্রতীয়মান হতেন। পিতা ছিলেন নানা বিদ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে কিছু শেখাতে পারলেন না। জড়বুদ্ধি বলে তাকে সকলে ডাকত—জড়ভরত বলে।

ক্রমে দিন চলে যায়। ভরতের পিতা দেহ রাখলেন। ভরতের মাতা স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে সপত্নীর হাতে তুলে দিয়ে স্বামীর সাথে সহমরণে প্রাণত্যাগ করলেন।

ভরতের বড় ভাইয়েরা কর্মাসক্ত ছিলেন। আত্মবিদ্যা বুঝতেন না। সুতরাং পিতা পরলোক গমন করলে তাঁরা ভরতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়লেন এবং

ভরত তাঁদের আদেশমত গৃহস্থালী কাজকর্ম করে মনে মনে ভগবৎ স্মরণ করতে করতে দিন যাপন করতে লাগলেন।

শ্রীশুকদেব বলছেন—যে সমস্ত মানুষ ভগবৎ চিন্তা করে না, তারা মানুষ হয়েও পশুর সমান। এই পশুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আদেশ পালন করে শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ অন্ন সমভাবে গ্রহণ করে বাসুদেবকে হৃদয়ে স্মরণ করতে করতে ভরতের দিন কাটতে লাগল। ভরত বিশাল বপু নিয়ে যত্র তত্র শয়ন করতেন। শরীরের প্রতি তার কোন যত্ন ছিল না। নিয়মিত স্নানের অভাবে দেহ থেকে ব্রহ্মতেজও দৃষ্টিগোচর হত না। তাঁর কটিদেশে একখানা মলিন বস্ত্র জড়ানো থাকত শুধুমাত্র। গলদেশে লম্বমান ভ্রাতৃপ্রদত্ত মলিন যজ্ঞোপবীত দেখে লোকে তাঁকে ব্রাহ্মণাধম বলে অবজ্ঞা করত। লোকে তাঁকে অন্নমুষ্টি মাত্র ভোজ্য প্রদান করিয়ে তাঁর দ্বারা নানাবিধ কৃষিকাজ করিয়ে নিত। তাঁর ভাইয়েরা সারাদিন কাজ করিয়ে নিয়ে সন্ধ্যাকালে তাকে ক্ষুদ, তুষ, কীটদ্রষ্ট মাসকলাই ও রন্ধন পাত্র সংলগ্ন দগ্ধ অন্ন খেতে দিত। ভরত বিনা আপত্তিতেই সেই অন্ন ভোজন করতেন। বিষ্ণুপুরাণে তাই ভরতকে 'আহার বেতনঃ'—অর্থাৎ আহার মাত্রই বেতন যাঁর বলা হয়েছে। তিনি শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টিতে বৃষের ন্যায় বিচরণ করতেন।

একদিন এক শূদ্রপতি সন্তান কামনা করে দেবী ভদ্রকালীর কাছে নরবলীর আয়োজন করেছিলেন। যে মানুষটিকে বলির জন্য ধরে আনা হয়েছিল, সেই লোকটি কোনক্রমে রাত্রিবেলা বন্ধন মোচন করে পলায়ন করে। সেই স্থানে মহা কোলাহল উপস্থিত হলে শূদ্রপতির অনুচরগণ চারিদিকে সেই পুরুষ পশুর সন্ধান করতে লাগল। রাত্রির অন্ধকারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে অনুচরেরা ভীমনাদে গর্জন করতে করতে ছুটতে লাগল। মহাবেগে মহাকোলাহলে রাত্রির স্তব্ধতা হয়ে গেল ভেঙ্গে খান খান। চারিদিকে একটি ভীতির সংকেত। পথের মানুষ যে যেখানে পারে ছুটে পালাতে লাগল।

নিকটে একটি ধান্যক্ষেত্রে ভরত বরাহ ও মৃগ থেকে শস্য রক্ষার কাজে পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে একবার করে শব্দ করছিলেন। তারপর ভগবৎ চিন্তা আর ভগবৎ চিন্তা। হঠাৎ দস্যুগণ তাঁকে দেখতে পেয়ে মহোল্লাসে বিকট ভাবে চীৎকার করে উঠল—যে মানুষ পশু পালিয়ে ছিল তার পরিবর্তে আরো ভাল সুলক্ষণ ও হৃষ্টপুষ্ট মানুষও পাওয়া গেছে। বলেই তাঁকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে আনন্দে মত্ত হয়ে পূজা মণ্ডপের দিকে নিয়ে চলল। একদিকে যমদূতাকৃতি মাতালদের ভয়ংকর অট্টহাসিতে কম্পিত বনভূমির উপর বন্যপশুদের পলায়ন আর অন্যদিকে শান্ত সৌম্য নির্বিকার ভগবৎচিন্তাশীল সত্ত্বগুণময়ী ব্রাহ্মণমূর্তি। —সে কী অপূর্ব দৃশ্য। বর্ণনা দেওয়ার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

চণ্ডিকার পূজামণ্ডপে দস্যুগণ নিশ্চিন্ত হয়ে দেবী প্রতিমার উভয় পাশে বসেছে। পুরোহিত আসনে সমাসীন, তাঁর দক্ষিণ পাশে শানিত খড়্গ। খড়্গের অতি নিকটে

বন্ধনমুক্ত ভরত। সামনে বলির যুপকাষ্ঠ, দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান পুত্রকামী শূদ্ররাজ।

যে দেবী প্রসন্ন মূর্ত্তিতে এতক্ষণ পূজার আয়োজন দেখছিলেন সেই ভক্তবৎসলা যেন ভক্তসন্তানকে যূপকাষ্ঠে বলির নিমিত্ত দেখে ভীষণ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। তাঁর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে, ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ থেকে মুহুর্মুহু প্রকাশিত হচ্ছে খড়্গ ও পাশহস্তা ভীষনবদনা কালীমূর্ত্তি। সেই চিন্ময়ী কালীমূর্ত্তিরগলদেশে নরকঙ্কালের মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, তাঁর বিশাল মুখমণ্ডল থেকে লোলজিহ্বা বাহির হয়েছে। আবার তাঁর আরক্ত ঘূর্ণমান চক্ষুদ্বয় দিক্‌মণ্ডল মোহিত করে দিচ্ছে।

> 'ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাৎ দ্রুতম্,
> কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
> বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা,
> দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা॥
> অতি বিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা,
> নিমগ্নারক্ত নয়না নাদাপূরিত দিঙ্‌মুখা॥'

ভরত দেখছেন, বরাভয়প্রদা অতি কোমলা, জন্মজন্মান্তরের সুপরিচিতা ভক্তবৎসলা জননী, শুনছেন মাতার স্নেহময় কণ্ঠের চিরদিনের "মাভৈঃ" ধ্বনি। অপরে দেখছেন, ভীষণতরা অদৃষ্টপূর্ব্বা রুদ্রমূর্ত্তি, শুনছেন স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল ভেদী বিকট চিৎকার, ভয়ে বক্ষ দুরু দুরু করে কাঁপছে। এটাই চণ্ডিকামূর্ত্তি।

দস্যুগণ বিধি অনুসারে ভরতকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিল। ললাটে দিল তিলকাদি। ভরত অপরদিনের মতই ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করলেন। বলিদানের খড়্গের পার্শ্বে বসেও ভয়ে তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের কোন ব্যাঘাত ঘটল না। তিনি দেবীর দিকে চেয়ে তদ্গতচিত্ত হয়ে বসে আছেন, ভয়-অভয় সম্মান-অসম্মান, জীবন অথবা মৃত্যু কোন চিন্তাই তাঁর হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে না। দস্যুগণ দেবীর সম্মুখে ধূপ, দীপ, মাল্য, খৈ, নবপল্লব, অঙ্কুর, ফল উপহার প্রদান করে গীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গধ্বনি করতে লাগল। চৌররাজ্যের পুরোহিত তখন ঐ পুরুষ পশু ভরতের শোণিতে ভদ্রকালীর তর্পণ করবার জন্য মন্ত্র দ্বারা শোধিত করে গ্রহণ করল অতি ভয়ানক শাণিত খড়্গ। সে কী ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত! শূদ্ররাজের মনে উৎকট আনন্দ, তার পুত্রকামনা সফল হচ্ছে, পুরোহিত পূজার শেষ বিধি সমাপন করবার জন্য খড়্গ গ্রহণ করেছেন, চারদিকে ভীষণাকৃতি দস্যুগণ নীরব ও নিশ্চল, যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ ভরতের মুখে চির-দিনের অপূর্ব্ব প্রসন্নতা। ভক্তের অনিষ্ট আশঙ্কায় কিন্তু দেবীর মন চঞ্চল। গভীর নিশীথের নিবিড় অন্ধকারের ভীষণ নিস্তব্ধতা চারদিককে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। পূজা চলছে কিন্তু কোনও শব্দ নেই, আনন্দ চলছে কোন উচ্ছ্বাস নেই—এ যেন প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির নিষ্ঠুর ও নিঃশব্দ পরিহাস। মুহূর্তের মধ্যে ভরতের ছিন্নমুণ্ড ভূতলে পতিত হবে।

তারপর "ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাৎ নির্বৈরস্য সর্বভূতসুহৃদঃ"—সাক্ষাৎ ব্রহ্মসদৃশ সর্বদা বৈরভাব শূন্য ও সর্বজীবের সুহৃদ্ মহাত্মা ভরতের মাথায় খড়্গ উত্তোলিত হতে দেখে "সহসা উচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী"—হঠাৎ দেবী ভদ্রকালী প্রতিমার ভেতর থেকে চিন্ময়ী মূর্তিতে বেরিয়ে এসে উপস্থিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ "হন্তুকামা ইবেদং মহাট্টহাসমতি সংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী"—ভয়ঙ্কর ক্রোধে উচ্চনাদে অট্টহাস্য করতে করতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ পুরোহিতের হাত থেকে ছিন্ন করে সেই খড়্গের দ্বারা দুষ্ট শূদ্রগণের মাথা কেটে ফেললেন। তারপর তাদের গলদেশ থেকে অজস্রধারায় নির্গত অতি উষ্ণরুধির পান করে ছিন্নমুণ্ড সমূহকে নিয়ে বলের মতো খেলা করতে লাগলেন। তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে ধরণী কম্পিত। চতুর্দিকে গড়াগড়ি নরমুণ্ড, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রুধিরের স্রোত চলছে বয়ে। দেবী নৃত্যপরায়না। ভরত একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। সেখানে আর কেউ নেই—আছে শুধু মা আর ছেলে। ভক্ত আর ভগবতী, মাতৃমূর্তি আর সন্তান, ভরত আর চণ্ডিকা। ভক্তবৎসলা জ্যোতির্ময়ী জ্ঞানাতীত ভীষণ শক্তি তখন ভক্তের চোখের সামনে একটি স্নেহময়ী মা হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে আছেন।

দেখতে দেখতে মায়ের সোনার মুকুট যেন গগণ স্পর্শ করতে লাগল। হাজার হাজার বিদ্যুতের রোমাঞ্চ খেলে গেল সেখানে। ভেসে যেতে লাগল স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল মায়ের অপূর্ব জ্যোতিতে। তার হাতের রুধির লিপ্ত অসি ধীরে ধীরে হতে লাগল ধরণীতে পাতিত সেখানে আর কেউ নেই—শুধু মা ও ছেলে। তারপর মা অন্তর্হিত হলেন—ভরত পুনরায় কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে বসলেন।

তাই মহান ব্যক্তিদের প্রতি অপরাধ মূলক আচরণ করলে ঐ অপরাধ ফিরে এসে সম্পূর্ণরূপে অপরাধীর নিজের ক্ষতি করে।

এ কাহিনী শুনে পরীক্ষিতের হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে। কারণ তিনি তো মহতেরই অপমান করেছেন।

কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে জড়ভরতের দিন চলে যায়। একবার সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিপতি মহারাজ রহূগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য পাল্কী করে যাচ্ছেন কপিলাশ্রমে। হঠাৎ একজন বাহক অসুস্থ হয়ে পড়লে আর একজন বাহকের প্রয়োজন হয়। কাকে পাওয়া যায়! পেলেন জড়ভরতকে। কিন্তু তিনিতো নিজের ভাবে মশগুল। বাহকগণ জোর পূর্বক ভরতকে ধরে নিয়ে পাল্কী বহনের কাজে লাগাল। নির্বিবাদে পাল্কী বহে নিয়ে চললেন ভরত, কিন্তু বাহকের কাজ করা তো তাঁর অভ্যাস নেই। তাছাড়া তিনিতো আপন ভাবে মাতোয়ারা। তাই ঠিকমতো পাল্কী বইতে পারছেন না। অর্থাৎ বাহকদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পাচ্ছেন না। রাজা রহূগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করতে লাগলেন নতুন বাহকটিকে। —তুই তো মোটা-সোটা, তবে হাঁটতে পারছিস না কেন? তুই কি এতই পরিশ্রান্ত? তোকে দণ্ড না দিলে ঠিক হবে না। চল—তোকে যমরাজের মতো শাস্তি দেব।

জড়ভরতের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগল। কিন্তু কর্কশ বাক্য প্রয়োগ না করে অতি দীন হীন ভাবে বললেন—রাজা, আমি শ্রান্ত নই। দীর্ঘ পথও অতিক্রম করে

আসিনি। আমি দেহ নই, আমি আত্মা। আমি কোন পথই চলিনি। আমার পরিশ্রম হবে কেন? তা আপনি উপহাসই করুন আর তিরস্কার করুন, বলতে কী পাল্কীর তো কোন ভার নেই। পাল্কীর ভেতর যিনি বসে আছেন তাঁর কি কোন গন্তব্যস্থল আছে? আপনি যে আমাকে স্থূল বলে ব্যঙ্গ করছেন—তাতো ঠিকই বলেছেন। পঞ্চভূতের এই দেহকে জ্ঞানীরা স্থূলই বলেন। তাকে কখনও চেতন বলা যায় না। দেহের অভিমান নিয়ে যে জন্মেছে তারই স্থূলতা আছে, তারই ভার আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। ক্লান্তি আছে। আমি দেহ নই, তাই আমার ওসব নেই। আর যদি আপনি আমাকে দেহ অভিমানী বলে মনে করেন তবে আমি বেঁচে থেকেও মৃত। দেহ অভিমানীর একদিন মৃত্যু হবেই। আত্মাকে যে জানল না, সে বেঁচে থেকেও মৃত। আর দণ্ড দিয়ে আমাকে কাজ করাবেন? তাও কি হয়? প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক যদি চিরকাল স্থির থাকত তবেই একজন আর একজনকে কাজে নিযুক্ত করতে পারত। অজ যদি আপনার রাজত্ব চলে যায় আর যদি সেখানে আমি রাজা হই তবে আপনার আর আমার সম্পর্ক উল্টে যাবে। পাগল বা জড়ের মত আমি ব্যবহার করলেও আমি ব্রহ্মভাবে মগ্ন। এখন আপনি আমাকে উপদেশ দিন বা শাস্তি দিন তাতে কিছু ফল হবে না। আর যদি আপনি মনে করেন আমি ব্রহ্মভাব পাইনি, আমি মুক্ত নই, আমি জড় স্বভাব, তাহলে তো আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। জড়স্বভাব ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা যায় না।

আমি পূর্বে ভরত নামে রাজা ছিলাম। সংসারের সব আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আরাধনা করতাম। দৈববশে একটি হরিণের উপর আমার মন এমন ভাবে আসক্ত হয় যে, আমাকে হরিণ জন্ম নিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের অর্চনা করেছিলাম বলে ঐ হরিণের দেহেও আমার আগেকার স্মৃতি লোপ পায়নি। লোকজনের সংস্পর্শে এলে পাছে আবার মায়ায় বন্ধ হই, তাই আমি নিজেকে গোপন রেখে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াই।

ভরতের মুখে এসব জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে রাজা রহূগণ দ্রুত গতিতে শিবিকা থেকে নেমে তাঁর পদতলে পতিত হলেন। বললেন—আপনি কি সেই কপিলদেব? আপনিই কি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন। আমি আপনার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করছি সেজন্য ক্ষমা করুন। হে ব্রাহ্মণ, 'দেহই আমি' "এই কুবুদ্ধিরূপ সর্প আমাকে দংশন করেছে, আমি বিবেকদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি। জ্বরে কাতর ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসকের সুচিন্তিত ঔষধ যেমন অমৃতের মত কার্যকরী, প্রখর সূর্যতাপে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল যেমন তৃপ্তিপ্রদ, দেহে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন আমার পক্ষে আপনার কথাগুলি ঠিক সেইরূপই শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হয়েছে।

"জ্বরাময়ার্ত্তস্য যথাগদং সৎ নিদাঘদগ্ধস্য যথাহিমাম্ভঃ।
কুদেহমানাহি বিদষ্টদৃষ্টেঃ ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং॥ ৫।১২।২

রাজা রহূগণের অহংকার দূর হয়েছে। তিনি ভরত মহাভাগের কাছে নতজানু

হয়ে ভগবৎ কথা শুনছেন। বিকারগ্রস্ত রোগী যেন শান্ত সংযত হয়ে চিকিৎসকের তিক্ত ঔষধ সেবন করছেন।

রাজা রহূগণ আজ ব্যাকুল হয়ে ভরতের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর শিবিকা পড়ে আছে দূরে, বিস্মিত বাহকগণ প্রতাপশালী রাজাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে আর্ত হৃদয়ে বসতে দেখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ নিস্তরঙ্গ মহাসিন্ধুর মত শান্ত সমাহিত ও গম্ভীর। ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত রাজার প্রাণ। আপন মনের গোপনব্যথা জানানোর জন্য, সাধুর একমুঠো করুণা লাভের আশায় তাঁর মুখ দিয়ে স্রোতের মত বেরিয়ে যাচ্ছে ভাষা "ওগো প্রভু, তুমি আমাকে দয়া কর! আজ আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল। আমি বড় অপরাধী। আমি কিভাবে ভগবৎ কৃপা লাভ করতে পারব? সেই পরমপুরুষের সান্নিধ্য কেমন করে লাভ করব? তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দাও! কোন্ পথে কিভাবে গেলে আমার পরমপিতাকে দেখতে পাব? আমি বড় পাপী—আমি বড় অধার্মিক—আমি বড় অহংকারী। আমার অহংকার মোচন করে দাও সাধু!" সে কী ব্যাকুলকরা কান্না আর আকুল হৃদয়ের আত্মনিবেদন! ভাষা যেন শেষ হচ্ছে না। মহারাজ বাসনাসর্পের কামড়ে জর্জরিত তীব্র জ্বরে তার দেহ উত্তপ্ত--প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তিনি ঘর্মাক্ত ও উৎপীড়িত।

কয়েক মুহূর্তের পূর্বেই যে অহংকার প্রদীপ্ত রাজা নিজের রাজশক্তি ও পাণ্ডিত্যের বড়াই করেছিলেন আপনাকে যমরাজের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী বলে ভরতকে ভয় দেখিয়ে-ছিলেন আজ দীন হীন কাঙাল বাহকের কয়েকটি কথায় তাঁর মিথ্যা অভিমান, ক্ষুধিত অহংকার আর দর্পিত গৌরব কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! রাজার চোখে কাতর দৃষ্টি। অপূর্ব পরশমণির ছোঁয়া লাগতে লাগতেই লোহা সোনায় পরিণত হতে আরম্ভ করল।

রাজার চক্ষে ভরত এখনও ব্রাহ্মণমাত্র। ভরত রাজাকে বললেন—মানবদেহ পার্থিব উপাদানের বিকারমাত্র। তাঁর কাঁধে অধিষ্ঠিত কাষ্ঠময় শিবিকাও পার্থিব, আবার শিবিকার ভেতর সৌবীররাজ নামে যে দেহ অর্থাৎ যে দেহ 'আমি সিন্ধুদেশের রাজা' বলে ঘোষণা করছে তাও ক্ষণ ভঙ্গুর পার্থিব উপাদানে গঠিত। এইরূপে যখন রহূ-গণের হৃদয় আত্মাভিমান থেকে বিমুক্ত হয়েছে তখন ভরত মহাশয় কৃপা করে ভগবানের স্বরূপ রহূগণের নিকট প্রকাশ করলেন।

'জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং অনন্তরন্তবহির্ব্রহ্ম সত্যম্।

প্রত্যেক—প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দ সংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি।' ৫।১২।১১

যাঁকে জ্ঞানীগণ—বাসুদেব বলে কীর্ত্তন করেন তিনিই বেদে জ্ঞানাস্বরূপ বলে পরিচিত। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকলের অন্তরে বাহিরে। তিনি সত্য-স্বরূপ। জীব তা থেকে পরম শান্তিলাভ করে থাকে।

রহূগণ বললেন—কিন্তু সেই সত্যস্বরূপ পরমপুরুষকে কি করে লাভ করতে পারব?

ভরত মহাশয় বললেন—হে রহূগণ, বেদে উক্ত সেই ব্রহ্মকে তপস্যার দ্বারা পাওয়া

যায় না। যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারাও নয়। দান ধ্যানের দ্বারাও নয়। কেবল মহাপুরুষগণের পদধূলি মাথায় নিয়ে তাদের শরণাপন্ন হলে তাদের 'কৃপায় ভগবদ্ভক্তি লাভ হতে পারে।

'...তপস্যা ন যাতি ন বেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাদ্বা।

ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্ ।। ৫।১১।১২

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—হে অর্জুন, তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করলে, তা বেদপাঠ, তপস্যা, গো স্বর্ণাদি দান অথবা যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা আমাকে পাওয়া যায়।

যে ভক্তিলাভ করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সতত ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না তাই অনন্যাভক্তি। আর এই ভক্তি আসবে মহতের কৃপা থেকে। 'সাধুকৃপাবাহনা ভগবৎকৃপা'। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যবান জীব।

গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ।।'

ভক্তিলতা বীজ সাধন ভজন সাপেক্ষ নহে। শাস্ত্রপাঠ থেকেও আসেনি। একমাত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণরূপী গুরুর দয়ায় মানবজীবনে এই ভক্তিবীজ প্রাপ্তি হয়। তাই ধর্মজীবনে সাধু কৃপার এত প্রয়োজন।

এই সাধুর সঙ্গ লাভ থেকে কিভাবে ভগবদ্ভক্তি মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় তা ভরত মহাশয় বর্ণনা করছেন—সাধুর মুখে গ্রাম্য কথাবার্ত্তা স্থান পায় না। গ্রাম্য কথা বলতে সাধারণ বিষয় ও গৃহ সম্পর্কীয় কথা এবং পরচর্চা। এগুলি সাধুর মুখে আলোচিত হবে না।

শ্রীচৈতন্যদেবও বলেছিলেন—

'গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা ন কহিবে।'

তবে সর্বদা ভগবানের লীলা কথা স্মরণ করলে গ্রাম্যকথা মনেই আসে না। কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে বিষয়কথা আলুনি হয়ে থাকে। আবার যারা অবিরত বিষয়চিন্তা করে তাদের মনে কৃষ্ণ কথার ছোপ ধরে না।

মানুষের ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে সর্বদা মায়া হৃদয়ে প্রবেশ করছে। যার ফলে মহাভাগবত ভরতও হরিণ শাবকরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমাদের বাল্যজীবন থেকে সতর্ক হওয়া উচিৎ—যাতে মোহরূপ রাক্ষসী না পেয়ে বসে। সংসার জীবনে থেকে ভগবানকে স্মরণ করে মোহনিদ্রা কাটিয়ে আমাদের জেগে থাকতে হবে শুধু তাঁর জন্য। সকল জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্ম উৎকৃষ্ট। কারণ এ জন্মই সাধন ভজনের উপযোগী। আর মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করেই সাধুগণ বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় সাধুকে চিনতে পারা যায় না। যেমন—ভরত মহাশয়কে রাজা রহূগণ ইতিপূর্বে চিনতে পারেন নাই।

রহূগণ উপলব্ধি করলেন—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন যে কিভাবে থাকেন তা বোঝা যায়

না। তাই আমি ক্ষুদ্র শিশু থেকে বালক, যুবক ও বৃদ্ধকে বারবার নমস্কার করি। পৃথিবীর সমস্ত রাজারা যেন তাদের আশীর্বাদ পান।

'নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যঃ নমো যুবভ্যো নম আ বটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূত লিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্ ॥' ৫।১৩।২৩

রাজা রহূগণকে আশ্বাস্ত করে মহাজ্ঞানী ভরত এরপর অনেক উপদেশ দিলেন। বললেন, সংসারের পথ অতি দুর্গম। সাবধানে চলতে হয়। অর্থের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়, তেমনি জীবও সুখের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সুখতো পায়ই না, তার কাছে টাকা পয়সা যা ছিল তাও অরণ্যের ছ'জন ডাকাত এসে সব কেড়ে নেয়। নেকড়ে যেমন ভেঁড়াকে ঘাড়ে ধরে বনের গভীরে নিয়ে যায়, বনের শেয়ালরাও তেমনি অসাবধান পথিক পেলে ধরে টেনে নিয়ে গভীর বনের মধ্যে লতাপাতায় ঢাকা গর্তের মধ্যে দেয় ফেলে।

এই বিপদের হাত থেকে বাঁচার একটিমাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে, সংযম। সংসারীদের মধ্যে যারা সংযত হয়ে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে তারা বেঁচে যায়। শ্রীহরির সেবাপর হয়ে জ্ঞানের তরবারি হাতে নিয়ে তারা অনায়াসে সংসার অরণ্য পার হয়। দস্যুরা তাদের কিছুই করতে পারে না।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● অজামিলের মুক্তি ●

গীতালাপে পরিহাসে পুত্রনামচ্ছলে।
হরিনাম কেহ যদি একবার বলে ॥
সকল পাপের তবে হইবে বিনাশ।
জ্ঞানিগণ এইরূপ করেছে প্রকাশ ॥

সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক ভগবানের নাম করলে পরম মুক্তিলাভ হয়। প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে আগুনে যদি কাঠ দেওয়া যায় তাহলে সে কাঠকে দহন করবেই। ওষুধ যদি শক্তিশালী হয় তবে রোগ যতই কঠিন হোক না কেন তাতে নিরাময় হবেই। অজামিল মহাপাপী ছিল। সে মৃত্যুকালে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে যমদূতের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাই কৃষ্ণনামই মুক্তির একমাত্র ঔষধ।

মানুষ লক্ষ লক্ষ জন্মের ভেতর দিয়ে যে পাপস্রোত ইহ জীবনে টেনে এনেছে, সেই পুঞ্জীভূত পাপরাশিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও

প্রারব্ধ পাপ। যে পাপ এখনোও ফলোন্মুখ নয় তা অপ্রারব্ধ পাপ, যে পাপ বীজ উন্মুখ তা 'কূট' পাপ, যে পাপ প্রারব্ধ উন্মুখ তা 'বীজ' পাপ আর যে পাপের ফলে মানুষ আধি ব্যাধিযুক্ত বর্তমান দেহ প্রাপ্ত হয়েছে তা 'প্রারব্ধ' পাপ। জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা অপ্রারব্ধ, কূট ও বীজ পাপ নষ্ট করে ফেলতে পারা যায়, কিন্তু প্রারব্ধ পাপ অর্থাৎ যে পাপ পরিপক্ব হয়ে জীবের বর্তমান দেহ সৃষ্টি করেছে সেই পাপকে কোন সাধন ভজনই বিনষ্ট করতে পারে না। সেই প্রারব্ধ পাপের ফল ইহলোকেই আমাদের ভোগ করতে হয়। তবে সেই পাপকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা যদি ভস্মীভূত করা যায় তাহলে পরজন্মে আর এই পাপের বকেয়া টানতে হয় না।

তবে প্রায়শ্চিত্ত জন্মজন্মান্তরের পাপ হরণ করতে পারে না। অতএব জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞান জন্মালে দেহাভিমান থাকে না। দেহাত্মাভিমান না থাকলে পাপ আসে না। কিন্তু জ্ঞানলাভ সুদুষ্কর। তাই শুকদেব জন্মজন্মান্তরের পাপ-রাশি নষ্ট করবার জন্য অন্য উপায়ের কথা বলেছেন।

আগুন যেমন বাঁশ ঝাড়কে সমূলে ভস্মসাৎ করে, তেমনি ধীর ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তপস্যা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, সত্য, সৌচ, অহিংসা যম ও জপাদি নিয়মের দ্বারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপকে দূর করে থাকেন।

তপসা ব্রহ্মচর্যেন শমেন চ দমেন চ,
ত্যাগেন সত্য শৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা॥ ৬।১।১৩

কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সাধন কঠিন। চাই ভক্তিযোগ। প্রচণ্ড সূর্য যেমন শিশিরবিন্দুকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে তেমনি বাসুদেব পরায়ণ ভক্তগণ তপস্যা না করেও কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা সমুদয় পাপরাশিকে বিনাশ করেন। ভগবানকে ভক্তিভরে মন প্রাণ সমর্পণ করে যেমন পবিত্র থাকা যায় তপস্যা যমনিয়মাদির দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ লোকের অপ্রারব্ধ, কূট ও প্রারব্ধ পাপ সব নষ্ট হয়ে যায়।

তাই কৃষ্ণভজনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত মানুষ সহস্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হতে পারে না। মৃত্যুকালে একবার মাত্র নারায়ণ নাম করে মহাপাপী অজামিল সমস্তপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত পেয়েছিলেন।

শুকদেব বললেন—কনৌজ দেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। মোহে পড়ে দাসীর সংসর্গে অপবিত্র জীবন যাপন করত সে। সংসার চালাত চুরি-প্রবঞ্চনা আর জুয়া খেলার দ্বারা। ক্রমে সেই দাসীর গর্ভে পর পর দশটি ছেলে জন্মাল তার। সবার ছোট ছেলেটির নাম নারায়ণ। অজামিল সেই ছেলেটিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। মধুর স্বরে নামটি ধরে শিশুকে যখন তখন ডাকত কাছে। শিশুটিও আধ আধ ভাষায় কথা বলতে বলতে ছুটে আসত। এক কথায় ঐ ছেলেই অজামিলের ধ্যান জ্ঞান। সমস্ত মনটা থাকত নারায়ণের উপর। রোগশয্যায় শায়িত হল সে। প্রায় সংজ্ঞাহীন।

দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণের আশি বছর বয়স পার হয়ে গেল। একদিন ভীষণাকার

তিনজন যমদূত ব্রাহ্মণের শিয়রে হল হাজির। অজামিলতো ভয়ে অস্থির। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে ডাকতে লাগল 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে। অষ্টাশী বছরের মোহগ্রস্ত মনের উপর দিয়ে পুঞ্জীভূত জুয়াখেলা, বঞ্চনা ও চুরির স্মৃতি বিদ্যুতের মত খেলে যেতে লাগল তার। আশার রেখামাত্র নেই। বৃদ্ধের অন্তরে ও বাহিরে জমাট বেঁধে আছে। তবু ক্ষীণ কণ্ঠে নারায়ণ বলে ডাকছে। তার পুত্র নারায়ণ এল না। সে ক্রীড়ায় বিভোর। কিন্তু বিশ্বপিতা সাড়া দিলেন।

'বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াৎ দাসীপতিমজামিলম্।
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা॥' ৬।১।৩১

যখন যমদূতগণ দাসীপতি অজামিলের হৃদয়াভ্যন্তর থেকে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করছিল ঠিক সেই সময়ে অজামিল বিস্ময় বিহ্বল চক্ষে দেখল বিষ্ণুদূতগণ এসে বলপূর্বক যমদূতগণকে স্বকার্য সাধনে বাধা প্রদান করছেন। অজামিল দেখল—

সর্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎ পুষ্করমালিনঃ॥ ৬।১।৩৪
সর্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্বে চারু চতুর্ভুজাঃ।
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদা শঙ্খ চক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ॥ ৬।১।৩৫
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্বন্তঃ স্বেন তেজসা।
... ...

সমস্ত বিষ্ণুদূতগণের চক্ষু পদ্মপলাশের মত। তাঁদের পরিধানে পীত ও কাষায় বস্ত্র, মাথায় চূড়া কানে সোনার কুণ্ডল গলায় পদ্মের মালা। সকলেরই নব যৌবন। সকলেই মনোহর চতুর্ভুজধারী, হস্তে ধনু, তূণ, অসি, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাঁদের জ্যোতিতে দিনের আলোও প্রভাবিহীন হয়ে পড়েছে।

মৃত্যুকালে অজামিলের 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের ফলেই নারায়ণ তাঁর স্বরূপ ও স্বভাবসম্পন্ন পার্ষদগণকে অজামিলের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

বিষ্ণুদূতেরা এসে দেখলেন, যমদূতেরা অজামিলকে বেঁধে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। তাঁরা বারণ করলেন যমদূতদের। যমদূতেরা আপত্তি করে বলল—এই ব্রাহ্মণ মহাপাপী। নিজের ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী নিয়ে পাপের জীবন অতিবাহিত করছে। এর সমুচিত দণ্ডবিধান করতে হবে। তাই আমরা একে যমরাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বিষ্ণুদূতেরা বললেন, তা হয় না। এই ব্যক্তি কোটি-জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। মৃত্যুকালে শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছে। এর সব পাপ ধুয়ে গেছে।

বিষ্ণুদূতদের কথায় যমদূতেরা অজামিলের বন্ধন মুক্ত করে দিল।

অতএব পুত্রাদির নামচ্ছলেই হোক, পরিহাসচ্ছলেই হোক, গীতালাপের পরিপূর্ণার্থেই হোক অথবা অবজ্ঞা পূর্বকই হোক, ভগবান শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করলেই তা সকল পাপ বিনষ্ট করে।

'সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেববা
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ ॥' ৬।২।১৪

মানবজীবনে নাম রাখার এই সংস্কার ও অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোগীবিলাসীর গৃহে একটি পুত্র হয়ত নিরামিষভোজী। অহরহ ভগবানের নাম স্মরণ মৃত্যুকালের পক্ষে খুবই সহায়ক। সেইজন্য বৈষ্ণবগণ বলেন, রস না পেলেও নাম গ্রহণ ও কীর্তনের অভ্যাস সাধন করতে হবে। তবে নিয়মিত নাম গ্রহণ না করে লোক দেখান নাম গ্রহণ করলে টিয়াপাখীর মতই অবস্থা হয়ে থাকে। টিয়াপাখী খাঁচায় বসে হরেকৃষ্ণ বলছে কিন্তু যখন বিড়াল তাকে ধরে তখন সে হরেকৃষ্ণ ভুলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদের মানবজীবনে এরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

যমদূতেরা চলে গেলে অজামিলের অনুশোচনার অন্ত নেই। অজামিলের সে কী অনুতাপ! নিজেকে পাপিষ্ঠ বলে শত ধিক্কারে ধিকৃত করছে সে। সে বলছে, হে ভগবান! তোমাকে ভুলে আমি কী অপরাধ করেছি! দাসীর সাথে বাস করে ব্রাহ্মণ কুলের করেছি অপমান। ত্যাগ করেছি মাতাপিতাকে। বিবাহিত স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিইনি। তবু তুমি আমাকে দেখা দিলে! তোমার নাম ধরে আমার পুত্রকে ডেকেছিলাম আমি। অজ্ঞানের মোহে ভুলেছিলাম তোমাকে। তবু তুমি এ অধমকে করুণা করলে! আমি আর এ পৃথিবীতে থাকতে চাই না। তুমি দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি। তোমার পদপ্রান্তে আমাকে একটু ঠাঁই দাও—

কথাগুলো বলতে বলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল অজামিল। বিষ্ণুদূতেরা সুবর্ণরথে করে তাকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে গেলেন।

যমদূতেরা যমালয়ে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন যমরাজকে। যমরাজ সমস্ত অবগত হয়ে বললেন—তোমরা ক্ষুব্ধ হয়ো না বৎস। "নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে" —ভগবদ্ভক্ত ও নামগ্রহণকারী লোককে যমরাজও গ্রহণ করতে সমর্থ নয়। কারণ কৃষ্ণ নাম অমৃতের সমান। সমস্ত পাপের নাশকারী এই নাম। যে যতই পাপ করুক পরিনামে সে যদি মন দিয়ে কৃষ্ণনাম করে তাহলে তাকে যমালয়ে আসতে হবে না। তাছাড়া যাদের জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে না সেজিহ্বা ভেক জিহ্বা মাত্র! যাদের চিত্ত ভগবানের চরণকমল স্মরণ করে না, সে চিত্ত পশুচিত্ত। যাদের মাথা কোনদিন কৃষ্ণচরণে নত হয় না সে মাথা ছাগ মাথার সমান। অতএব ঐসব হতভাগা ভগবৎ ভক্তিহীন বদ্ধ জীবকে আমার আলয়ে শাস্তির জন্য ধরে আনবে। রাজাধিরাজ নারায়ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অদ্বিতীয় ও তুলনারহিত। নারায়ণে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ! তাই যে বাক্যের দ্বারা পবিত্রকীর্তি ভগবানের গুণসমূহ কীর্তন করা হয় তাই সার্থক বাক্য। যে হস্ত তাঁর পূজা অর্চনাদি করে তাই প্রকৃত হস্ত। অন্য বিষয় কর্মকারীদের হস্ত জড়পিণ্ড মাত্র। যে মন তাঁকে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত বলে জানে তাই প্রকৃত মন আর যে কান তাঁর পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করে তাই প্রকৃত কান।

এই কথাগুলি বলে যমরাজ নারায়ণের নিকট স্বীয় দূতগণের কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তা দেখে যমদূতগণের ঈশ্বর সন্দেহ দূরীভূত হয়। তারা সেদিন থেকেই শ্রীহরির শরণাগত ব্যক্তিকে দর্শন করতেও ভয় পেয়ে থাকে—নিকটে যাওয়া তো দূরের কথা।

"নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা দ্রষ্টুঞ্চবিভ্যতি।" ৬।৩।৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

● দক্ষরাজার অভিশাপ ●

ত্রিগুণাতীত হরি ভক্তে প্রকাশিত।
মৃত্যুকালে অমৃত হয়ে হন প্রতিভাত॥

চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত প্রাচীন বর্হির দশপুত্র প্রচেতাগণ সমুদ্র মধ্যে তপস্যা সেরে দেখলেন, সমগ্র পৃথিবী বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন—মানবগণের বাসের অযোগ্য।

তখন তারা ক্রোধ সংযত না করেই বৃক্ষলতাগুল্ম প্রভৃতিকে দগ্ধ করার জন্য তপস্যাবলে মুখ থেকে অগ্নি ও বায়ুর সৃষ্টি করলেন। এইরূপে বায়ুর সহায়ে দুরন্ত অগ্নি উত্থিত হয়ে যখন সে সমগ্র পৃথিবীকে মরুভূমিতে পরিণত করার উপক্রম করছে তখন বনস্পতিগণের রাজা সোম প্রচেতাগণকে ক্রোধ সংবরণ করতে অনুরোধ করলেন।

শ্রীহরি প্রচেতাগণকে প্রজাসৃষ্টি ও প্রজারক্ষার জন্য আদেশ করেছিলেন কিন্তু প্রচেতাগণ যদি বৃক্ষলতাদি ধ্বংস করে ফেলেন তাহলে জীবগণ অন্ন থেকে বঞ্চিত হবে এবং জীবসৃষ্টি হলেও প্রাণধারণযোগ্য আহার্যের অভাবে সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তারপর রাজা সোম প্রচেতাগণকে প্রদান করলেন তাঁর এক পালিতা কন্যা। সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতাগণের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই পুত্রের নাম দক্ষ। অতএব দশজন পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে অসাধারণ শক্তিমান হয়ে উঠলেন দক্ষ।

দক্ষের প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। অল্পকালের মধ্যেই রাজা হয়ে প্রজাপতি আখ্যায় ভূষিত হলেন তিনি। কিন্তু জীব সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। এই ইচ্ছা নিয়ে প্রজাপতি দক্ষ ইচ্ছামত জীবসৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে না দেখে তিনি তপস্যার নিমিত্ত বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে করলেন গমন। তারপর হংসগুহ্য নামক স্তোত্রের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনায় ব্রতী হলেন।

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে গুণত্রয়াভাস নিমিত্ত বন্ধবে।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভিঃ নিবৃত্তমানা বধয়ে স্বয়ম্ভুবে॥ ৬।৪।২৩

—যা হতে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণের প্রকাশ হয়ে থাকে, যিনি প্রকৃতি ও কালের নিয়ন্তা, যার রূপ ও গুণের সীমা নাই, যিনি ভক্তের নিকট প্রকাশিত কিন্তু বিষয়ীর নিকট অপ্রকাশিত, যিনি স্বপ্রকাশ, সেই পরম পুরুষকে আমি প্রণাম করি।

এইরূপে দ্বাদশটি শ্লোকে শ্রীহরির স্তব করলে শ্রীহরি দক্ষের নিকটে আবির্ভূত হলেন। দক্ষ বিস্মিত হয়ে দেখলেন—নারায়ণ গরুড়ের স্কন্ধদেশে চরণযুগল স্থাপন করেছেন। তাঁর আজানুলম্বিত অষ্টমহাবাহুতে শংখ, চক্র, গদা, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুর পাশ বিরাজিত। যেই পীতবসনধারী মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁর বদন-মণ্ডল ও দৃষ্টি প্রসন্ন। কণ্ঠ থেকে চরণ পর্যান্ত বনমালায় পরিব্যাপ্ত এবং বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি শোভিত। তাঁর মস্তকে মহাকিরীট, চরণে নূপুর ও কর্ণে কুণ্ডল। তিনি চন্দ্রহার, অঙ্গুরীয়, হস্তের বলয়ে সুশোভিত।

তারপর সেই অত্যাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করে দক্ষ অতিশয় আনন্দিত হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। কিন্তু শ্রীহরিকে কোন কথাই বলতে পারলেন না। তখন অন্তর্য্যামী নারায়ণ দক্ষকে বললেন যে তাঁর তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে এবং সঙ্কল্পানুযায়ী উত্তরোত্তর প্রজাবৃদ্ধি হবে। এই কথা বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

নারদের উপদেশে দক্ষপুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি না করে মোক্ষমার্গ অবলম্বন করলে দক্ষ কুপিত হয়ে নারদকে যে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন তা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। প্রজাপতি দক্ষ শ্রীহরির দর্শন লাভ করে প্রত্যাবর্ত্তন করবার পর তাঁর হর্য্যশ্ব নামক সমধর্ম ও সমভাববিশিষ্ট অযুতসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। পিতার আদেশে তাঁরা সিন্ধুর মোহনায় নারায়ণসর নামক তীর্থে উগ্র তপস্যায় রত হলেন। নারদ তা জানতে পেরে তাদেরকে প্রজাসৃষ্টি করতে বাধা দিয়ে পরমাত্মাকে জানার ধ্যানে বিভোর হতে বলেন।

দক্ষ এটা জানতে পেরে দুঃখ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা এসে তখন তাঁকে দেন সান্ত্বনা। দক্ষ তখন স্বীয় পত্নীর গর্ভে সবলাশ্ব নামক সহস্র সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করলেন। পিতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে সবলাশ্বগণ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত গমন করলেন নারায়ণসর নামক তীর্থে। সেখানেও নারদ গিয়ে বললেন—হে দক্ষপুত্রগণ! তোমাদের অগ্রজ হর্য্যশ্বগণের অনুসৃত মোক্ষমার্গ অবলম্বন কর।

নারদের কথা শুনে তাঁরাও অগ্রজের পথ অবলম্বন করলেন। এ খবর পেয়ে দক্ষ ক্রোধে হয়ে উঠেন অগ্নিশর্মা। সর্বজ্ঞ নারদ তা জানতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে গেলেন সেখানে। কিন্তু দক্ষ তখন ক্রোধে জ্বলছেন। তিনি অভিশাপ দিলেন নারদকে—হে মূর্খ, আমার পুনঃ পুনঃ অপকার করার জন্য তোমাকে অহরহঃ ত্রিলোক ভ্রমণ করতে হবে অথচ কোথাও তোমার স্থান হবে না।

দেবর্ষি তখন 'তাই হোক' (বাঢ়ং) বলে সেই অভিশাপবাক্য সাগ্রহে বরণ করে নিলেন।

গৃহী ও সন্ন্যাসী আমরা সকলেই আজ দক্ষের এই অভিশাপ বাক্যকে পরম সম্পদ বলে গ্রহণ করেছি। শ্রীনারদ যদি অভিশাপ না পেতেন তাহলে স্বর্গে মর্ত্তে ঘুরে

বেড়াতেন না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নলকুবের ও মণিগ্রীব কেউ উদ্ধার হতেন না। আজও নারদের বীণা এই পৃথিবীতে হরিনাম ঝঙ্কার করছে। কোন কোন ভাগ্যবান তা শুনতে পান। দেবর্ষির হরিনামে আনন্দ। তিনি মূর্ত্ত হরিণাম স্বরূপ। তাইতো সদা তিনি শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দক্ষ প্রজাপতি পুত্রগণের দ্বারা প্রজাসৃষ্টির আশা ত্যাগ করে তাঁর ষাটজন কন্যার সাহায্যে প্রজাবৃদ্ধি করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। তারপর ঐ ষাটজন কন্যাকে উপযুক্ত জামাতার হস্তে প্রদান করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

এই সমস্ত কন্যার গর্ভে যে সমস্ত সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করলেন পরে তারাই বংশবৃদ্ধি করে পূর্ণ করেছিলেন দক্ষের অভিলাষ। সফল হল শ্রীহরির আশীর্বাদ।

তৃতীয় অধ্যায়

● নারায়ণ কবচ প্রদান ●

গুরু চিন্ত গুরু ভজ গুরু কর সার।
গুরু রূপে নারায়ণ ভ্রমে অনিবার॥
গুরুর জাতিকুল বিচার না করি।
গুরু পদে দীক্ষা নিয়ে ভজ তুমি হরি॥

ব্যাসদেবকৃত ভাগবতের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে ইন্দ্রের অপরাধে দেবগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দেবতাগণের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ এবং দেবগণ কর্ত্তৃক ঋষিবিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বরণ এবং বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে নারায়ণ কবচ প্রদানের কাহিনী।

শ্রীশুকদেব বললেন—একদা ইন্দ্র শচীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি এসে উপস্থিত। ইন্দ্র তখন সিংহাসন থেকে উঠে—তাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। ইন্দ্রের ঐশ্চর্য্যমদে চিত্তবিকার হয়েছে—এটা বুঝতে পেরে বৃহস্পতি কাকেও কিছু না বলে সহসা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের চৈতন্য হল। তিনি অনুতাপের অনলে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে ম্লান বদনে সভামধ্যে এসে বললেন—হে সভাসদবর্গ, আজ আমি চরম অপরাধ করেছি। গুরুদেবকে অবজ্ঞা করে আমি তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। আজ আমি তাঁর শ্রীচরণে প্রণিপাত করব।

গুরুদেব বৃহস্পতি শিষ্যের অনুতাপের কথা বুঝতে পারলেন ধ্যান বলে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় অন্তর্ধান শক্তির প্রভাবে নিজগৃহ থেকে অদৃশ্য হলেন।

এদিকে গুরুদেবকে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন ইন্দ্র। ভাবনা চিন্তা আর অপরাধের ভয়ে তাঁর মাথাটা বন বন করে ঘুরতে লাগল। কোন কাজে বসে না মন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাটাতে লাগলেন দিন।

আর ঐ দুর্বলতার সুযোগে অসুরগণ আক্রমণ করল স্বর্গরাজ্য।

গুরু পরিত্যক্ত দেবতাগণ পরাজিত হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তাদের তিরস্কার করে বললেন—অবিলম্বে তোমরা তপস্বীব্রাহ্মণ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে গুরুপদে বরণ কর। গুরু না থাকলে কোন কর্ম সিদ্ধ হয় না।

কিন্তু বিশ্বরূপের মাতৃকুল অসুর। সুতরাং দেবতাদের জয় অসম্ভব। তথাপি বিশ্বরূপকেই গুরুপদে বরণ করতে মনস্থ করলেন। তাছাড়া কোন উপায় ছিল না।

বিশ্বরূপ গুরুপদে অলংকৃত হয়ে ইন্দ্রকে দিলেন নারায়ণ কবচরূপে একটি বৈষ্ণবী বিদ্যা। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের নিকট নারায়ণ কবচ ধারণ করে যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করলেন।

[কুশহস্তে আচমন করে শুদ্ধসত্ত্বমানুষ অষ্টাক্ষর (ওঁ নমো নারায়ণায়) ও দ্বাদশাক্ষরী (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) মন্ত্রের দ্বারা বাক্ সংযম করে নারায়ণ কবচ ধারণ করতে হয়।]

চতুর্থ অধ্যায়

● বৃত্র সংহার ●

পতিত পাবন, ওগো তুমি নায়ারণ।
দেখা দাও বলে সদা কাঁদি সর্বক্ষণ॥
তোমার কাতর ডাকে গলিবে পাষাণ।
শ্রীহরির আগমনে পাবে হৃদয়ে আসান॥

বিশ্বরূপ দেবতাগণের পুরোহিত হয়ে ইন্দ্রকে নারায়ণ কবচ প্রদান করলে দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হলেন এবং পরাজিত অসুরগণকে ধ্বংস করতে লাগলেন। তবে তিনি মাতামহ কুলসম্ভূত অসুরগণকে বিস্মৃত হতে পারলেন না। তিনি যজ্ঞ করবার সময় দেবগণের কল্যাণ কামনা করে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন অথচ অসুরগণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ গোপনে তাদেরকে যজ্ঞভাগ প্রদান করতেন। পুরোহিতের এই কপটতা ইন্দ্রদেব গোপনে জানতে পেরে অত্যন্ত রেগে গেলেন। তারপর করলেন গুরুদেব বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদ।

বিশ্বরূপের তিনটি মাথা ছিল। ঐ বিচ্ছিন্ন তিনটি মাথার মধ্যে একটি চাতক পাখী, অপরটি চড়ুই পাখী এবং তৃতীয়টি তিতির পাখী হল। এদিকে ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যা করে যে পাপভার বহন করলেন তা ভূমি, বৃক্ষ জল ও স্ত্রীগণকে সেই পাপভার সমভাবে ভাগ করে দিয়ে নিজে হলেন মুক্ত। এই পাপভার গ্রহণের ফলে পৃথিবীর স্থানে স্থানে মরুভূমি দেখা যায়, বৃক্ষসমূহ থেকে নির্য্যাস বের হয়, জলমধ্যে বুদ্বুদ ও ফেনা দেখা যায় এবং স্ত্রীলোকগণ প্রতিমাসে রজস্বলা হয়।

পুত্র বধের কথা শুনলেন ত্বষ্টাঋষি। তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক যজ্ঞ করলেন। উদ্দেশ্য ইন্দ্রকে বধ করা। যজ্ঞ সমাপনান্তে ত্বষ্টা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

ইন্দ্রশত্রো। বিবর্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বষম্। ৬।৯।১১

—হে ইন্দ্রবিনাশক, তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং শীঘ্র শত্রুকে বিনাশ কর।

কিন্তু ত্বষ্টার উচ্চারণভেদ হওয়ার ফল হল বিপরীত। যজ্ঞীয় অগ্নি থেকে যে বৃত্র নামক অসুর উৎপন্ন হল সে ইন্দ্রকে বধ না করে নিজেই নিহত হল। যজ্ঞের এই বিপরীত ফল কেন হল তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে সুন্দরভাবে।

'ইন্দ্রশত্রো'—এই সম্বোধন পদটির প্রথম স্বর যদি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয় তাহলে শব্দটি বহুব্রীহি সমাসভুক্ত হয়ে ইন্দ্র শত্রু যার—এই অর্থ হয়। যদি আদ্যস্বর ক্ষীণ ভাবে উচ্চারিত হয় তা হলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসভুক্ত হয়ে 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ অর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ত্বষ্টার উচ্চারণে ভুল হল। তিনি জোরে পদটি উচ্চারণ করে ফেললেন এবং এই বিকৃত উচ্চারণের ফলে অর্থের বিভিন্নতা ঘটে গেল ত্বষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। হে ইন্দ্রের শত্রু— মি ইন্দ্রকে বধ কর, কিন্তু উচ্চারণ দোষে অর্থ হয়ে গেল ইন্দ্র যার শত্রু। সেই ইন্দ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রের শত্রুকে নিহত করুক। যজ্ঞ অথবা পূজার সময় তাই মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন।

> মন্ত্রঃ হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
> স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ॥

—মন্ত্র যদি স্বর অথবা বর্ণের উচ্চারণের দোষে উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়, তাহলে সেই বজ্রসম মন্ত্র যজমানের কল্যান সাধন না করে তাকেই নিধন করে ফেলে। যেমন 'ইন্দ্রশত্রু কথাটির উচ্চারণের দোষে যজমানের অনিষ্ট হয়েছিল।

তাই উদ্দেশ্য বিচলিত মন্ত্র উচ্চারণের ফলে হোমাগ্নি থেকে কৃতান্তের ন্যায় এক ভীষণাকার অসুর উত্থিত হল। ত্বষ্টার তপস্যা যেন মূর্তিমতী হয়ে এই কৃষ্ণবর্ণ অসুরদেহে প্রকাশিত হল এবং নিজের দেহ ও বীর্যের দ্বারা লোকসমূহ আবৃত করে ফেলার জন্য সেই অসুর ত্রিভুবণে বৃত্রাসুর নামে হল পরিচিত।

তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সশস্ত্রে বৃত্রকে আক্রমণ করলেন কিন্তু বৃত্রাসুর তা গ্রাস করল অনায়াসে। স্বর্গের দেবতাগণ "বিস্মিতাঃ সর্বে বিষণ্ণাঃ গ্রস্ততেজসঃ"—বিস্মিত বিষণ্ণ ও হতপ্রভ হয়ে পরম পুরুষ ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। সেই স্তব শুনে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান আবির্ভূত হয়ে বললেন দেবগণকে—তোমরা অবিলম্বে অথর্বমুনির পুত্র দধীচির শরণাপন্ন হও। দধীচির অস্থি নির্মিত বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে।

নিরুপায় দেবগণ তখন মর্ত্যধামে এসে ধ্যানমগ্ন দধীচির নিকট আবির্ভূত হলেন। দেবলোকের দুর্দশার কথা জানালেন মুনিবরকে।

দবলোকের দুর্দিনে দয়াপরবশ হয়ে বিনীত বচনে বললেন দধীচি—যদি আমার মত সামান্য একজন মানুষের অস্থিদানে সমগ্র স্বর্গরাজ্য উদ্ধার পায় তাহলে সেতো আমার পরম সৌভাগ্য। 'চিরমোক্ষফলপ্রদ নিত্য হিতকর।' আমি সানন্দে দেহত্যাগ করছি, আপনারা অবিলম্বে আমার দেহাস্থি নিয়ে যান। এই বলে পরমহিতাকাংখী

মুনিবর 'দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।'

তারপর দেবতারা দেহাস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মাণ করলেন বজ্র। সেই বজ্র নিয়ে দেবতারা ছুটে গেলেন বৃত্রাসুরের দিকে।

নর্মদা তীরে আবার নতুনভাবে বাঁধল দেবাসুরে সংগ্রাম।

বজ্রের ভয়ে প্রথমে অসুররা ভীত হয়ে চারদিকে পলায়ন করতে লাগল। কিন্তু অসুররাজ তাদেরকে উপদেশ দিয়ে পুনরায় একত্র করে আরম্ভ করল যুদ্ধ। বৃত্র বলল— তোমরা মৃত্যুকে ভয় করছ কেন? জন্ম যখন হয়েছে, মৃত্যুতো অবশ্যই হবে। আমাদের জন্মের সাথে মৃত্যুওতো জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া আমরা তো মৃত্যুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যই সর্বদা ছুটছি। মৃত্যুই জীবনের চরম সত্য। তাই পশুর মত, কাপুরুষের মত জীবন ধারণ করার চেয়ে বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করা শ্রেষ্ঠ। এই সংসারে দু-প্রকারের মৃত্যু আছে। প্রথমতঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহ জয় করে যোগমার্গে ব্রহ্ম ধারণা ও চিন্তনের দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করা, দ্বিতীয়তঃ বীরের মর্যাদা নিয়ে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করা—এই দুই প্রকার মৃত্যুই ভাল।

বৃত্রের এহেন উপদেশ অগ্রাহ্য করে তথাপি অসুরগণ পালাতে লাগল। আর দেবগণ তখন তাদের সেই পশ্চাদ গতিমুখে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগলেন একের পর এক হত্যাকাণ্ড।

তখন বৃত্রাসুর রণরঙ্গে উন্মত্ত হয়ে শূল উত্তোলন পূর্বক সবলে পৃথিবীকে কম্পিত করে গজরাজের মত দেবসৈন্যদের পদদ্বয়ের দ্বারা দলিত ও মথিত করতে লাগল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে স্বর্গলোকে পড়ে গেল হাহাকার। দিকে দিকে পড়ে গেল কান্নার রোল। দেবতাগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে ছুটতে লাগলেন চারদিকে।

দেবতাগণকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত দেখে স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর ঐরাবতে চড়ে আক্রমণ করলেন বৃত্রাসুরকে। কিন্তু বৃত্র গদাঘাতে ঐরাবতের মাথা ফাটিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐরাবত রক্তবমন করে আটাশহাত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। দেবরাজের এই বিপদের সময় বৃত্রাসুর কিন্তু ইন্দ্রকে আঘাত করল না। সে ডেকে বলল—তুমি আমার ভ্রাতা বিশ্বরূপকে হত্যা করেছ, তার সমুচিত শাস্তি পাবে। তবে তুমি যদি দধীচির অস্থি নির্মিত বজ্র দিয়ে আমাকে নাশ করতে চাও তাহলে সেটা হবে শাপে বর। তোমার এই বজ্র শ্রীহরির তেজ ও দধীচির তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। তুমি ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক নিয়োজিত। যেখানেই শ্রীহরি সেখানেই বিজয়। আজ যদি আমি মরি তাহলে আমার বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যাবে—সে শুধু শ্রীহরির কৃপায়। একথা বলতে বলতে বৃত্রাসুর ভক্তিভাবে পুলকিত হয়ে সহসা বলে উঠল—

অহং হরে, তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।

মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতি কায়ঃ॥ ৬।১১।২৪

—হে প্রাণেগোবিন্দ শ্রীমধুসূদন, আমি আপনার চরণাশ্রিত দাসগণের দাস হব। আপনি আমার প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের অধিপতি। আমার মন সর্বদা আপনার নাম- গানে বিভোর হয়ে থাকুক আমার এই অসুর শরীর আপনার পূজায় নিযুক্ত হোক।

হে ভাগবান! আপনাকে পরিত্যাগ করে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং মুক্তি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না।

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাতিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং ব সমঞ্জস, ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ ৬।১১।২৫

ওগো ব্যথাহারী ভগবান, ওগো পদ্মপলাশ লোচন, ওগো আমার হৃদয়ের দেবতা, অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে যেমন মাতার দর্শন কামনা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসগণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে যেমন স্তন্যপানের অভিলাষ করে, পতি বিরহে দুঃখিতা স্ত্রীলোক যেমন দূরদেশ গত পতির সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে—সেইরূপ আমার মন আপনাকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগা স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।

প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণাঃ মনোহর দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥ ৬।১১।২৬

কী মহান বৃত্রাসুরের চরিত্র! বৃত্রাসুরের দেহে আত্মবুদ্ধি নাই। জয় পরাজয় জীবনমৃত্যু সবকিছুই একাকার হয়ে গেছে তার জীবনে। একমাত্র পরমপুরুষ ভগবানই তাঁর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে বিরাজ করছেন। কৃষ্ণের প্রতি বৃত্রাসুরের এ কী প্রচণ্ড ভক্তি কী প্রবল ভালবাসা! ভক্তি আর ভালবাসা একহয়ে রূপ নিয়েছে শ্রদ্ধা ভক্তিতে। ঐটাই অহেতুকী ভক্তি। এই ভক্তির উজ্জ্বল আলোর মাঝখানে ক্ষতবিক্ষত দেহ বৃত্রাসুর যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছে। দেবরাজ ইন্দ্র আজ তার কাছে নিষ্প্রভ ও মলিন।

ভগবৎ ভক্তি আর ভগবৎ প্রাপ্তির আশায় বৃত্রাসুর ব্যাকুল। তার রক্তের অণুকণায় আর তরঙ্গে তরঙ্গে ভক্তির উচ্ছ্বাস। ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুল আগ্রহ। ঈশ্বরের চরণে লীণ হয়ে যাওয়ার উদগ্রবাসনা। সেই বাসনা বানবিদ্ধ পাখীর মত চঞ্চল হয়ে উঠছে। আর তর সইছে না। এখুনি যেন সেই পরম পুরুষের চরণে দেহ বিসর্জন দিতে পারলে তবে জীবন সার্থক হয়। এই চিন্তা আর ভগবৎ বাসনা নিয়ে বৃত্রাসুর ভাবল—যুদ্ধে জয়ী হলে ভগবৎ প্রাপ্তিতে দেরী হবে, অতএব মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। আজ আমি এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিষ্ণু নিয়োজিত আঘাতাঘাতে দেহ বিসর্জন দেব।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বৃত্রাসুর তখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইন্দ্রকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করল। ইন্দ্র তখন বজ্র নিয়ে তার একটি বাহু ছেদন করলেন। কিন্তু ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র গেল পড়ে।

লজ্জিত হয়ে ইন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছেন—কি করবেন—এমন সময় বৃত্রাসুরই বলল—হে পুরন্দর, তুমি পুনরায় বজ্র ধারণ কর। আমি তোমার বজ্রে জীবন বিসর্জন দেব। যেমন কাষ্ঠ নির্মিত নারী প্রতিমা পরাধীন, পত্র নির্মিত পশু যেমন পরাধীন, তেমনি জীবকুল ভগবানের অধীন। সেই ভগবানের দয়াতেই জীব আয়ু, শ্রী, যশঃ, ঐশ্বর্য পেয়ে থাকে। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই জীবের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

—তার জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু আমার কাছে আজ সমান।

'আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তি ঐশ্চর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ।
ভবন্ত্যের হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্যয়া॥ ৬।১২।১১
তস্মাদ্ কীর্ত্তি যশসোর্জ্জয়া পরাজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখ দুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা॥' ৬।১১।১২

যেহেতু সমস্তজীবই ঈশ্বরের অধীন সেহেতু জীবনে মরণে হর্ষ বিষাদ ত্যাগ করাই উচিৎ।

হে দেবেন্দ্র, আমার অস্ত্র, বাহু ছিন্ন হয়েছে তবু আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছি। তুমি উদ্যম প্রকাশ কর।

একথা শুনে বজ্রপাণি বললেন—হে বৃত্র, আজ তোমাব চরিত্র আমার বিস্ময় সৃষ্টি করছে। তুমি অসুর হয়েও ভাগবতের স্বভাব লাভ করেছ। তুমি জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়াকে করেছ অতিক্রম। তুমি—

খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃ প্রকৃতেস্তব।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ॥

তোমার মতি সত্বময় ভগবান বাসুদেবে দৃঢ় ও শক্ত হয়েছে। ভগবান যার সহায়, ভগবানে যার মতি—ঈশ্বরের পদতলে যার লীণ হওয়ার বাসনা তার স্বর্গের সুখে কিংবা মুক্তির আনন্দের প্রয়োজন কি? তুমি অসুর কুলে জন্মেও যে ভক্তির আস্বাদ পেয়েছ তা আমরা পাইনি। তোমার জীবন ধন্য বৃত্র—তোমার প্রাণ সার্থক তুমি আজ অমৃতসমুদ্রে খেলা করছ। তোমার খানাডোবার জলের প্রয়োজন কি?

কিন্তু বৃত্রাসুর ক্ষান্ত নয়। সে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখাতে লাগল প্রবলভাবে। ইন্দ্র তখন বজ্রের দ্বারা তার দ্বিতীয় হস্তও ছিন্ন করলেন। নিরুপায় বৃত্র তথাপি মুখ ব্যাদান করে গিলতে উদ্যত হল দেবরাজকে। দেবরাজ তখনি মহাশত্রুর মস্তক ছিন্ন করে দিলেন।

আর অমনি বৃত্রের দেহ থেকে নির্গত জীবনামক এক সূক্ষ্ম জ্যোতি ভগবান বিষ্ণুতে গিয়ে মিলিত হল।

দেবরাজ পরমভাগবত বৃত্রাসুরকে বধ করে গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। 'ব্রহ্মহত্যা পাপ' এক চণ্ডাল কন্যার মূর্ত্তি ধরে তাকে করতে লাগল অনুসরণ। সেই কন্যা ক্ষয়রোগে আক্রান্তা। রক্তময় তার পরিধেয় বসন। ইন্দ্র দেখছেন—পাপরূপ চণ্ডালিনী ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত একরাশ কেশ এলায়ে মুখ বিস্তার পূর্বক তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। তার অট্টহাসিতে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ—তার চোখ দুটোতে জ্বলছে দ্বাদশ চিতার সুতীব্র আগুন আর তার হাত পা গুলোর মাঝে মাঝে দগ দগ করছে পচা নোংরা ক্ষত। তাতে কিলবিল করছে অসংখ্য কৃমিকীট। তারপর—

মাছের গায়ের গন্ধের মত তার নিশ্বাসবায়ুর গন্ধে সমস্ত স্থান দুর্গন্ধে ভরে যাচ্ছে।

'বিকীর্য পলিতান্ কেশাংস্তত্র তিষ্ঠেতি ভাষিণীম্।
মীণগন্ধ্য সুগন্ধেন কুর্ব্বতীং মার্গদূষণম্॥' ৬।১৩।১৩

ইন্দ্র এই ভীষণামূর্ত্তিকে দর্শন করে পরিত্রাণের জন্য মানস সরোবরের পাশের এক গহ্বরে প্রবেশ করলেন এবং অলক্ষিত ভাবে থেকে সহস্রবছর ভগবৎ চিন্তায় অতিবাহিত করলেন।

এই দীর্ঘকাল স্বর্গের শূন্য সিংহাসনকে অলংকৃত করেছিলেন বিদ্যা তপস্যা ও যোগ সাধনার প্রতিমূর্ত্তি রাজা নহুষ। কিন্তু অহংকারে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল। মুহূর্তের দুর্বলতায় পতন হল নহুষের। বিরহকাতরা রোদন বিবশা ইন্দ্রানীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ফলে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে নহুষ সর্পযোনি প্রাপ্ত হলেন। ঘটনাটি হচ্ছে—

নহুষ একদিন শচীদেবীকে বলেছিলেন—আমি দেবরাজ। আমাকে ভজনা কর। ভীত শচী বলেছিলেন—যদি ব্রাহ্মণগণ শিবিকায় চড়িয়ে তোমাকে আমার সমীপে আনয়ন করতে পারে তাহলে তোমাকে আমি ভজনা করতে পারি।

রাজা নহুষ আনন্দের সাথে অগস্ত্যাদি ঋষিগণকে বাহক করে শিবিকায় চড়ে শচী সমীপে গমন করলেন। পথে "শীঘ্রং সর্প সর্প" মানে দ্রুত চল—দ্রুত চল বলে ব্রাহ্মণদের তাড়না করলে অগস্ত্যঋষি সক্রোধে—'ত্বং সর্পোভব'—"তুমি সর্প হও" বলে অভিশাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নহুষ স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে বৃহৎ অজগর সাপের আকৃতি ধারণ করলেন। তারপর বাস করতে লাগলেন দ্বৈতবনে।

ওদিকে সহস্র বছর অতিবাহিত হলে ইন্দ্র ভগবৎ স্মরণের দ্বারা ব্রহ্ম হত্যা রূপ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন স্বর্গরাজ্যে।

পঞ্চম অধ্যায়

● বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের কাহিনী ●

স্বীয় কর্মফলে জীব জগতেতে ঘুরে।
জ্ঞানের অভাবহেতু চিনে না আত্মপরে॥
সেই জ্ঞান লাভ কর হরিভক্তি দ্বারা।
শ্রীহরির কৃপা তুমি পাবে অতি ত্বরা॥

বৃত্রাসুরের অসাধারণ হরি ভক্তির কথা শুনে মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে বললেন হে ব্রাহ্মণ! রাজস ও তামসপ্রকৃত পাপী বৃত্রাসুরের কি প্রকারে ভগবানে দৃঢ় মতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল?

পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য শ্রীশুকদেব রাজা চিত্রকেতুর উপখ্যানের অবতারণা করে বললেন—হে রাজা! শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক

রাজা ছিলেন। তার রাজত্বে প্রজাদের কোন অভাব ছিল না। চিত্রকেতুর স্ত্রী ছিল অসংখ্য কিন্তু কোন পুত্র ছিল না। রাজা তাই দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

একদা তাঁর প্রাসাদে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে তিনি বললেন—তোমার মুখ চিন্তায় বিবর্ণ কেন তা আমাকে বল। ঋষি সবই জানতেন তবু রাজার মুখ থেকে কারণটি শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

জ্ঞানী রাজা বললেন—কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ—তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা আপনি তো সমস্তই অবগত আছেন, তবু আমি আপনাকে বলছি। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে মাল্যচন্দন যেমন আনন্দ দিতে পারে না তদ্রূপ অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে সুখ থেকে বঞ্চিত করছে। অতএব যাতে পুত্রের দ্বারা পুং নামক নরক থেকে আমি ত্রান পেতে পারি তার কোন বিধান দিন।

রাজার কাতর উক্তি শুনে অঙ্গিরা ঋষি চরু পাক করে তার কিছু অংশ রাজার প্রথমা পত্নী কৃতদ্যুতিকে ভোজন করালেন। তারপর বললেন—তোমার একটি পুত্র জন্মে সুখ ও দুঃখের কারণ হবে।

কিছুদিন পরে রাজার একটি পুত্র হল। রাণীর আনন্দের সীমা নেই। সংসারের প্রতি রাজা ও রাণীর মোহ বাড়তে লাগল। এসব দেখে রাজার অন্যান্য পত্নীগণ করতে লাগল ঈর্ষা এবং একদিন গোপনে 'গরং দদুঃ কুমারায়'—বালককে বিষপ্রদান করে মেরে ফেলল।

চারদিকে শোকের ছায়া এল নেমে। কোলাহল পূর্ণ রাজপ্রাসাদ। রাণী কৃত দ্যুতি বিধাতাকে নিন্দা করতে লাগলেন।

সকলকে শোকগ্রস্ত দেখে ঋষি অঙ্গিরা নারদের সাথে সেখানে হলেন উপস্থিত। তারপর বললেন—হে রাজেন্দ্র, তুমি যার জন্য শোক করছ সেই শিশু তোমার কেউ নয়। ওর সাথে পূর্বজন্মে কিংবা পরজন্মে তোমার কোন সম্বন্ধ ছিল না বা থাকবে না। কালের চক্রান্তে জীব জীবন মৃত্যুর বশীভূত হচ্ছে। যেমন স্রোতের বেগে বালুকারাশি মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয় ঠিক তেমনি। তুমি আমি আমরা ও চারদিকের ভূতগণ যেমন বর্তমানে আছি, সেইরূপ ভবিষ্যতে থাকব। জীবের বিনাশ নাই। শরীর অনিত্য। জীব নিত্য। অতএব শোক করিও না।

এ কথা শুনে চিত্রকেতু তাদের সবিশেষ পরিচয় নিলেন। ঋষি বললেন—পূর্বে আমি তোমাদের গৃহে আগমন করে তোমাকে পুত্র প্রদান করেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে পরম জ্ঞান দান করার। কিন্তু সন্তানের প্রতি মোহ তোমাকে আজও শিক্ষা দিতে পারে নি।

চিত্রকেতু অঙ্গিরার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তখন দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃতপুত্রের সূক্ষ্ম দেহ আকর্ষণ করে সর্ব্বজনসমক্ষে সেই জীবাত্মাকে প্রদর্শন করালেন। জীবাত্মা কিন্তু তার পিতামাতাকে চিনতে পারলেন না। জীব বলল—

হে দেবর্ষি, স্বীয় কর্মফলে আমি দেব, পশু পাখী ও মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ

জন্ম করছি। এঁরা কোন জন্মে আমার পিতা মাতা ছিলেন তা আমি বুঝতে পারি না

অনেকজন্ম ঘুরতে ঘুরতে সকলে আত্মীয় ও স্বজন কে ভুলে যায়। এজন্মে আমি যেমন এদের পুত্র ছিলাম, তেমনি অপর জন্মে হয়ত এদের শত্রুও ছিলাম। অতএব দুঃখ করার কিছুই নেই। জীব পণ্যসামগ্রীর মত। সর্বদা নানাবিধ যোনিতে হাত ফেরি হচ্ছে। আজ যে পুত্র কাল তাকে আবার পিতা হতে দেখা যায়। আবার আজ যে প্রভু আগামী দিনে সে নিঃসন্দেহে ভৃত্য হতে পারে। তাই মৃত্যুর পর পাঞ্চভৌতিক দেহমুক্ত জীবের কারও প্রতি কোনও মমত্যবুদ্ধিই সম্ভবপর নহে।

এবং যোনিগতো জীবঃ সঃ নিত্যো নিরহংকৃতঃ।
যাবদ্ যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ॥ ৬।১৬।৮

একথা বলে রাজপুত্রের জীবাত্মা অন্তর্ধান করলে রাজা রাণী শান্ত হলেন। চেতনা লাভ করলেন চিত্রকেতু। তারপর নতুন বিদ্যা গ্রহণ করলেন। সাতদিন নারদের কাছে জ্ঞান লাভ করে অতঃপর সেই বিদ্যার ফলে চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করেন। তারপর বিষ্ণুপ্রদত্ত সুন্দর এক বিমানে চড়ে আকাশপথে ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন মহাদেবকে। তখন মহাদেব স্বীয় ক্রোড়ে পার্বতীকে স্থাপন করে রেখেছিলেন। এ দৃশ্য দেখে চিত্রকেতু অবজ্ঞাভরে উচ্চ হাস্য করেন এবং নির্লজ্জ সাধারণ মানুষ বলে নিন্দাবান বর্ষনে বদ্ধ পরিকর হন।

দেবী পার্বতী কিন্তু চিত্রকেতুকে ক্ষমা করলেন না। অভিশাপ দিলেন—

অতঃ পাপীয়সীং যোনমাসুরীং যাহি দুর্মতে।
যথেহ ভুয়ো মহতাং ন কর্ত্তা পুত্র ! কিল্বিষম্ ॥ ৬।১৭।১৫

—রে দুর্টবুদ্ধি পুত্র ! তুই পাপিষ্ঠ অসুর যোনিতে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর। তবেই তোর চৈতন্য হবে। চিরদিনের মত মহত্তের অবমাননা পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথে এগিয়ে আসতে পারবি।

দেবীর অভিশাপ বাক্য বজ্রধ্বনির মত কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র চিত্রকেতু পার্বতীকে প্রণাম করে বললেন—হে মাতঃ, এ আমার কৃত কর্মেরই ফল।

অশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ঐ চিত্রকেতুই দানবকুল আশ্রয় করে ত্বষ্টার যজ্ঞীয় অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৃত্রাসুর নামে পরিচিত হন, পূর্বসংস্কারবশতঃ তাঁর হরিভক্তি জন্মেছিল।

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● হিরণ্যকশিপুর কাহিনী ●

হরিনাম মোক্ষপদ জানিবে কেবল।
হরি বিনা নাহি হয় জীবের মঙ্গল॥
মিত্ররূপে নাহি পায় ভজ শত্রু রূপে।
হিরণ্যকশিপু যথা পেয়েছিল তাকে॥

পরীক্ষিত শুকদেবকে বললেন—ভগবান্ সর্বজীবের বন্ধু। তিনি আমাদের পরম সুহৃৎ। তবে কেন দেবতাদের বেশী ভালবাসেন তিনি? ইন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য অসুরদের কেন বধ করলেন?

শুকদেব উত্তর দিলেন—নিন্দাস্তুতি, মান অপমান, 'আমি আমার' এই অভিমান এই দেহের মধ্যেই নিবন্ধ। আত্মাতে কোন ভেদ জ্ঞান নাই। দেহ অভিমানী যারা, তারা যেমন কর্ম করে তেমন ফল পায়। শ্রীহরি সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের অতীত। তিনি আদি অন্তরহিত, চিৎ এবং অচিদাত্মক জগৎ থেকে ভিন্ন। জীবের কর্ম অনুসারে (সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সময়) অনুগ্রহ এবং (রজ ও তমগুণ বৃদ্ধির সময়) নিগ্রহ ভোগ করে থাকে।

ভগবান দ্বেষাদি রহিত হয়েও কেন দৈত্যগণকে বধ করেছিলেন—এ বিষয়ে একটি ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি নারদ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বলেছিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেও মুক্তিলাভ করেছিলেন দেখে যুধিষ্ঠির নারদকে প্রশ্ন করেছিলেন—দমঘোষপুত্র শিশুপাল বাল্যকাল থেকেই গোবিন্দের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। বিষ্ণুর প্রতি কটু বাক্য বলেও তার জিহ্বায় কুষ্ঠ হল না। "শ্বিত্রোন জাতো জিহ্বায়াং"। এর কারণ কি?

নারদ তখন বললেন—নিন্দা করেও ভগবানের কথা মনে করলে নানাবিধ কল্যাণ হয়ে থাকে। নিরন্তর শত্রুতা, ভক্তি, ভয়, স্নেহ অথবা কাম—যেকোন ভাবের দ্বারা তাঁকে স্মরণ করলেই মানুষের সাথে ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাছাড়া শত্রুভাব দ্বারা মানুষের যত সহজ তন্ময়তা লাভ হয়, ভক্তি দ্বারা সেইরূপ সহজ হয় না।

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময় তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তি যোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ। ৭।১।২৬

সেই জন্য কৃষ্ণবিদ্বেষী হয়েও অহরহ তাঁকে স্মরণ করে শিশুপাল কৃষ্ণকে পেয়েছে।

যেমন গোপীগণ প্রেমের দ্বারা, ভয়হেতু কংস, স্নেহহেতু পাণ্ডবগণ এবং ভক্তির জন্য আমরা তাঁকে পেয়েছি।

> গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
> সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৭।১।৩০

তাই জ্ঞান, কর্ম, নাম গ্রহণ, ভয়, দ্বেষ, স্নেহ, কাম, ভক্তি প্রভৃতি যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবেশিত করলে মনুষ্য জন্ম সফল হবে। যুধিষ্ঠিরের মাসতুতো ভাই শিশুপাল ও দন্তবক্র—এরা দুইজনেই ভগবানের পার্ষদ ছিলেন। এরা ব্রহ্মশাপে বৈকুণ্ঠভ্রষ্ট হন।

যুধিষ্ঠির এদের সবিশেষ কাহিনী জানতে চাইলে নারদ বলতে আরম্ভ করলেন—ব্রহ্মার পুত্র চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারজন ঋষি ত্রিভুবন বিচরণ করতে করতে একদিন বিষ্ণুলোকে এসে হলেন উপস্থিত। এ মরীচি প্রভৃতি ঋষিদের অগ্রজ হলেও দেখতে ছিলেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষীয় বালকের ন্যায় উলঙ্গ। তারা বৈকুণ্ঠে যেতে চাইলে ভগবানের দ্বারপালদ্বয়—জয় ও বিজয় বাধাপ্রদান করেন। তখন চতুঃসন ক্রোধে তাদের অভিশাপ দেন—তোমরা পাপিষ্ঠ অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।

তারপর যখন তাঁরা বৈকুণ্ঠ থেকে অধঃপতিত হতেছিলেন, তখন ঋষিগণ কৃপা করে বললেন যে তিনজন্ম পরে তাঁরা পুনরায় বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে পারবেন।

এই জয়বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই ভাই হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

যুধিষ্ঠির তখন হিরণ্যকশিপুর জীবন কাহিনী শুনতে চাইলেন।

হিরণ্যাক্ষ ছিলেন অতীব অত্যাচারী। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বরাহ মূর্তিধারী ভগবানের হাতে তার মৃত্যু হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হিরণ্যকশিপু মন্দর পর্বতের উপত্যকায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কঠোর তপস্যায় মন দেন। সেই তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নেমে আসেন। বললেন—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি অভিলষিত বস্তু প্রদান করব। তুমি কি চাও বল। এই বলে তার মস্তকে কমণ্ডলুর জল সিঞ্চন করলেন। তখন ভক্তি সহকারে হিরণ্যকশিপু বর চাইলেন—দেব, গন্ধর্ব, অসুর, নর বা পশু, ভূমিতে বা আকাশে যেন কেউ আমাকে বধ করতে না পারে।

ব্রহ্মা বললেন—তথাস্তু।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান দৈত্যরাজ স্বর্গ জয় করে নিলেন। ইন্দ্রের প্রাসাদে বাস করে সর্বদা সুরাপানে মত্ত থেকে দেবতাদের দিয়ে পাদ সংবাহন করাতে লাগলেন।

দেবতারা তখন উপায় না দেখে ভগবান বিষ্ণুর শরনাপন্ন হলেন।

আর বিষ্ণু তখন মেঘমন্দ্র অভয়বাণী দিয়ে দেবতাদের নিশ্চিন্ত করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● প্রহ্লাদ চরিত্র ●

বিষ্ণুভক্ত পুত্র যদি [illegible] আসে।
সেই কুল উদ্ধার হয় তাহার পরশে ॥
অতএব সাধন বলে প্রহ্লাদের মত।
মুক্ত কর বংশ তুমি হরি ভজে সত ॥

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চারটি ছেলে। সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ কনিষ্ঠ, গুণে শ্রেষ্ঠ এবং মহাজনের ভক্ত ছিলেন। তিনি বিপদে উদ্বিগ্ন হতেন না। বিষয়ে আশয়ে ছিল না আসক্তি। সবসময় ভগবানের চিন্তা করতেন।

এখন প্রহ্লাদের পড়াশোনার ভার কার হাতে দেওয়া যাবে? ভাবছেন সম্রাট হিরণ্যকশিপু। স্থির হল—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শণ্ড ও অমর্ক নামে দু'টি পুত্র আছে। এদের হাতেই ওকে তুলে দেওয়া হবে।

শিক্ষকদ্বয় অন্যান্য অসুরবালকের সাথে প্রহ্লাদকে দণ্ডনীতি বিষয়ক শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিন্তু সেই শিক্ষায় প্রহ্লাদের রুচি নেই।

কিছুদিন পরে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন—বলত বাবা, তুমি কি পড়াশোনা শিখেছ?

পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট প্রহ্লাদ বললেন—অহংবুদ্ধি দ্বারা মানুষ সর্বদা উদ্বিগ্ন হয়। এটা হচ্ছে আত্মার অধঃপতন। এই অধঃপতন থেকে মুক্তি পেতে হলে শ্রীহরির শরণ নেওয়াকেই আমি উত্তম বলে জেনেছি।

বিনামেঘে বজ্রপাত হলেও হিরণ্যকশিপু এতখানি অবাক হতেন না। পরম স্নেহাপদ পুত্র তাঁর পরম শত্রুকে ভজনা করার কথা বলছে। ভাবলেন—ছদ্মবেশী কোন বৈষ্ণব এসব কথা বোধ হয় ছেলেকে শিখিয়েছে। হিরণ্যকশিপু শিক্ষকদের সাবধান করে দিলেন, প্রহ্লাদের মাথায় এসব বুদ্ধি কেউ যেন না ঢোকায়। পুনরায় গুরুগৃহে প্রেরণ করলেন তাকে।

ভীত সন্ত্রস্ত গুরুদ্বয় বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন প্রহ্লাদকে—হে কুলনন্দন, কে তোমাকে এই হরিকথা শিখিয়েছে তুমি দয়া করে আমাদেরকে বলে রাজরোষ থেকে বাঁচাও বাবা।

প্রহ্লাদ বললেন—হরিভক্তি কারও কাছ থেকে শিখিনি। হরির ইচ্ছাতেই আমি এই জ্ঞান লাভ করেছি।

একথা শুনে শিক্ষকদ্বয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে প্রসন্ন করার মানসে প্রহ্লাদকে শাসন করতে লাগলেন।

দিন অতিবাহিত হতে লাগল। শিক্ষকদ্বয় সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারটি

নীতি শিক্ষা দিয়ে প্রহ্লাদকে তার মাতা কয়াধুর কাছে নিয়ে এলেন। তারপর গেলেন সম্রাটের কাছে।

প্রহ্লাদ ভক্তিভরে প্রণাম করলেন পিতাকে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুগৃহে যা শিখেছ তা আমাকে কিছু বল।

প্রহ্লাদ যে কথাগুলো বললেন তা বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় কথা। সে কথা শুনলে কঠিন হৃদয়ও নির্মল হয়ে যাবে। জীবনের শোক তার সব দূরে যাবে।

প্রহ্লাদ বললেন—

'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৭।৫।২৩
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥' ৭।৫।২৪

শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পূজা, বন্দনা, দাসত্বভাব, সখ্যভাব ও আত্মনিবেদন—এই ন'টি লক্ষণযুক্ত যে ভক্তি, বিষ্ণুতে তা অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শুনে 'রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ'—ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর অধর কম্পিত হতে লাগল। পিতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে শণ্ড ও অমর্কের দোষে পুত্র এইরূপ শিক্ষালাভ করেছে মনে করে তাঁদেরকে যথোচিত তিরস্কার করলেন।

শিক্ষকেরা বিনীতভাবে জানালেন—এই শিক্ষা আমরা প্রহ্লাদকে দিইনি। অপর কেউও দেননি। বালকের এই বুদ্ধি পূর্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ হয়েছে। অতএব হে রাজন্, ক্রোধ সংবরণ করুন।

প্রহ্লাদ তখনও পিতার কোলে, বলে উঠলেন—না পিতা, এঁরা আমাকে এই শিক্ষা দেন নি। যে জীব নিজে বদ্ধ সে কীভাবে কৃষ্ণে মতি হওয়ার শিক্ষা দেবে? বিষয় বাসনাশূন্য মহতের পায়ের ধূলো না পেলে শ্রীহরিতে মতি হয় না বাবা।

এই কথা শুনে দৈত্যরাজ পুত্রকে সবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং আদেশ দিলেন জহ্লাদকে—এই বালক বধার্হ। এখুনি একে দূরে নিয়ে গিয়ে বধ কর। এ আমার পরম শত্রু। এ শ্রীহরির সাধক। পাঁচ বছর বয়সে যে বালক পিতার শত্রু হয়ে উঠে তাকে দূষিত অঙ্গের মত কেটে ফেলে দেওয়া উচিৎ।

'পরোঽপথ্যং হিতকৃদ যথৌষধং স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ।
ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জ্জনাৎ ॥' ৭।৫।৩৭

শত্রু যদি তিক্ত ওষুধের মত হিতকারী হয় তা হলে তাকে পুত্রবৎ পালন করা উচিৎ। আর পুত্র যদি অহিতকারী হয়, তাহলে সেই পুত্র রোগসদৃশ—সমূলে উৎপাটনীয়।

এই হিরণ্যকশিপুই একদিন ভাইয়ের মৃত্যুতে আত্মশিক্ষা দিয়ে মাতা দিতির শোক দূর করেছিলেন আর আজ প্রহ্লাদকে হত্যা করার আদেশ দিচ্ছেন। হিরণ্যকশিপু মূর্খ নন, তিনি শ্রীহরির পার্ষদ, অতুল জ্ঞানেশ্বর।

অসুরগণ প্রহ্লাদকে শূলে চড়াতে নিয়ে গেল। তবু তিনি প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন না। একটি কথাও বলছেন না। হরিপ্রেমে নির্ভীক বালক ভূমির উপর বসেছিলেন। ভক্ত যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন তখন তার ভাব এমনই হয়। তখন তার দেহজ্ঞান থাকে না।

হিরণ্যকশিপু শুনলেন যে শূলবিদ্ধ হয়েও প্রহ্লাদের মৃত্যু হয়নি, তখন নানা উপায় অবলম্বন করতে লাগলেন। পাগলা হাতীর পায়ের নীচে ফেলে দেওয়া হল প্রহ্লাদকে। হাতী তখন শুঁড়ে করে তাকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল নিজের পিঠে। এরপর ছেড়ে দেওয়া হল বিষধর সাপ; প্রহ্লাদের হরিণাম শুনে তারা ফনা তুলে নাচতে লাগল।

হরিভক্তি আর ভক্তের এমনই গুণ এতই শক্তি। হরিনামের গুণে সাপও হিংসা ভুলে যায়।

তারপর পাহাড়ের চূড়া থেকে শিশুকে ফেলে দিয়েও বধ করা গেল না। বিষ মাখানো অন্ন খেয়েও মরলেন না। যেন অমৃত খেয়ে তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। শ্রীহরির অমোঘ করুণায় প্রহ্লাদ সব বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হলে সমুদ্রদেবতা তাঁকে তুলে দিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু মনে মনে চিন্তা করলেন—

এই বালক অপরিমিত প্রভাব সম্পন্ন, সর্বপ্রকার ভয়রহিত ও অমর। অতএব নিশ্চয়ই এর সাথে বিরোধের ফলে আমার মৃত্যু হবে। অন্য প্রকারে আমার মৃত্যু হবে না।

শণ্ড ও অমর্ক তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী বীর। প্রহ্লাদ দুধের শিশু। ও আপনার কিছু করতে পারবে না। ওকে আমাদের দিন। আরো কিছুদিন চেষ্টা করে দেখি ওকে মানুষ করতে পারি কিনা।

প্রহ্লাদ আবার শণ্ড ও অমর্কের শিক্ষাধীনে রইলেন। তাঁরা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন প্রহ্লাদের সঙ্গীরা এসে ঘিরে বসত তাঁর কাছে। তারা সবাই চায় প্রহ্লাদের কাছে ধর্মকথা শুনতে। তারা ভগবানের গল্প শুনতে চায়। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! পঞ্চমবর্ষীয় বালককে চারদিকে বেষ্টিত করে শত শত সমবয়স্ক দৈত-বালক বসেছে। ক্ষুদ্রকায় গুরু আর ক্ষুদ্রকায় শিষ্যগণ। ছোট হাতখানি নেড়ে প্রহ্লাদ বৃহৎ মানবধর্ম ব্যাখ্যা করছেন আর মহাকৌতুহলে গুরুর মুখপদ্মের পানে চেয়ে শিষ্যগণ চিত্রের মত বসে শুনছেন অমিয় মধুর বাণী। গুহশিক্ষকের বাসভূমি আজ বালক ঋষির তপোবন। জড় বিদ্যা আজ সেখানে স্তব্ধ—ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত। দৈত্য-গুরুর গৃহে হরিগুণ গানের ভাগবত আলোচনা।

প্রহ্লাদ বলছেন—

'কৌমারে আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥' ৭।৬।১

—মনুষ্যজন্ম দুর্লভ এবং অনিত্য। এ জন্মেই শ্রীহরিকে পাওয়া যায়। তাই জ্ঞানীব্যক্তি যৌবন ও বার্ধক্যের অপেক্ষা না রেখে কৌমার কাল থেকেই ধর্ম আচরণ

করবেন। মানুষের আয়ু একশ বছর। তার অর্ধেক কেটে যায় ঘুমে। তাছাড়া রোগ ব্যাধিতো আছেই। তারপর নানাকাজে কেটে যায় কিছুদিন, অতএব হে দৈত্য-বালকগণ, ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হওয়া উচিৎ নয়। কর্মের ফলে দুঃখ আর দুঃখ থেকেই অশান্তি ও বিভিন্ন যোনিতে গমন করে মানুষ। তারপর যৌবনে বিষয়াসক্তি ঘোরতর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যৌবন আসবার পূর্বে ভাগবতধর্ম অভ্যাস করে বিষয়াসক্তি দূর করা উচিৎ। যে অর্থলিপ্সার জন্য মানুষ প্রাণ পর্যন্ত উপেক্ষা করে, সেই অর্থলিপ্সা আসবার আগেই কৌমার বয়সে ভাগবত আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। সংসারী হওয়ার আগেই ভগবৎ ভজন করলে সংসারের মোহ যাবে কেটে। জানলে ভাই, ভগবানকে সন্তুষ্ট করা কঠিন কাজ নয়। কারণ তিনি আমাদের আপনার থেকেও আপন। আমাদের অন্তরের অন্তরতম। তিনি প্রিয়তম—পূর্ণতম-প্রাণঘন পরমপুরুষ ভগবান। আমি এসব নারদের কাছে জেনেছি। আমি তখন মাতৃগর্ভে। ভগবান নারদকে এসব কথা বলেছিলেন। আমি সব শুনে ফেলেছি।

দৈত্যবালকরা বলল—কখন কিভাবে শুনেছিল তা আমাদের বল।

প্রহ্লাদ বললেন—অনেকদিন আগে পিতা যুদ্ধে অজেয় হওয়ার আশায় মন্দর পর্বতে তপস্যা করতে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতা কয়াধুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন আপন আলয়ে। মা রোদন করছিলেন ভয়ে। আমি তখন মাতৃগর্ভে ছিলাম। আকাশপথে যাওয়ার সময় মায়ের কান্না শুনে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হন সেই পথে। তিনি এসে বাধা দেন ইন্দ্রকে এবং আমার মুক্তির কথা বললেন। দেবরাজ তখন বললেন—এই রমণীর গর্ভে দেবশত্রু রয়েছে। অতএব এই নারীর প্রসবকাল পর্যন্ত একে অবরুদ্ধ করে রাখব। যথাসময়ে পুত্র প্রসব করলে সেই সদ্যোজাতকে বধ করে তবে হিরণ্যকশিপুর পত্নীকে মুক্তি দেব। দেবর্ষি তখন বলেছিলেন—এর গর্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ ও ভগবানের ভক্ত। অতএব মহা প্রভাব সম্পন্ন সাক্ষাৎ পরম-বৈষ্ণব এই শিশুকে বধ করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না।

পরম সত্যবাদী নারদের কথাগুলি বিশ্বাস করে ভগবানের প্রিয় ভক্ত ঐ গর্ভে রয়েছেন জেনে মাতাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করে নারদের নিকট পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে চলে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তারপর নারদ মাতাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং আশ্বাস দেন যতদিন না আমার পিতা ফিরে আসেন ততদিন তিনি সেখানে নিশ্চিন্তে অবস্থান করবেন।

পরম বৈষ্ণবকে গর্ভে ধারণ করেছেন বলে কয়াধুর আজ এত সম্মান—এটা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।

তারপর দেবর্ষি আমার মাকে উপদেশ দিতে লাগলেন।

—কিন্তু তোমার মা কেন তোমার মত ধর্ম পরায়ণ হল না? তিনিইতো দেবর্ষির মুখে সমস্ত ধর্ম কথা শুনেছিলেন।

—দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় এবং স্ত্রী জাতি বলে আমার মাতার সে জ্ঞান বিলুপ্ত

হয়েছিল। কিন্তু পূর্বজন্ম সংস্কারহেতু আমি ধর্মকথা সহজে ভুলি নি। পূর্বজন্মের সুকৃতি এবং সংস্কার যার আছে সে সহজেই ধর্মকথা গ্রহণ করতে পারে।

যার পূর্ব জন্মের সংস্কার নেই তার হৃদয় ঊষর। সেখানে শস্য ছড়ালেও গাছ জন্মে না। সেইরূপ বহু লোক ধর্মকথা শুনলেও সবাই কিন্তু মনে রাখতে পারে না। আবার স্ত্রীলোকদেরও সহজে চৈতন্য হয় না। আবার অখণ্ড হরিভক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান স্ত্রীলোকেরা সহজে গ্রহণ করতে পারে না, যদি পারত তাহলে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই লোপ পেয়ে যেত। কারণ মাতৃ মূর্ত্তিতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত অভিব্যক্তি।

প্রহ্লাদ দেবর্ষির নিকট থেকে ধর্মকথা শ্রবণের বৃত্তান্ত বলে দৈত্যবালকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করে পুনরায় তাদেরকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন।

গুরু সেবা, তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি, সাধুভক্তদের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁর কথায় শ্রদ্ধা, তাঁর গুণ ও মহিমার কীর্ত্তন, তাঁর চরণ কমল ধ্যান, তাঁর বিগ্রহের দর্শন ও পূজা করবে। তিনি সর্বভূতে আছেন জেনে সকলকে ভালবাসবে। দান-তপস্যা যার ব্রত এ সকলের দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন বটে কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রীত হন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে। ভক্তি ছাড়া অন্য সব বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীগোবিন্দে ঐকান্তিক ভক্তি ও সকলের মধ্যে তাঁকে দর্শন—এই হল মানবজীবনের চরম কাম্য। আমাদের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—এই ছয় প্রকার বিকার ভাবের অধীন। কিন্তু আত্মা এই সমস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত। অতএব দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকা উচিৎ নয়।

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি বুদ্ধির বৃত্তি। যিনি ঐ সকল বৃত্তি অনুভব করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ জীবই বুদ্ধি প্রভৃতির অধিপতি অথচ বুদ্ধি থেকে বিভিন্ন।

পরমেশ্বরের উপর রতি না হলে সেই আত্মস্বরূপ ভগবানকে জানতে পারা যায় না।

প্রহ্লাদের এই কথা শুনে দৈত্যবালকেরা হয়ে উঠল পরম বিষ্ণুভক্ত। এতদিন একজন বালক (সমগ্র দৈত্যপুরীতে) হরিভক্ত ছিল—এখন শত শত বালক হয়ে উঠল রাজদ্রোহী। শণ্ড ও অমর্ক ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বিপ্লবী বালকদের উচ্ছ্বসিত পদঝংকারে কাঁপতে লাগল দৈত্যপুরী।

শঙ্কিত চিত্তে গুরুদ্বয় প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন দৈত্যরাজের কাছে। দৈত্যরাজ বুঝতে পারলেন, এই পুত্র কেবলমাত্র রাজদ্রোহী নয়, সে রাজদ্রোহিতা প্রচার করে হিরণ্যকশিপুর সর্বনাশ সাধন করতে মনুৎসুক।

ক্রোধে গর্জন করতে করতে বলতে লাগলেন—

> হে দুর্বিনীত মন্দাত্মন্, কুলভেদকরাধম্।
> স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্ ॥ ৭।৮।৬
> ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ
> তস্য মেঽভীতবন্মূঢ়। শাসনং কিংবলোঽত্যগাঃ ॥ ৭।৮।৭

—রে উদ্ধত, রে মন্দবুদ্ধি, কুলনাশক, অধম, তুই আমার শাসনের বহির্ভূত ও অবিনীত, অতএব তোকে আজ যমালয়ে প্রেরণ করব। দেবতা দানব সর্বদা আমার ভয়ে অস্থির। তুই কার বলে আমার কথা অমান্য করিস ?

প্রহ্লাদ এক্ষণে উত্তর না দিয়ে থাকতে পারলেন ন। বললেন—বাবা, যাঁর বলে আমি বলীয়ান সেই ভগবান বিষ্ণু কেবল আমার নয়, আপনারও বলের আশ্রয় এবং অপর যত বলবান আছেন তাদের সকলেরই মধ্যে তিনি আছেন। তাদের সকলের বল তিনি। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জঙ্গম সকলেই তাঁর বশীভূত। তিনিই পরমেশ্বর।

'ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্ ! স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্।
পরেঽবরেঽসী স্থিরজঙ্গমা যে ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥' ৭।৮।৮

সমস্ত তেজ, সমস্ত সাহস বলবুদ্ধি সব কিছুর পরম আশ্রয় তিনি। আপনি সেই বিষ্ণুর প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ করুন। শ্রীহরি সর্বনিয়ন্তা, মহাকাল অমিতবিক্রমশালী তিনিই দেহশক্তি, মনঃশক্তি ও ধৈর্যশক্তি। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ তাঁর শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, তিনিই স্বীয় শক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করে থাকেন। তিনি অনন্ত শক্তির আধার। অহরহঃ পরিবর্তনশীল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রীহরিই একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি স্বীয় শক্তিবলে সমগ্র বিশ্বকে অনন্ত সত্তায় বিলীন করে যুগোচিত যোগনিন্দ্রা অবলম্বন করে থাকেন। আপনার শক্তি তাঁর কাছে তুচ্ছ, অতি নগন্য। তাই আপনার পায়ে ধরে মিনতি করে বলছি পিতা, আপনি নিজের ঐ আসুরিক ভাব ত্যাগ করুন। আপনি মনকে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত করুন। উম্মার্গগামী মনের মত শত্রু আর কিছুই নাই। মনের ঐ সমপ্রতিষ্ঠাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজো।

হে রাজন্ ! আপনি ছয়টি ইন্দ্রিয়রূপ দস্যুকে জয় না করেই নিজে দশদিক জয় করেছেন বলে মনে করেন। এটা আপনার পক্ষে পরম ভুল। যিনি নিজেকে জয় করেছেন, সর্বভুতে যার সমদৃষ্টি, সেই সাধুরাই প্রকৃতপক্ষে জয়ী। শত্রুরা সকলে তাদের কাছে মিত্র হয়ে যায়।

প্রহ্লাদের এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ অথচ অসীম প্রীতিযুক্ত কথাগুলি হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে স্থান পেল না, পুত্রের সমগ্র উপদেশ তার অবমাননা বলে গ্রহণ করলেন তিনি। ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে বলতে লাগলেন—ওরে হতভাগা, তুই বুঝি নেহাৎ মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়েছিস। তা না হলে তুই আমাকে দিবি উপদেশ ? এ জগতে ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে তা আমি। আর কেউ নাই। আর কেউ নাই—নাই—নাই !!!

—পিতা ! ওকথা বলবেন না। মহা অপরাধ হবে।

—তবে কোথায় সেই ভগবান—কোথায় তোর ঈশ্বর ?

—তিনি সর্বত্র। সর্বশক্তিমান। সর্বত্র বিরাজ করছেন। জলে, স্থলে, শশী তারকায়, তপনে-আকাশে-বাতাসে পাহাড়-পর্বত—গিরি-গুহা-বনে সকল স্থানে তিনি পরিব্যাপ্ত।

—তাহলে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? 'ক্বাসৌ যদি স সর্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ?' এই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর দেখা যাচ্ছে না কেন ?

প্রহ্লাদ বললেন—"দৃশ্যতে।" ঐতো আমি দেখতে পাচ্ছি।

তখন দৈত্যরাজ বললেন—তাহলে থামটা আমি এক্ষুনি ভাঙ্গব। তারপর তোর ভগবানকে যদি দেখতে না পাই, এই খড়্গ দিয়ে তোর মাথাটাকে কেটে ফেলব। ডাক তোর শ্রীহরিকে—এইবার ডাক অপদার্থ তোর ভগবানকে আসুক তোর ভগবান—আমাকে দেখা দিয়ে প্রমাণ করুক তার অস্তিত্ব।

একথা বলেই সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে দৃঢ় মুষ্টির দ্বারা স্তম্ভটিকে আঘাত করলেন হিরণ্যকশিপু। সহসা স্তম্ভের ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর গর্জনধ্বনি উত্থিত হল। ত্রিভুবন বিদীর্ণ করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আসন টলিয়ে দিয়ে নেমে আসতে লাগল সেই ধ্বনি। চতুর্দিকে মুহূর্তের পর মুহূর্ত গর্জনধ্বনির প্রতিধ্বনিতে সৃষ্টি হল এক ভয়াবহ ধ্বংসোন্মুখ পরিবেশ।

চকিত ও হতবম্ব হয়ে দৈত্যরাজ চারদিকে তাকাতে লাগলেন। পৃথিবীর গতির মত বন বন করে ঘুরতে লাগল তার মাথা। চোখদুটো তার ধোঁয়ায় যেন ভরে গেল। সেই স্তম্ভ বিদীর্ণ করে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীহরি নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্বক হলেন আবির্ভূত। তারপর দন্ত বিস্তার করে প্রবল বেগে হিরণ্যকশিপুকে করলেন আক্রমণ। কোথায় গেল দৈত্যরাজের খড়্গ। কোথায় গেল তার বলবীর্য্য! গড়ুর পাখী যেমন সাপকে অনায়াসে ধরে বশ করে, সেইরূপ নৃসিংহদেব ভীত চকিত হিরণ্যকশিপুকে ধরে ফেললেন। তারপর—মাটিতে কিংবা আকাশে নয়, নিজের উরুর উপর রেখে নিজের তীক্ষ্ন নখর জালের দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ডকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। সেই সময় হিরণ্যকশিপুর সহস্র সহস্র অনুচর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেলেন নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করতে। আর অমনি নৃসিংহদেব সবাইকে বধ করে ভীষণ ভাবে প্রলয়ংকর গর্জনে আকাশ পৃথিবী কাঁপাতে লাগলেন। সে কী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। সে কী প্রলয়ংকর গর্জন! সেই মূর্ত্তি তখন সহস্র সহস্র দৈত্যের রুধিরে অবলিপ্ত। তার বিস্ফারিত চক্ষু থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। ক্রোধে কেশরজাল উর্ধমুখ হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ঘন ঘন গর্জনের সাথে ঘন ঘন গভীর নিঃশ্বাস ধ্বনি চারদিককে করে তুলছে কম্পিত। দুরন্ত নানাগর্জনে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত।

নৃসিংহদেবের ঐ ভয়ংকর রূপ দেখে কম্পিত হলেন দেবগণও। ব্রহ্মাও তাঁর সামনে আসতে পারছেন না। অগত্যা দূর থেকে দেবগণ, ঋষিগণ, যক্ষ ও বিদ্যাধরেরা স্তব করতে আরম্ভ করলেন। লক্ষ্মীদেবীকে দেবতাগণ প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও সেইরূপ দেখে হলেন শঙ্কিত।

যেখানে দেবগণ যেতে অক্ষম, স্বয়ং লক্ষ্মীও সন্ত্রস্তা, সেখানে ভক্ত প্রহ্লাদ অবলীলাক্রমে গমন করলেন—ভক্তের কী বিরাট মহিমা—কী দারুণ সম্মান! ভক্তের

কী প্রচণ্ড সাহস! ভক্তবৎসল শ্রীহরির কী অপূর্ব মাহাত্ম! ব্রহ্মার নির্দেশে প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে ভূমিষ্ট প্রণাম জানিয়ে স্তব করতে লাগলেন।

তখন স্বীয় পাদমূলে পতিত প্রহ্লাদকে দেখে দয়ার উদ্রেক হল নৃসিংহদেবের। তাঁকে মাটি থেকে তুলে অভয় করপদ্ম তার মাথায় রাখলেন। প্রহ্লাদের শরীর পুলকিত হল। হৃদয় হল প্রেমার্দ্র। স্তবে মগ্ন হলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ।

'প্রায়েণ দেব! মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ মৌনং চরন্তি
বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষে একোনান্যং
ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥' ৭।৯।৪৪

—হে দেব, মুনিগণ প্রায়ই নিজ নিজ মুক্তি কামনা করে নির্জনে মৌনাবলম্বন করে তপস্যা করেন, অপরের মুক্তির জন্য তাঁরা যত্নশীল নন। অতএব সংসারে ভ্রমণশীল এই জীবগণের আপনি ভিন্ন অপর আশ্রয় কাকেও দেখতে পাচ্ছি না। এই দীনহীন বদ্ধ জীবগণকে পরিত্যাগ করে আমি একা মুক্ত হতে ইচ্ছা করি না। আপনি জীবগণের প্রতি সহায় হোন।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ! পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভব
স্ত্রিযুগোঽথ সঃ ত্বম্।

হে মহাপুরুষ! আপনি যুগে যুগে যুগানুরূপ ধর্মরক্ষা করে থাকেন। কলিকালে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকেন। অতএব তিন যুগে আবির্ভূত হন বলে আপনি ত্রিযুগ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি প্রসন্ন হোন। 'ময়ি প্রসাদ।' প্রহ্লাদের এই স্তবস্তুতি শুনে নৃসিংহদেব প্রীত হয়ে বললেন—

প্রহ্লাদ, ভদ্র, ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম॥ ৭।৯।৫২

—হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমার দর্শন লাভ কখনো ব্যর্থ হয় না। কারণ আমি "নৃনাং কামপূরঃ"—আমি নিখিল জনগণের কামনা পূর্ণ করে থাকি।

পরমকৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ তখন নতজানু হয়ে নৃসিংহদেবকে বললেন—হে ভগবান্, আমি স্বভাবতঃই কামনা বাসনায় আসক্ত। অতএব আপনি আমাকে বর প্রদানের দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন না। আমি সেই কামসঙ্গকে ভয় করি। আমি মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছায় আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত আর আপনিও আমার প্রয়োজনশূন্য প্রভু। অতএব এই স্থলে আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ রাজা ও ভৃত্যের মত স্বার্থমূলক নয়। আমাকে মুক্তি দিন।

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যা সক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥ ৭।১০।২
অহং ত্বকাম স্তদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যন পাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥' ৭।১০।৬

প্রহ্লাদের এই আত্মনিবেদনে নৃসিংহদেব প্রীত হয়ে বললেন—প্রহ্লাদ "ভোগেন পুন্যাং কুশলেন পাপং কলেবরং কালজবেন হিত্বা"। তুমি ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং পুণ্য কর্মের দ্বারা পাপক্ষয় করে অবশেষে কালক্রমে দেহত্যাগপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হবে।

প্রহ্লাদ তখন বিনয়ের সাথে পিতার জন্য নৃসিংহদেবের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন।

নৃসিংহদেব আর কি করবেন। ভক্তের প্রার্থনা শুনতেই হবে তাকে। তিনি বললেন—প্রহ্লাদ, তোমার মত বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করায় তোমার পিতৃকুল হল ধন্য। আর আমার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হয়ে সে উত্তম লোকে গমন করল।

'মদঙ্গস্পর্শনেনোঙ্গ! লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ।'

তখন ব্রহ্মা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নৃসিংহদেবের স্তব করলে তিনি ব্রহ্মাকে বললেন—মৈবং বিভো, অসুরাণাস্তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভবঃ। হে পদ্মযোনি, তুমি অসুরদের কোনদিন এইরূপ বর দান করো না।

অনন্তর নৃসিংহদেব সেখান থেকে অন্তর্হিত হলে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের সহযোগে ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতি করলেন।

যিনি একাগ্র চিত্তে প্রহ্লাদের চরিত্রকাহিনী পাঠ কিংবা শ্রবণ করেন তিনি সর্ব-প্রকার ভয়রহিত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করবেন।

এই কাহিনী শুনে পরীক্ষিত ভাবছেন—তিনি তো মাতৃগর্ভেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করে-ছিলেন। অতএব তিনিও অনায়াসে পরমগতি লাভ করতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

● ধর্মাধর্ম বিচার ●

হরিপদ চিন্তা করি হরিপাশে রবে।
সংসার যাতনা আর ভুঞ্জিতে না হবে॥

● একদা দেবর্ষিকে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—ব্রহ্মচারীর করণীয় কি?

এর উত্তরে দেবর্ষি বললেন—ব্রহ্মচারী নারীবিষয়ক আলোচনা পরিত্যাগ করবেন। ব্রহ্মচারীরা কোনদিন নারীর দ্বারা গাত্র মর্দন, কেশ প্রসাধন করাবেন না। কারণ নারী অগ্নিতুল্য ও পুরুষ ঘৃত সদৃশ। সেইজন্য কোন মানুষ নির্জন স্থানে কোন কন্যার সাথে অবস্থান করবেন না। এমনকি যুবতী মাতা, তরুণী ভগিনী বা কন্যার সাথে নির্জনে একাসনে উপবেশন করা উচিৎ নয়। কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ বলবান হয়ে জ্ঞানী-দেরও মনকে আকর্ষণ করে বিকার ঘটাতে পারে।

মাত্রা স্বসা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি। ৯।১৯।১৭

● সন্ন্যাসী চরিত্র কিরূপ ?

সন্ন্যাসী 'নাভিনন্দ্যেৎ ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্'—নিশ্চিত মৃত্যু অথবা অনিশ্চিত দেহ—এদের কোনটিরও দিকে লক্ষ্য দেবেন না। বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক পরিত্যাগ করবেন। 'বাদাবাদান্ ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন সংশ্রয়েৎ'। সন্ন্যাসী বহুগ্রন্থ পাঠ করবেন না। শাস্ত্র ব্যাখ্যার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করবেন না। জীবিকার জন্য নেবেন না কোন বৃত্তি।

● গৃহী কিভাবে মোক্ষলাভ করবেন ?

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি বাসুদেবে সর্বকর্ম সমর্পন করে জ্ঞানী ও ভক্তদের সেবা করবেন। গৃহী হৃদয়ে বৈরাগ্য নিয়ে সামাজিক আচরণে আসক্তি দেখাবেন। সর্বসময়ে ত্যাগ করবেন অহংবুদ্ধি। প্রয়োজনের বেশী ধনাকাঙ্খা করবেন না। তাছাড়া—

কৃমিবিষ্ঠাভস্মনিষ্ঠা ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্বতদীয় রতিভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ ॥৭।১৪।১৩

কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যার পরিণতি—এইরূপ দেহের জন্য ভার্য্যার প্রতি গৃহস্থের আসক্তি ত্যাগ করে পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই গৃহস্থের একমাত্র কর্তব্য।

একটা সামান্য কৃমি স্বজাতীয় স্ত্রীদেহ উপভোগ করে যে সুখ পায়, একজন রাজা অপূর্ব সুন্দরীর দেহ ভোগ করে তার চেয়ে একটুও বেশী সুখ পায় না। এইখানে একটি কৃমিকীট ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মানুষ উভয়েই সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাই সাধকের পক্ষে আদিম প্রবৃত্তি ত্যাগ করা একান্ত কাম্য।

● প্রতিমা পূজা প্রচলনের কারণ কি ?

দেবর্ষি বললেন—সর্বভূতগুহাশায়ী পরমেশ্বরকে মানুষ দেখতে পায় না বলে তারা পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অথচ শ্রীহরি অন্তর্য্যামীরূপে সব মানুষের হৃদয়ে বর্তমান আছেন। তাই সকল মানুষকেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'। মানুষ তা করে না বলে ত্রেতাদিযুগে জ্ঞানিগণ শ্রীহরির পূজার নিমিত্ত প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন। প্রতি মানুষের ভেতর ব্রহ্মদর্শন হলে প্রতিমায় হরিপূজার কোন প্রয়োজন হয় না।

● তাহলে প্রতিমাপূজার কি কোন প্রয়োজন নেই ?

শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাপূজা করলে প্রতিমা মানুষকে অভীষ্ট ফলদান করে থাকেন। শুদ্ধ ভক্তিসহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমাপূজা করলে সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী রূপে আবির্ভূতা হন আত্মনিবেদিত ভক্তের সম্মুখে। তবে যারা জীবের প্রতি হিংসা বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের প্রতিমাপূজা নিরর্থক। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ অথবা দেবগণের উদ্দেশ্যে পূজা গৃহস্থদের করণীয় আবার সেই সমস্ত কার্যের দ্রব্যাদি জ্ঞানভক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করলে অনন্তফল লাভ হয়।

দেব অথবা পিতৃকার্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো দরকার। তাই বলে বেশী নয়। দেবকার্য্যে দুজন ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ ভোজন প্রশস্ত। অথবা উভয় কার্য্যে একজন হলেন শাস্ত্রসম্মত। তবে সেই ব্রাহ্মণ হবেন ব্রহ্মজ্ঞ এবং সংসার বিষয়ে নিরাসক্ত।

মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। বহুব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করলে বহু ধনক্ষয় হবে। শ্রাদ্ধকর্ম যথাবিধি সম্পন্ন হবে না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের সকলকে সুষ্ঠু সমাদর করাও যাবে না। অতএব ধনবান হলেও শ্রাদ্ধে বাহুল্য নিষিদ্ধ।

● যোগীদের মধ্যে কারা নিন্দনীয়?

যারা গৃহ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক ধনার্থ কামাদিতে আসক্ত হন, সেই সব সাধুরা যেন বমি করে পুনরায় সেই বমির দ্রব্য কুড়িয়ে খাচ্ছে বলে মনে হয়। এরা অতীব নিন্দনীয়। ত্যাগের চিহ্ন ধারণ করে সন্ন্যাসী যদি মনে মনে কামিনী কাঞ্চনের সেবা করেন তাহলে তাদের ইহলোক পরলোক—এই দুই লোকই বিনষ্ট হয়।

● সর্বধর্মের সার কি?

ভক্তিযোগই সার। গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসী সবাই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান ক'রে মুক্তি লাভ করতে পারে যদি তাদের মনে ভক্তি থাকে, ভক্তি থাকলে সকল আশ্রমেই মনুষ্য-জীবন সার্থক হতে পারে।

"গৃহেষ্বপ্যস্য গতিং যায়াৎ রাজন্, মদ্ভক্তিভাক্ নরঃ"।

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে গৃহে বাস করলেও মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।

এই বিশ্বাস যুধিষ্ঠিরের মনে দৃঢ় করার জন্য নারদ নিজ পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন।

গন্ধর্ব জন্মে আমি সর্বদা রমণীদের প্রতি আসক্ত হয়ে নৃত্যগীতে সময় অতিবাহিত করতাম। একদিন দেবগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে প্রজাপতিগণ শ্রীহরির গুণগান করার জন্য গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করলেন। আমি তখন রমণীগণে পরিবৃত হয়ে গান করতে করতে দেবসভামধ্যে করলাম প্রবেশ। দেবগণের প্রতি আমার এই অবজ্ঞা দেখে প্রজাপতিগণ আমাকে অভিশাপ দিলেন 'যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ' —সৌন্দর্য্য ভ্রষ্ট হয়ে শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও।

এই অভিশাপের ফলে আমি এক শূদ্রের গৃহে দাসীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করি। সেখানে থেকে ভগবদ্ভক্তগণের সেবা করে ও তাঁদের মুখের হরিনাম শ্রবণ করে পরে ব্রহ্মার পুত্র নারদ হয়ে জন্মগ্রহণ করি। এই কাহিনী আমি ব্যাসদেবকেও বলেছিলাম। অতএব ভক্তির দ্বারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণস্মরণ, পূজন ও নামকীর্তন করলে গৃহস্থ লোকও মুক্তিলাভ করতে পারে।

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● গজেন্দ্র মোক্ষণ ●

বিপদে সম্পদে কর শ্রীহরির স্তব।
করুণা অবশ্য পাবে নাহি অসম্ভব ॥
গজপতির ডাকে যদি আসে নারায়ণ।
মানুষের ডাকে তাঁর ভুল হবে না কখন ॥

গজেন্দ্র মোক্ষণ মানে গজরাজের মুক্তি। ঘটনাটি বিচিত্র।

পুরাকালে হিমালয়ের কিছুদূরে ত্রিকুট নামে একটি পাহাড় ছিল। তার তিনটি চূড়া। একটি সোনার, একটি রুপোর আর একটি লোহার। ঐ পাহাড়ের উপত্যকায় ছিল এক মনোরম সরোবর। সেখানে দেবকন্যারা করতেন জলক্রীড়া। একদিন এক গজপতি সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বনভূমি আলোড়িত করে ঐ সরোবরে স্নান করতে লাগল। তখন সহসা একটি বলবান্ কুমীর এসে ভীষন বেগে ঐ গজেন্দ্রের পা কামড়ে ধরে টানতে লাগল। যথাসাধ্য চেষ্টা করল নিজেকে মুক্ত করতে। সহায়তা করল সঙ্গীরাও। কিন্তু কুমীরের কামড় কিছুতেই শিথিল হল না। চলল দীর্ঘদিন ব্যাপী এই লড়াই।

গজেন্দ্র ভাবতে লাগল, এতগুলি হাতী এবং আমার নিজের এত শক্তি তথাপি কেন কুমীরের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছি না। নিশ্চয়ই এই শত্রুকে ভগবান পাঠিয়েছেন। কাজেই অগতির গতি সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাগত হওয়া ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন পথ নেই। এই স্থির করে গজরাজ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ভগবানের স্তব করতে লাগল।

যে অনন্তশক্তি বহুরূপধারী সৃষ্টি কর্তা ভবভয়হারী।
মহাঘোরে পতিত হয়ে আমি তোমায় প্রণাম করি ॥
তুমি জগতের মহাউপাদান জগজনমনোহারী।
তুমি অপ্রমেয় পরমাত্মা পরমেশ্বর ত্রিপুরারি ॥
তোমার চরণে শরণ নিয়েছি দেখা দাও প্রভু দেখা দাও।
করুণা ভিখারী আমি করুণা নয়নে তুমি চাও ॥

গজরাজের এই স্তবস্তুতি শুনে সর্বদেবময় গরুড় বাহন শ্রীহরি স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। গরুড়ের উপর শংখচক্র গদাপদ্মধারী নারায়ণকে দেখে গজপতি তার শুঁড়ে করে একটি পদ্ম নিবেদন করে অতি কষ্টে দু চারটি শব্দ উচ্চারণ করল—হে নারায়ণ, হে ভগবান, হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন তোমায় প্রণাম করি।

শ্রীভগবান তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গরুড় থেকে অবতরণ করলেন। জলে নেমে তিনি

সুদর্শন চক্র দিয়ে কুমীরের মুখ দিলেন চৌচির করে। তাতে গজেন্দ্র রক্ষা পেলো।

এই কুমীর ছিল এক অভিশপ্ত গন্ধর্ব। দেবলমুনির শাপে তার কুমীরের জন্ম হয়েছিল। শ্রীহরির স্পর্শে তার অভিশাপ দূর হল। শ্রীহরিকে প্রণাম করে গন্ধর্ব-লোকে চলে গেল গন্ধর্ব।

আর গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইনি পাণ্ড্য দেশে রাজত্ব করতেন। রাজা ছিলেন খুবই ভক্তিমান। মলয় পর্বতের এক আশ্রমে মৌনী হয়ে তিনি তপস্যা করছিলেন। এমন সময় অগস্ত্য মুনি অনেক শিষ্য নিয়ে হঠাৎ সেখানে হন হাজির। রাজা তখন মৌনী বলে অতিথিদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আপ্যায়ণ করতে পারলেন না। তাতে অগস্ত্য মুনি গেলেন রেগে। অতিথিদের যারা অসম্মান করল তাদের বুদ্ধি খুবই জড়। তিনি অভিশাপ দিলেন, এই মোটা বুদ্ধি রাজা 'হাতী' হোক।

অগস্ত্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এটিকে দৈব ইচ্ছা মনে করে অভিশাপ মেনে নিলেন। রাজা হলেন হাতীজন্ম প্রাপ্ত। কিন্তু শ্রীহরির আরাধনার জন্য তাঁর পূর্ব জন্মের কথা সব মনে ছিল। করুণাময় শ্রীহরি এইভাবে গজরাজকে মুক্ত করে নিজের পার্ষদ করে নিলেন।

'গজেন্দ্রঃ ভগবৎস্পর্শাৎ বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ,
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতাবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥' ৮।৪।৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

● সমুদ্র মন্থন ●

জীবের মঙ্গল তরে সাধু সঁপে প্রাণ।
তখনই তাহাদের দেখা দেন ভগবান ॥
বিপদভঞ্জন তিনি দয়াময় হরি।
তাঁরে ডেকে এসো সবে সংসার অবতরি ॥

অতি প্রাচীনকালে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে সংগ্রাম প্রায় লেগেই থাকত। দেবতারা বারবার তাই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হতেন। কখনো বা অসুরদের সাথে সন্ধি করার জন্য হয়ে উঠতেন তৎপর।

একদিন শ্রীহরি বললেন—দেবতাগণ, তোমাদের ভয় নেই। অতি শীঘ্রই তোমরা অসুরদের সাথে সমুদ্র মন্থন করতে প্রবৃত্ত হও। ঐ সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত উদ্ভব হবে এবং সেই অমৃত পান করে তোমরা অজেয় ও অমর হতে পারবে। অসুরগণ তখন আর তোমাদের বধ করতে পারবে না। শ্রীহরি আরও বলেছিলেন, সমুদ্র মন্থন কালে যে বিষ উত্থিত হবে তাতেও তোমাদের ভীত হবার কোন কারণ নেই। ঐ বিষে অসুরগণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দেবগণ শ্রীহরির উপদেশ গ্রহণ করে দৈত্যরাজ বলির সাথে সাক্ষাৎ করে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। সেই সঙ্গে সমুদ্র মন্থনের যুক্তি গ্রহণ পূর্বক দেব ও অসুরগণ মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড করে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করার জন্য করতে লাগলেন আয়োজন।

কিন্তু এতবড় মন্দর পর্বত কার উপর ভর করে থাকবে। আর রজ্জুই বা হবে কিসের ?

শ্রীভগবান বললেন—সে চিন্তা তোমাদের নেই। বাসুকি নাগ হবে রজ্জু আর আমার এক অংশ কূর্ম-শরীর ধারণ করে ঐ পর্বতকে রক্ষা করবে।

আরম্ভ হল সমুদ্র মন্থন। একপাশে দেবতাগণ আর অন্যদিকে অসুর। দেবতারা বুদ্ধি করে বাসুকিনাগের লেজের দিকে ধরেছেন আর অসুররা ধরেছে মুখের দিকে। শ্রীভগবান কূর্ম শরীর ধারণ করে মন্দর পর্বতকে তুলে ধরলেন।

প্রচণ্ড কোলাহল উত্থিত হল সেই স্থলে। ক্ষীর সমুদ্রে তুফান উঠতে লাগল। প্রচণ্ড বেগে চলছে মন্থন। বাসুকিনাগ প্রবল ঝাঁকুনির চাপে বিষ উদ্গীরণ করতে লাগল। সেই তীব্র হলাহল সেখানকার পরিবেশকে করতে লাগল বিষাক্ত। দেবতা ও অসুরগণ হয়ে পড়লেন মুহ্যমান। হায় হায় সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয়। অগত্যা কয়েক জন দেবতা দ্রুত বেগে গমন করলেন মহাদেবের কাছে। কতশত স্তবস্তুতি করে বলতে লাগলেন—

দেবদেব! মহাদেব! ভূতাত্মন্! ভূতভাবন!
ত্রাহি তাঃ শরণাপন্নান্ ত্রৈলোক্য দহণাৎ বিষাৎ।

হে দেবাদিদেব মহাদেব, হে ভূতাত্মন্, হে ভূতপালক—এই তীব্র বিষ ত্রিলোক দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা আপনার শরণাপন্ন, আপনি এই বিষ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

তখন ভবানীপতি মহাদেব জীবগণের প্রতি দয়াবশতঃ ভবানীকে লক্ষ্য করে বললেন —"তাস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে"। আমি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য এই বিষভক্ষন করছি ভবানী, তা না হলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে—বলেই সেই বিষ পান করে তিনি কণ্ঠে ধারণ করে রাখলেন।

এই বিষপান করে মহাদেব কিছুক্ষণ হয়ে পড়লেন অচেতন। তখন তারা মা আর সইতে পারলেন না। মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করে আপন পুণ্য পীযূষস্তন্য দ্বারা তাঁকে করালেন চেতন।

বিষের প্রভাবে মহাদেবের কণ্ঠ হল নীলবর্ণ। নিখিল জনগণের জন্যে মহাদেবের এই আত্মোৎসর্গ উপলব্ধি করে শ্রীশুকদেব বলেছেন—

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষ স্যাখিলাত্মনঃ॥ ৮।৭।৪৪

সাধুস্বভাব ব্যক্তিগণ সাধারণ জীবের দুঃখে প্রায়ই ক্লেশভোগ করে থাকেন। অপরের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ক্লেশ ভোগ করাই সর্বাত্মা পরমপুরুষের পরম আরাধনা।

এই বিষপান করার সময় মহাদেবের হাত থেকে যে বিন্দুমাত্র বিষ ক্ষরিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গিয়েছিল তা পান করে বৃশ্চিক, সর্প, মাকড়সা প্রভৃতি জীবগণ হয়ে উঠল বিষধর। কোন কোন বৃক্ষলতাও সেই বিষের সংস্পর্শে এসে বিষাক্ত হয়ে গেল।

এই সমুদ্র মন্থনের ফলে ক্রমে ক্রমে উত্থিত হল সুরভী নামে গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, ঐরাবত প্রভৃতি চারটি দন্তবিশিষ্ট হাতী, কৌস্তুভ নামক পদ্মরাগমণি, পারিজাত নামক কল্পবৃক্ষ আর সবশেষে উঠলেন সর্বসৌন্দর্যময়ী লক্ষ্মী দেবী।

লক্ষ্মীদেবী এখন কোথায় যাবেন—কাকে আশ্রয় করে থাকবেন? তিনি দেখলেন—কোথাও তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধ জয় নেই—যেমন দুর্বাসা; কোথাও উচ্চপদ আছে কিন্তু কাম জয় নেই—যেমন ব্রহ্মা, চন্দ্র ইত্যাদি। কোথাও জ্ঞান আছে কিন্তু অনাশক্তি নেই—যেমন শুক্রাচার্য, ধর্ম আছে দয়া নেই—যেমন পরশুরাম, দীর্ঘায়ুঃ আছে কিন্তু শীল ও মঙ্গল নেই—যেমন মার্কণ্ডেয়, আবার সনকাদি সর্বগুণ সম্পন্ন হলেও তাঁরা কখনো বিরহ করেন না। কিন্তু বিষ্ণু হলেন সর্বগুণের অধিকারী—তাঁর মতন আর কেউ নেই। তিনিই শ্রেষ্ঠ।

একথা ভেবেই লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের উদ্দেশ্যে দ্রুত গমন করতে লাগলেন।

তারপর সুরা নামে এক কন্যা উত্থিত হল। অসুরেরা গ্রহণ করল তাকে। অবশেষে অমৃতকুম্ভ নিয়ে আবির্ভূত হলেন ধন্বন্তরী। অসুরেরা জোর করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। যে অমৃতের জন্য এত পরিশ্রম—সেই অমৃত চলে গেল অসুরদের হাতে দেবতারা নিমেষেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। অসুরেরা অমৃতকুম্ভ নিয়ে আনন্দে আত্মহারা। চলল তাদের প্রচণ্ড নৃত্যগীত—অদ্ভুত উল্লাস। তবে কে আগে অমৃত খাবে তা নিয়ে ক্রমে আরম্ভ হল বিবাদ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল তর্ক বিতর্ক আর বাগবিতণ্ডা।

দেবগণ অমৃত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেখে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীহরি মোহিনীরূপ ধারণ করে স্বীয় রূপ সৌন্দর্যের দ্বারা দৈত্যগণের কামোদ্দীপক চিত্ত বিভ্রম সৃষ্টি করতে লাগলেন। শ্রীহরি বললেন—এই অমৃত শুধু তোমাদের একার নয়, এতে দেবতাদেরও সমান অংশ আছে। আমি সবাইকে সমভাবে বণ্টন করব।

মোহাচ্ছন্ন অসুররা নির্দ্বিধায় মেনে নিল সেই কথা। কাম—এমনই বস্তু। এর মোহে মানুষ মুক্তি—স্বর্গ সব ভুলে যায়।

অতঃপর সেই সুন্দরী নারী দৈত্যগণের অনুমতি ক্রমে সেই অমৃতভাণ্ড নিয়ে দুই পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট দেব ও অসুরগণের মধ্যে করতে লাগলেন অমৃতবণ্টন। মিষ্ট কথা বলে অসুরদের ভুলিয়ে রেখে দেবতাগণের সারিতে সমস্ত অমৃত বিলিয়ে দিলেন সেই রূপসী। তারপর অসামান্য রূপের ঝিলিকে অসুরদের চক্ষু আর মনকে ধাঁধিয়ে দিয়ে দ্রুত পলায়ন করতে হলেন উদ্যত।

অসুররা চক্ষু বিস্ফারিত করে সেই রমনীর রূপের দিকেই চেয়েই রইল নির্নিমেষে। অমৃত নিয়ে যে পালিয়ে গেল—এজ্ঞান তাদের নেই। অবশেষে যখন ধ্যানভঙ্গ হল

তখন সবশেষ। অমৃতকুম্ভ নাগালের বাইরে চলে গেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটতে লাগল অসুররা। বলতে লাগল—

ধর্ ধর্ ধর্ বেটিকে কুম্ভ নিয়ে যায়।
অমৃত খাওয়া হলনারে, মরব এখন হায়॥

নিমেষেই সেই মোহিনী অন্তর্হিত হলেন। অসুরদলে বিরাট কোলাহল সৃষ্টি হল। শ্রীহরি মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করে গরুড়ে আরোহণ পূর্বক স্বধামে প্রস্থান করলেন।

সক্রোধে অসুররাজ বলি সদলবলে আক্রমণ করলেন দেবতাদের। পুনরায় চলল দেবাসুর সংগ্রাম। ঘোর সংগ্রাম। এবার কিন্তু অসুররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

অসুরদের মধ্যে অতিশয় চতুর ছিল রাহু। সে দেবতাদের বেশ ধারণ করে দেবসারিতে বসে অমৃত পান করেছিল। সূর্য ও চন্দ্র তাকে চিনতে পেরে তার মাথা দিয়েছিল কেটে। কিন্তু অমৃত যখন খেয়েছে তখন সে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই রাহুর মৃত্যু হল না। বরং তার মাথাটা সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়ে এল তাদের গ্রাস করতে। কিন্তু তা মাত্র কিছুক্ষণের জন্য।

বিশ্বাত্মা ভগবান যে মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করে অসুরদিগকে মোহিত করে অমৃতপান করিয়েছিলেন দেবতাগণকে, গঙ্গাধর মহাদেব দেবাদিদেব ও যোগীশ্বর হয়েও শ্রীহরির সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করে পার্বতীর পাশে উপবিষ্ট থেকেও স্থির থাকতে পারেন নাই। কামাতুর হয়ে সেই মোহিনীর পশ্চাদ পশ্চাদ ধাবিত হয়েছিলেন। তাঁর স্খলিত অমোঘবীর্য্য যেখানে যেখানে পতিত হয়েছিল সেই সেই স্থান রূপ্র ও স্বর্ণের ভূমি হল।

ভগবানের বৈষ্ণবীমায়ায় মোহিত হয়েছেন বুঝতে পেরে মহাদেব সেই মোহ থেকে নিবৃত্ত হলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

● বলি রাজার দর্প চূর্ণ ●

বলি রাজার দর্প ছিল শুনুন গুনীজন।
সেই দর্প খণ্ডিলেন প্রভু নারায়ণ॥
অহংকারের পতন আছে পাপের আছে ক্ষয়।
হরিনাম করে তাই পাপ কর লয়॥

দৈত্যরাজ বলি শুক্রাচার্য্য প্রমুখ ভৃগুবংশীয়গণের প্রযত্নে সুস্থ হয়ে কৃতজ্ঞতা বশতঃ শুক্রাচার্য্যের শিশ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তখন বলি স্বর্গরাজ্য জয় করতে ইচ্ছা করলে শুক্রাচার্য্য তাকে বিশ্বজিত নামক এক যজ্ঞের আয়োজন করতে বলেন। সম্পন্ন হল যজ্ঞ। যজ্ঞাগ্নি থেকে একটি সোনার রথ, কতিপয় অশ্ব, ধ্বজা, শর ও দিব্য কবচ

উত্থিত হল। বলির পিতামহ প্রহ্লাদ তাকে একছড়া অম্লান পুষ্পমাল্য প্রদান করলেন। শুক্রাচার্য্যও তাকে দিলেন একটি শুভ শংখ।

তারপর দৈত্যরাজ স্বীয় সৈন্যসমূহ দ্বারা ইন্দ্রপুরীকে চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করে শুক্রাচার্য্য প্রদত্ত মহাশব্দকারী শংখবাদন করলে দেব রমনীদের ভীতি উৎপন্ন হল।

ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হলে দেবগুরু বৃহস্পতি তাকে বললেন—বলির এই প্রভাব স্বয়ং শ্রীহরি প্রতিহত করবেন। শ্রীহরি ছাড়া ব্রহ্মতেজে তেজস্বী বলিকে কেউ জয় করতে সক্ষম হবেন না।

প্রবল পরাক্রান্ত বলি বিনা বাধায় স্বর্গ অধিকার করে মহানন্দে শত অশ্বমেধ আরম্ভ করলেন। গর্বে অহংকারে তার যেন মাটিতে পা পড়ে না।

এদিকে দেবগণের এই ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখে স্বামী কশ্যপের আদেশানুসারে অদিতি শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন। তারপর ত্রয়োদশ দিবস ব্যাপী 'পয়োব্রত' নামক এক ব্রত আচরণ করার পর শংখচক্র গদাপদ্মধারী তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। [বারদিন দুগ্ধ পান করে ব্রতাচরণ, হরির আরাধনা, হোম, পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, ত্রিসন্ধ্যাস্নান, ভূতলে শয়ন, প্রাণি হিংসা ত্যাগ, অসৎ আলাপ ত্যাগ, ভোজ্যবস্তু বর্জ্জন]

ভগবান বললেন—কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠিত হয়ে আমি স্বীয় অংশে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব এবং তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করব। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

তারপর একদা ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কশ্যপের অন্ধকার কুটিরকে আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত করে মাতা অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্ম গ্রহণ করলেন তিনি। যথাকালে কশ্যপ স্বীয় পুত্রের জাতকর্মাদি ও উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করালেন। ব্রহ্মচারী ক্ষুদ্রাকায় ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বলিরাজার যজ্ঞালয়ে হলেন উপস্থিত।

মহাবলী বলি তখন আপন শক্তিতে বিমোহিত। তথাপি যথারীতি আদর আপ্যায়ন করে বলিরাজা বললেন—হে পূজ্যতম! গো, সুবর্ণ অশ্ব, হস্তী, অন্ন, পানীয় আপনার যা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন, আমি সবই আপনাকে দান করব।

বামনদেব বললেন—এ আপনার মত রাজার উপযুক্ত কথা। আপনার পূর্ব পুরুষ প্রহ্লাদ ছিলেন মহান দাতা। আপনার পিতা বিরোচণও দেবগণকে নিজের পরম আয়ু দান করেছিলেন। পূর্বপুরুষদের মত আপনিও মহা ধার্মিক। আমি বিশেষ কিছু চাই না। শুধুমাত্র আমার এই পায়ের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি।

সমগ্র সভা নিস্তব্ধ। অগ্নিতে আহূতিদান থেমে গেছে। শোনা যাচ্ছে না মন্ত্রের ধ্বনি। শত শত দৈত্যদানব ও ঋষি তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টিতে। বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা সমগ্র যজ্ঞস্থলীতে।

যজ্ঞেশ্বর যে যজ্ঞস্থলীতে এসেছেন তা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ছাড়া আর কেউ

বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না।

বলি বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি নিতান্তই বালক। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর। আমার কাছে একি চাইলেন! অন্ততঃ আপনার ভরণ পোষনের উপযোগী ভূমি প্রার্থনা করুন। আমি দানবীর, আমার সমকক্ষ আর কে আছে!

বামনদেব তার উত্তরে বললেন—না রাজা, আমার অধিক ভূমির প্রয়োজন নাই। আমি যা প্রার্থনা করছি তাই দান করে আপনার কথা রক্ষা করুন।

সভার মধ্যে নেমে এসেছে এক মহান আত্মকেন্দ্রিক মনের সুগভীর নিস্তব্ধতা। ঋত্বিক, দানব ও দানবরাজের অবচেতন মন বুঝতে পারছে—যজ্ঞেশ্বর এসেছেন। তাই ভাবতে ভাবতে আকুল হয়ে বলতে লাগলেন—

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মণ কিং করবাম তে।
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষাৎ মন্যে ত্বার্য্য! বপুর্ধরম্॥
অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ভবান্ আগতো গৃহান্।

—হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে নমস্কার। আপনার কোন মহৎকার্য্য আমাকে সম্পন্ন করতে হবে? আপনার আগমনে আমার পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হলেন। কুল পবিত্র হল। আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হল।

—হে ব্রাহ্মণ, আপনার পাদোদকের দ্বারা আমার পাপ হল বিনষ্ট। এবং সমগ্র পৃথিবী আপনার ক্ষুদ্র পদ বিন্যাসে হল পবিত্র।

এ কথা বলে মহাবলশালী দীর্ঘাকার দৈত্যরাজ তাঁর ইন্দ্র বিজয়ী হস্তের দ্বারা উত্তম আসনে সুখাসীন বামনদেবের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করে দিলেন এবং সেই পাদোদক নিজ মস্তকে করলেন ধারণ।

দৈত্যরাজ বলির কী অপূর্ব ব্রাহ্মণ ভক্তি! কী শ্রদ্ধা, কী অনন্য সাধারণ আত্ম-নিবেদন! তার স্বচ্ছ প্রাণের সাবলীল ভাষা বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত সহজ সরল উৎসারিত হচ্ছে। কিন্তু এই অসাধারণ গুণাবলীকে প্রচ্ছন্ন করে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করছিল বলির অহংকার দৃপ্ত মন—'যক্ষে দাস্যামি মোদিষ্যে'—আমার সমকক্ষ দানবীর আর কে আছে এবং 'ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী'—আমিই ঈশ্বর, আমি পুরুষাকারের বলে বলীয়ান ও সুখী এবং এই প্রচ্ছন্ন দম্ভ ও অহংকার শ্রীহরির দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারল না।

পুনরায় বললেন বলিরাজ—আপনি আরো কিছু কামনা করুন। সামান্য ভূমিতে আপনার প্রয়োজন কি?

অহংকার বিমূঢ়াত্মা দৈত্যরাজের এইরূপ দম্ভসূচক কথা শুনে বামনদেব বললেন—

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্বরদর্ষভাৎ।
এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্॥ ৮।১৯।২৭

—হে মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ! আমি জানি, আপনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি জানি, আপনি একজন প্রখ্যাত দানবীর এবং বিরাট পৌরুষপরায়ণ, আপনি

আমাকে অনেক কিছুই দান করতে পারেন কিন্তু তিনটি পা রাখার জায়গার চেয়ে একটুও বেশী স্থান আমার প্রয়োজন নাই। আমার ঈপ্সিত ভূমিতেই আমি কৃতার্থ হব। আমার প্রয়োজন মিটে গেলেই আমি সুখী হব।

বামনদেবের স্বার্থবুদ্ধি উদ্দীপ্ত করতে অসমর্থ হয়ে তখন দৈত্যরাজ হাসতে হাসতে ত্রিপাদভূমি দান করার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করলেন।

সভাস্থ সকলের মনে বিরাট কৌতূহল। চেয়ে আছেন নির্নিমেষে।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এতক্ষণ সব দেখছিলেন। এক্ষনে জলদমন্দ্র স্বরে সমস্ত সভা কম্পিত করে বললেন—

এষঃ বৈরেচনে! সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
কশ্যপাৎ অদিতের্জাতো দেবানাং কার্যসাধকঃ॥ ৮।১৯।৩০

ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ইমান্ লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ়! বর্তিষ্যসে কথম্॥ ৮।১৯।৩৩

—হে বিরোচণ পুত্র. এই বামনরূপী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু। মায়াবলে তোমার রাজ্য যশ বিদ্যা সহ অধিকার করবেন। বিশ্বব্যাপী এর দেহ। ত্রিপাদ রেখে ত্রিভূবন অধিকার করবেন। হে রাজা, বিষ্ণুকে সব দান করার পর তুমি কিরূপে জীবনধারণ করবে? যে দানের দাতার জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়— সেদানের মূল্য নেই।

বলিরাজা তখন বললেন—গুরুদেব, আপনি যে কথা বলছেন তা ঠিকই। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের বংশধর, দান করব বলে কথা দিয়েছি। এখন প্রাণ ভয়ে সে কথা ফিরিয়ে নিই কি করে? অসত্য থেকে বড় অধম আর নেই। দধীচ প্রভৃতি মুনিগণ নিজের জীবন দিয়ে পরের উপকার করে গেছেন।

এইকথা শুনে দৈত্যগুরু বললেন—সব দা সত্যকথা বলা উচিৎ কিন্তু অবস্থা বিশেষে মিথ্যা কথা বললে কোন দোষ হয় না। স্ত্রীলোককে বশীভূত করার সময়, পরিহাস কালে, বিবাহে, জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত, প্রাণ সংকটে, গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এবং কারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা হলে তার রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলা দোষের নয়।

স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসংকটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতম্॥ ৮।১৯।৪৩

তথাপি বলিরাজা আপনসত্য থেকে বিচ্যুত হলেন না। তিনি বামনদেবের অর্চনা করে জলগ্রহণ পূর্বক তাঁকে ভূমি দান করলেন।

দৈত্যগুরুও বিরক্ত হয়ে শিষ্যকে অভিশাপ দিলেন—'ত্বং অচিরাৎ ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ'— তুমি অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বামনদেবের ক্ষুদ্র শরীর বর্দ্ধিত হতে লাগল এবং তিনি একপদের দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয়পদের দ্বারা স্বর্গলোক, শরীরের দ্বারা আকাশমণ্ডল, বাহুর দ্বারা দিক সকল অধিকার করে ফেললেন। তারপর বিশ্বরূপ তাঁর তৃতীয় পদ। সত্যলোক পর্যন্ত বিস্তৃত করে বলিকে বললেন—হে অসুররাজ, তুমি আমাকে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। এক্ষণে তৃতীয়পদ রাখার স্থান করে দাও।

তখন বলি খুবই বিপন্নবোধ করলেন। তাঁর সারা শরীর ঘামতে লাগল কিংকর্তব্য-

বিমূঢ় হয়ে হতবাক্ হয়ে পড়লেন নিমেষে। অতঃপর ভগবানের ইঙ্গিতে সুনন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণ বরুণপাশের দ্বারা বলিরাজকে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে ফেলল।

অনন্তর দৈত্যরাজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন—আপনি দুইপদের দ্বারা আমার সর্বস্ব গ্রহণ করেছেন, এখন আপনার ঐ পরমপদ (তৃতীয় পদটি) আমার মস্তকে স্থাপন করুন। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।'

ইতিমধ্যে বলির পিতামহ প্রহ্লাদ এবং ব্রহ্মা এসে হলেন উপস্থিত। প্রহ্লাদ, বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি ও ব্রহ্মা—এরা সকলেই বলিকে পাশমুক্ত করে দিতে বামনদেবের নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন ভগবান বামনদেব প্রসন্ন হয়ে বললেন—গুরু শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েও এই সুব্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করে নাই সুতরাং একে আমি দেবদুর্লভস্থান প্রদান করব বলে স্থির করে রেখেছি। আমার আশ্রয়ে থেকে এই বলি সাবর্ণ মন্বন্তরে ইন্দ্র হবে। ঐ মন্বন্তর যতদিন না আসে ততদিন বলি বিশ্বকর্মা রচিত সুতললোকে বাস করুক। আমার কৃপাদৃষ্টির ফলে যারা এই সুতললোকে বাস করে তাদের মনঃপীড়া, দেহপীড়া, ক্লান্তি আলস্য কখনও আসে না। হে বলিরাজ! তুমি যাও সেই সুতললোকে। তোমার পিতামহ প্রহ্লাদ সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবেন। আমি গদাহস্তে নিয়ত তোমাদের রক্ষা করব।

তারপর বলিরাজকে বন্ধন মুক্ত করে দিলেন ভগবানের ভৃত্যগণ। তখন প্রহ্লাদ ও বলি উভয়েই সুতললোকের পথে পা দিলেন। পথ দেখিয়ে দিলেন শ্রীভগবান। সেই পথ অপরূপ চাকচিক্য মণ্ডিত। রূপকথার দেশের পথের মত।

এবার বামনদেব দৈত্যগুরুকে বলির যজ্ঞটিকে সম্পন্ন করতে দিলেন আদেশ। শুক্রাচার্য্য তা সম্পাদন করলেন।

অতঃপর বামনদেব বলিপরিত্যক্ত ত্রিভুবণের সাম্রাজ্য ইন্দ্রকে করলেন প্রদান।

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● দুর্ব্বাসার বিপর্য্যয় ●

ব্যাকুল হয়ে আর আত্মনিবেদন।
ভগবৎ করুণালাভের দুটি মহাধন॥
বিপন্ন অম্বরীষের কাতর আহ্বানে।
সুদর্শন চক্র দুর্ব্বাসা নিধনে॥
ব্যাকুল হয়ে ডাকো তাই কোথা নারায়ণ।
দেখা দাও দেখা দাও ওগো প্রাণধন॥

শুকদেব একটির পর একটি গল্প বলে চলছেন আর রাজা পরীক্ষিৎ আনন্দের সাথে তা শুনছেন।

পরমপুরুষের নাভিকমল থেকে জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার। তাঁর মানসপুত্র মরীচি। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বামনদেব—যাঁর কাহিনী এতক্ষণ বলছিলাম। এ'দেরই বংশে জন্মেছিলেন ভক্তরাজ অম্বরীষ। অম্বরীষের পিতা নাভাগ সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া দরকার। নাভাগ ছিলেন সত্যিকারের ভালমানুষ। লেখাপড়া নিয়ে গুরুগৃহে অনেক দিন কাটিয়ে যখন বাড়ীতে ফিরলেন তখন তাঁর ভাইয়েরা বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ করে নিয়েছে। তাঁর অংশে রেখেছে বৃদ্ধ পিতাকে। পিতার কাছে নাভাগ যখন গেলেন তখন পিতা বললেন - চিন্তা করো না। তোমাকে দুটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, দেশের রাজা যেখানে যজ্ঞ করছেন সেখানে গিয়ে ঐ দুটি মন্ত্র বললেই ঋষিরা তোমাকে খুব খাতির করবেন। তাই হোল। ঋষিরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞের কিছু দক্ষিণা ও বহু ধনরত্ন নাভাগকে দিলেন।

এই ধনরত্নগুলি প্রাপ্য রুদ্রদেবের। রুদ্রদেব বললেন—এসব আমার প্রাপ্য। যদি মানতে না চাও তো তোমার পিতাকেই মধ্যস্থ মানা হোক। পিতা সব শুনে রায় দিলেন রুদ্রদেবকে ফিরিয়ে দিতে। নাভাগ পিতার আদেশ মান্য করে রুদ্রদেবকে সমস্ত ধনরত্ন অর্পণ করলেন। এতে রুদ্রদেব খুশী হয়ে সব ফিরিয়ে দিলেন নাভাগকে। নাভাগের দিন ভালই কাটতে লাগল। তিনি এত ধনসম্পত্তি পেলেন যে অনেক রাজারই তা ছিল না। পিতার এই সম্পদ যথাকালে পেলেন পুত্র অম্বরীষ। কিন্তু বিষয়ে তাঁর ছিল না লোভ। শ্রীহরির পাদপদ্মে তাঁর মন ছিল অর্পিত।

তিনি তাঁরই পূজা অর্চনায় কাটাতেন বেশীর ভাগ সময়—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে॥ ৯।৪।১৮

—সেই ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মনকে অনুক্ষন শ্রীহরির পাদপদ্মে, বাক্যকে শ্রীহরির গুণাহবর্ণনে, করদ্বয়কে শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কার্যে এবং কর্ণদ্বয়কে ভগবান অচ্যুতের লীলাকথাশ্রবণে নিয়োজিত করেছিলেন আর চক্ষুদুটিকে মুকুন্দের মন্দির দর্শনে, ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গে ছাত্রসঙ্গমে, নাসারন্ধ্রকে ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত, চন্দনচর্চিত তুলসীর আঘ্রানে, জিহ্বাকে ভগবানে নিবেদিত অন্নপ্রসাদের আস্বাদনে, পদদ্বয়কে তীর্থভ্রমণে এবং নিজের মস্তককে হৃষীকেশের পাদবন্দনে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

অনুক্ষন হরিসেবায় ও হরিচিন্তনে নিমগ্ন রাজা অম্বরীষের পক্ষে রাজ্যশাসন ও বহিঃশত্রু থেকে রাজ্য রক্ষা কিরূপে সম্ভব হয়েছিল—এ বিষয়ে পরীক্ষিতের সন্দেহ হওয়ায় শুকদেব বলেছিলেন—অম্বরীষের একান্ত ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীহরি সুদর্শন চক্রকে তার রক্ষনে নিযুক্ত করেছিলেন।

একদিন অম্বরীষ ভক্তিপরায়না আপন মহিষীর সঙ্গে একবৎসর ব্যাপী দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করছেন। ব্রতের শেষ তিনদিন উপবাসী থেকে ব্রতপারনের জন্য কালিন্দী তীরে মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনাপূর্বক ব্রাহ্মণভোজনাদি সমাপন করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে পারণের উপক্রম করছেন, এমন সময় ঋষি দুর্বাসা এসে উপস্থিত।

অতিথি দুর্বাসাকে না খাইয়ে রাজা খেতে পারেন না। কিন্তু দুর্বাসা যমুনায়

স্নান করতে গিয়ে স্নান আহ্নিকাদি সেরে আসতে অনেক দেরী করে ফেলেছেন। ব্রত পারণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে রাজা আর কী করেন, ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে শ্রীহরিকে স্মরণ করে সামান্য জলপান দ্বারা ব্রত রক্ষা করলেন কিন্তু অন্নগ্রহণ করলেন না।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্বাসা হলেন উপস্থিত। রাজা জলপান করছেন শুনে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের মাথা থেকে একটা জটা উৎপাটিত করে তা দ্বারা সৃষ্টি করলেন কালাগ্নিতুল্য এক মারক অপদেবতা। তার নাম কৃত্যা। সেই কৃত্যাকে ব্রতনিষ্ঠ অম্বরীষের প্রতি প্রেরণ করলেন।

পৃথিবী কাঁপাতে কাঁপাতে কৃত্যাকে অগ্রসর হতে দেখে রাজা কিন্তু ভয় পেলেন না। তিনি প্রাণভরে ডাকতে লাগলেন ভবভয়হারী শ্রীগোবিন্দকে। সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রাণমন হরিতে ন্যস্ত করে বিভোর হয়ে গেলেন বিপদভঞ্জন শ্রীহরির চিন্তায়। যিনি ভয়ের ভয়—ভীষণের ভীষণ, তাঁর রূপ চিন্তা করে তুচ্ছ ভয়প্রদ মারকের সামনে ধ্যান-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিস্মিত হলেন দুর্বাসা। বিস্মিত মারক অপদেবতাও।

ক্ষুদ্রভয় অম্বরীষকে বিচলিত করতে পারল না। কিন্তু বৃহত্তম ভয় দুর্বাসাকে অভিভূত করে তুলল।

অম্বরীষের কাতর আহ্বানে শ্রীহরি ছুঁড়ে দিলেন সুদর্শন চক্র। সেই ভয়ঙ্কর কোটি সূর্যসম প্রদীপ্ত বিক্ষুব্ধা বৈষ্ণবী শক্তি সুদর্শন চক্র ঘুরতে ঘুরতে এসে নিমেষেই অপদেবতা মারককে বধ করল।

তারপর ভক্তের অনিষ্ট চিন্তাকারী-দুর্বাসাকে ধ্বংস করার জন্য ধাবিত হল তার দিকে। এ যেন সংকট মুহূর্তে ভগবানের কথা কিছুতেই মনে হল না ঋষি দুর্বাসার।

শ্রীহরির নাম স্মরণ করলে হয়ত তার এ বিপদ কেটে যেত কিন্তু হিতাহিত জ্ঞান্য-শূন্য দুর্বসা 'দদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণ পরীপ্সয়া'—প্রাণরক্ষার জন্যে চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন।

ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নিলেন সুমেরু পর্বতের গুহায়। কিন্তু 'যতোযতো ধাবতি তত্র তত্র সদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ"—যেখানেই পলায়ন করেন সেখানেই দুঃসহণীয় সুদর্শন চক্রকে দেখতে পেলেন।

আজ মহাশক্তিশালী সুদর্শনচক্র দুর্বাসার সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান, সমস্ত ব্রত-তপস্যা, সমস্ত আচার আচারণ নিস্ফল করে তাঁর জীবনে প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো তিনি মহাসংকটে পড়ে 'ত্রাহি-ত্রাহি' রবে ছুটছেন। শ্রীহরিচ সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আজ দুর্বাসাকে দগ্ধ করার জন্য উদ্যত।

অগত্যা ঋষি শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মার।

ব্রহ্মা বললেন—ঋষিবর, আপনাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে আমি অক্ষম। শ্রীহরির সুদর্শনকে রোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। শ্রীহরির কাছে আমি সামান্য

ও তুচ্ছ।

ব্যর্থ হয়ে ছুটে গেলেন কৈলাসাধিপতি শঙ্করের কাছে। দেবাদিদেব বললেন—এ ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে তুমি যদি এ নিমেষে শ্রীহরির শরণাপন্ন হও তাহলে তিনিই হয়ত তোমার একটা মঙ্গল বিধান করে দিতে পারেন। 'তমেব শরণং যাহি হরিস্তেশং বিধাস্যতি'।

শুকদেব লক্ষ্য করলেন, মহারাজ পরীক্ষিতের মুখ শুষ্ক হয়ে উঠেছে, তিনি ভয়চকিত নেত্রে শুকদেবের প্রতি চেয়ে আছেন—সামান্য একটু ভুলের জন্য ঋষি দুর্বাসা ভক্ত অম্বরীষের অবমাননা করে আজ বিষ্ণুরোষে ভস্মীভুত হতে চলেছেন। তবে শমীক ঋষিকে অপমান করে পরীক্ষিতের কি উপায় হবে? দুর্বাসার মত মুনিকে যদি সামান্য ভুলের জন্য দুর্বিষহ শাস্তি গ্রহণ করতে হয় তাহলে চিরাদন বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ অকারণে ভক্ত শমীকের অপমান করে কার শরণাপন্ন হবেন! ব্রহ্মর্ষি ও পরমহংস চূড়ামনি শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের মনের এই ভয়াকুল অবস্থা বুঝতে পেরে মনে মনে হেসে বললেন—

তারপর ঋষিবর পাগলের মত ছুটলেন বৈকুণ্ঠের উদ্দেশ্যে। ভয়কম্পিত কলেবরে শ্রীহরির পদমূলে নিপতিত হয়ে স্তুতি করতে লাগলেন ব্যাকুলতাভরা স্তব স্তুতি—

হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে সজ্জন বাঞ্ছিত প্রভু!
তুমি বিশ্বস্রষ্টা, জগন্নিবাস হে দয়াময়
ভক্তবৎসল কল্পতরু পতিতপাবন!
মহাপাপের বিপদসাগরে আমি আজ দিশেহারা।
আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি।
আজ আপনি আমাকে রক্ষা করুন।
হে দীনবন্ধু জগৎপতি! আমি আপনার
ভক্তবৎসলতা সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে
ভক্ত অম্বরীষের নিকট করেছি মহা অপরাধ।
আপনার অজানা কিছুই নেই। আপনার পা দুটো
ধরে ভিক্ষা চাইছি, প্রভু—আমাকে এই বিপদ
থেকে বাঁচান!

আর্ত ও শরণাগত দুর্বাসার এইরূপ আত্মনিবেদন শ্রবণ করে শ্রীহরি বললেন-

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত জনপ্রিয়ঃ।। ৯।৪।৬৩
যে দারাগার পুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে।। ৯।৪।৬৫
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।। ৯।৪।৬৮

—হে ব্রাহ্মণ, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তের বোঝা নিজের কাঁধে করে বয়ে দিয়ে

আসি। লোকে আমাকে স্বাধীন মনে করলেও আমি ভক্তাধীন। ভক্তজন আমার প্রিয় এবং সাধুভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করে রেখেছে।

যে ব্যক্তিগণ আমাকে ভালবেসে আমারই জন্য স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন বিত্ত, ইহলোক, পরলোক ত্যাগ করেছে আমি তাদেরকে কিভাবে ভুলে থাকতে পারি?

সাধুগণ আমার হৃদয়ে অবস্থান করে। আর আমি সাধুদের হৃদয়ে বাস করি। তাঁরা আমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানে না। আমার মত প্রিয়জন তাদের আর কেউ নেই।

দুর্বাসা মনে মনে ভীত হচ্ছেন- হয়ত শ্রীহরিও তাঁকে নিরাশ করবেন। তাঁর চোখ দুটি অশ্রু ছল ছল। বিরাট সাগরের মত যার গাম্ভীর্য—দানবের মতো যাঁর নাসিকা গর্জন—জ্বলন্ত ভাঁটার মত যাঁর চোখ—যাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুলে তা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়—সেই দুর্ধর্ষ ঋষি আজ শ্রীহরির পদতলে পড়ে জঘন্য অপরাধীর মত বাঁচবার জন্য কাতর আকুলতা দেখাতে লাগলেন।

পরম দয়াল শ্রীহরি দুর্বাসার এই ভাবব্যাকুলতা দেখে বললেন—

ব্রহ্মং স্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৯।৪।৭১

হে ব্রাহ্মণ, তুমি এ মুহূর্তে নাভাগ পুত্র অম্বরীষের কাছে যাও। সেখানে গিয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাতেই হবে তোমার শান্তি।

শ্রীহরিকে প্রণাম করে বিপদগ্রস্ত ঋষি দুর্বাসা অত্যন্ত দুঃখিত মনে অম্বরীষের প্রাসাদে তাঁর চরণদ্বয় ধারণ করলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজ—"পাদস্পর্শ বিলজ্জিতঃ"—ব্রাহ্মণ পাদস্পর্শ করায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কাতরকণ্ঠে সুদর্শন চক্রের স্তব করতে লাগলেন।

সুদর্শন, নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়।
সর্বাস্ত্রঘাতিন্, বিপ্রায়স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥ ৯।৫।৪

—হে চক্র সুদর্শন, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি। হে ভগবৎপ্রিয়, হে সর্বাস্ত্র ঘাতিন, হে সহস্রধার, হে পৃথিবী পতি, তুমি এই ব্রাহ্মণকে শান্তি দান কর। তুমি এই ব্রাহ্মনের আশ্রয় স্বরূপ হও।

এইরূপে পূজিত হয়ে বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হল এবং ফিরে গেল বিষ্ণুর হাতে। আর দুর্বাসাও ভয়মুক্ত হয়ে বললেন—

অহো অনন্ত দাসানাং মহত্বং দৃষ্টামদ্য মে
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ ৯।৫।১৪

—আজ আমি ভগবান অনন্তের দাসগণের মহত্ব দর্শন করলাম। হে রাজন, আমি আপনার নিকট মহা অপরাধী—তথাপি আপনি আমার মঙ্গল বিধান করলেন।

স্থান থেকে স্থানান্তরে পলায়ণ পর ঋষি অম্বরীষের কাছে ফিরে আসতে যতদিন সময় লেগেছিল ততদিন রাজা কেবলমাত্র জলপান করে দিনাতিপাত করেছিলেন। তারপর ঋষিকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর চরণযুগল ধরে তাঁকে

প্রসন্ন করে ভোজন করলেন। ঋষি প্রস্থান করলে অম্বরীষ পুত্রগণের হাতে রাজ্যভার দিয়ে করলেন বন গমন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ●

ভক্তি প্রেম ভালবাসা তিন মহাধন।
সেই ভক্তিতে ভগীরথ করে গঙ্গা আনয়ন।।

অতঃপর শুকদেব অম্বরীষের বংশ বর্ণনা করে সগরের বৃত্তান্ত, কপিলের নিকটে অপরাধ করায় তৎপুত্রগণের বিনাশ ও সগরের পৌত্র অংশুমানের কপিলানুগ্রহ লাভ বর্ণনা করলেন।

সগর ছিলেন নরপতি বাহুকের পুত্র। সগর যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর বিমাতাগণ বিদ্বেষবশতঃ তাঁর মাতাকে 'গর' অর্থাৎ বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান করেছিলেন। সেই 'গর'—অর্থাৎ বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে শিশু সগর নামে পরিচিত। ঐ সগরের পুত্রগণই প্রথমে সাগর খনন করেন। "সগরশ্চক্রবর্ত্ত্যাসীৎ সাগরো যৎ সুতৈঃ কৃতঃ"।

একদা সম্রাট সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য যজ্ঞীয় অশ্বকে দেশ বিদেশে ছেড়ে দিলে দেবরাজ ইন্দ্র সেই অশ্ব করলেন হরণ। অতঃপর সগরের ষাটহাজার পুত্র অশ্ব খুঁজতে খুঁজতে কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে যান এবং অশ্বকে সেখানে দেখে কপিলকে চোর বলে অপমান করেন। এই অপমানের ফলে কপিল সেই পুত্রগণকে সেখানেই ভস্মীভূত করেন।

যখন ষাটহাজার পুত্র ফিরে এল না, তখন পিতামহ সগরের আদেশে পৌত্র অংশুমান অশ্ব অন্বেষণে বের হলেন। তিনি পরিশেষে কপিল মুনির আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক কপিলের নিকটে পূর্বপুরুষদের ভস্মীভূত হওয়ার কারণ জানতে পারলেন। তারপর অংশুমান কপিলের স্তবস্তুতি করলে কপিলদেব বললেন—হে বৎস, স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে যদি এখানে আনতে পার তাহলে সেই জল দ্বারা তোমার পূর্বপুরুষগণ সদ্গতি লাভ করবে।

এই কথা শুনে সগর রাজা পৌত্র অংশুমানের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হলে অংশুমান গঙ্গা আনয়ন করার ইচ্ছায় দীর্ঘকাল গঙ্গার স্তব করেন—কিন্তু গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। অংশুমানের পুত্র দিলীপও গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে দিলীপের পুত্র ভগীরথ পিতৃবংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়ন করবার ইচ্ছায় অতি দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করলেন।

তখন গঙ্গা দেবী প্রীত হয়ে তাঁকে বললেন—'কোঽপি ধরায়িতা বেগং'।—"হে রাজন্, আমি যখন আকাশ থেকে ভূতলে পতিত হব তখন কে আমা বেগ ধারণ করবে? যদি কেউ বেগ না ধারণ করে তাহলে আমি ভূতল ভেদ করে রসাতলে চলে

যাব। তাছাড়া ভূতলেও আমার যাবার ইচ্ছা নাই। কারণ আমি ভূতলে গেলে মনুষ্যগণ আমার বারিরাশিতে তাদের পাপরাশি ধৌত করবে আর আমি তখন সেই পাপরাশি থেকে কোন মতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারব না।

ভগীরথ বললেন—দেবাদিদেব মহাদেব আপনার বেগ ধারণ করবেন। আমি তপস্যা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছি। এছাড়া সর্বত্যাগী লোকপাবন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শমগুণসম্পন্ন সাধুগণ আপনাতে অবগাহন করে আপনার উক্ত পাপরাশি ক্ষালন করে দেবেন। কারণ পাপহারা শ্রীমধুসূদন তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত।

সম্মত হলেন গঙ্গা। ভগীরথ শঙ্খ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছেন। পতিত-পাবনী গঙ্গা পতিত উদ্ধারের জন্য প্রচণ্ড শব্দে নিনাদ করতে করতে মর্ত্যে আসছেন নেমে। কী নিদারুণ তার গতিবেগ। পথে মহাদেব তাঁর মর্ত্যের প্রবাহের বেগ স্বীয় জটার দ্বারা ধারণ করলেন। সেখান থেকে নেমে আসার পর ধরাতল পবিত্র করে চলার সময় ঐরাবত নামে এক হস্তী তার গতিরোধ করে। দেবী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঐরাবতকে নিয়ে চললেন ভাসিয়ে। হায়রে! খর্ব হল ঐরাবতের গর্ব। নিরুপায় বন্য জন্তুটি তখন গঙ্গার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বুকে উলট পালট খেতে খেতে মৃত্যুর দেশে পাড়ি দিতে লাগল।

এরপর দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা প্রবেশ করলেন জহ্নুমুনির আশ্রমে। জহ্নুমুনি তখন ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করে নিমেষেই এক ভয়ঙ্কর চুম্বনে সমস্ত জল উদরস্থ করে ফেললেন। মনে হল যেন যাদুকরের খেলা।

মহা বিপদে পড়লেন ভগীরথ। অগত্যা শরণাপন্ন হলেন মুনিপুঙ্গবের। বহু স্তব স্তুতি করতে লাগলেন তাঁর—হে মুনিবর! শরণাগতের প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার শ্রীচরণে আমি প্রণিপাত করছি, আপনি দয়া করে ত্রিভুবন তারিণী পতিত পাবনী মাকে মুক্ত করে দিন। তা না হলে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করতে পারব না। ওঁরা যে আমার মুখ পানে তাকিয়ে আছে মুনিবর। তাঁদের ভস্মীভূত দেহ আমাকে যে কাতর ভাবে আহ্বান জানাচ্ছে। আপনি গঙ্গাকে মুক্তি দিন মুনিবর! তা না হলে আপনার পাদমূলেই আজ আমি আত্মহত্যা করব।

ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় জহ্নুমুনি বললেন—গঙ্গাকে যদি আমি মুখ দিয়ে বের করি তা সে উচ্ছিষ্ঠ হবে আর অধোস্থান দিয়ে নিঃস্বরণ করলে সে অপবিত্র হবে। তোমার উপর প্রীত হয়ে আমি জানুদেশ বিদীর্ণ করে গঙ্গাকে মুক্তি দিলাম।

জহ্নুমুনির জানুদেশ বিদীর্ণ করে গঙ্গা বেরিয়ে এসেছিলেন বলে তাই তাঁর নাম জাহ্নবী।

এরপর নানাদেশ গিরিপ্রান্তর ও বনানীর মধ্য দিয়ে কলকল ছলছল শব্দে প্রবাহিত হয়ে গিরীদরী বিহারিণী গঙ্গে সেই সকল স্থানকে পবিত্র করে এগিয়ে চলেছেন। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে সাগর সঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রমের সমীপে সগর সন্তানদের ভস্মরাশির উপর হলেন পতিত। আর সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব রাজকীয় মনোমুগ্ধকর রূপের ঝিলিক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সগর পুত্রগণ। দূরে থেকে ভেসে

এল অজস্র মঙ্গল শংখের সুমধুর আওয়াজ। আকাশ গঙ্গার পথে পথে জ্বলে উঠল হাজার হাজার সুবর্ণ দেউটি। সারি সারি স্বর্গের রথ আসতে লাগল সগব পুত্রদের সামনে। পুত্রগণ স্বর্গের পথে পা বাড়ালেন। আকাশে বাতাসে যেন বাজতে থাকে সুর—

ওরে আজ তোরা দেখরে বেরিয়ে দেখরে।
সগরের পুত্রগণ যায়রে স্বর্গপুরে ॥

তৃতীয় অধ্যায়

● রাজা যযাতির উপাখ্যান ●

বলবান ইন্দ্রিয়গণ শাস্ত্র নাহি মানে
সেই ইন্দ্রিয় দমন সদা কর সংগোপনে ॥
জ্ঞান ভক্তির রজ্জু দিয়ে বাঁধ তুমি জোরে।
অন্য কোন অস্ত্রে তারে সাধ্য নাই মারে ॥

একদা দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা সহস্র সখী ও গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সাথে মিলিত হয়ে এক রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে এক মনোরম সরোবর দেখে উভয়ে নিজ নিজ বস্ত্র তীরে রেখে করতে লাগলেন জলক্রীড়া। ঠিক ঐ সময়ে মহাদেব পার্বতীসহ বৃষভে আরোহণ পূর্বক সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে যুবতীগণ অতিশয় লজ্জা পেয়ে জল থেকে উঠে বস্ত্র পরিধান করতে আরম্ভ করলেন।

ঐ সময় শর্মিষ্ঠা ভুল বশতঃ গুরুকন্যা দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। ফলে দেবযানী অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেন শর্মিষ্ঠাকে—দাসী হয়ে আমার বস্ত্র পরিধান করলি। কুকুরী হয়ে যজ্ঞের ঘৃত করবি লেহন? গণিকার মেয়ে হয়ে তুই--

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা বাধে। শর্মিষ্ঠা তখন দেবযানীকে একটা কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

ঐ সময় রাজা যযাতি মৃগয়ায় এসে সেই কূপমধ্যে দেবযানীকে দেখতে পান। বিবসনা দেবযানীকে রাজা প্রদান করলেন আপন উত্তরীয়। তারপর কূপ থেকে তাকে উদ্ধার করেন। কৃতজ্ঞতা বশতঃ যযাতিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হন দেবযানী। যযাতিও প্রতিশ্রুতি দেন তাকে।

তারপর দেবযানী রোদন করতে করতে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে করলেন গমন। শর্মিষ্ঠার সমস্ত কথা বললেন কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করলেন না। পরম জ্ঞানী শুক্রাচার্য কন্যাকে নিয়ে দানবরাজ বৃষপর্বার রাজধানী পরিত্যাগ করার উপক্রম করলে দানবরাজ গুরুদেবের অভিশাপে সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ভয়ে পথেই শুক্রাচার্যের চরণ বন্দনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

তখন শুক্রাচার্য বললেন—দেবযানীর ইচ্ছানুযায়ী বিধান করলে আমি এরাজ্যে থকেতে পারি।

বৃষপর্বা সম্মত হলে দেবযানী বললেন—পিতা আমাকে যেখানে সম্প্রদান করবেন, সখিগণের সহিত শর্মিষ্ঠাকেও সেখানে দাসীর মত অনুগমন করতে হবে। স্নেহশীল বৃষপর্বার পক্ষে এটা একটা কঠোর সর্ত, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁকে পিতৃস্নেহ বিসর্জন দিতে হল—শর্মিষ্ঠা সহস্র সখীর সহিত দাসীর ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করতে সম্মত হতে বাধ্য হলেন।

কন্যাস্নেহে মুগ্ধ শুক্রাচার্য্য দেবযানীর প্রার্থনামত তাকে রাজা যযাতির করে সমর্পণ করলেন এবং দেবযানীর সংকল্পানুযায়ী রূপবতী রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দাসী-রূপে দেবযানীর সাথে তার পতিগৃহে গমন করলেন। শুক্রাচার্য্য যযাতিকে বললেন—হে রাজন্, তুমি কখনো শর্মিষ্ঠার সাথে এক শয্যায় শয়ন করিও না। দৈত্যগুরু কন্যাস্নেহে অন্ধ হয়ে কন্যার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই করলেন, কন্যার সুখের কামনায় সাবধানতা অবলম্বন করলেন কিন্তু পণ্ডিত প্রবর ভুলে গেলেন যে রূপবতী রাজকন্যা সর্বদা রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হলে রাজা যযাতির পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে শুক্রাচার্যের নিকট প্রতিজ্ঞারক্ষা করা কঠিন। 'বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি'—বলবান ইন্দ্রিয় সমূহ সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানকে পরাভূত করে সময় সময় আপনার শক্তি প্রকাশ করে থাকে।

ঘটনাচক্রে ঘটলও তাই। দেবযানী হলেন পুত্র সম্ভবা। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা অসামান্য রূপবতী হয়েও পুত্র সুখে বঞ্চিতা। একদা সেই চিরসুপ্ত মাতৃত্বের ক্ষুধায় চঞ্চল হয়ে শর্মিষ্ঠা নির্জনে রাজা যযাতির কাছে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। রাজার মনে পড়ল শুক্রাচার্যের নিষেধের কথা। তথাপি 'এ আমার বিধিলিপি'—মনে করে রাজা শর্মিষ্ঠার কামনা পূরণ করলেন। যথাকালে দেবযানী দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠা তিন পুত্র প্রসব করলেন।

সমস্ত ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে রাজা যযাতি দেবযানীর পায়ে ধরে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা উপভুক্ত স্বামীর দেহকে উচ্ছিষ্ট অন্নের মত ঘৃণা করে দেবযানী পালিয়ে গেলেন পিতৃগৃহে। রাজাও দেবযানীকে ফিরিয়ে আনতে শ্বশুর শুক্রাচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন।

শুক্রাচার্য্য কন্যার সুখবিপর্য্যয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে অভিশাপ দিলেন—'স্ত্রীকাম, অনৃতপুরুষ, ত্বাং জরাবিশতাং মন্দ, বিরূপকরণী নৃনাম্'—রে কামুক, রে বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম, তুই যখন আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছিস, তখন যে জরা মনুষ্যগণের রূপ বিকৃত করে দেয়, সেই জরা তোর দেহ এখনই অধিকার করুক।

কিন্তু শুক্রাচার্য্য ভাবেন নি যে এই অভিশাপে তার কন্যাও ভোগসুখবঞ্চিতা হবে।

যযাতি সেইকথা শ্বশুরকে স্মরণ করে দিলে ক্ষণক্রোধী শুক্রাচার্য্য কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে অভিশাপের মর্ম উপলব্ধি করলেন এবং যযাতিকে বললেন—যদি কোন যুবক তোমার জরা গ্রহণ করতে স্বীকার করে তাহলে তুমি যৌবনের সহিত নিজের

জরা বিনিময় করে নিতে পার।

যযাতি তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে যৌবন চাইলেন। যদু স্বয়ং বিষ্ণু ভজনশীল। জরা গ্রহণ করলে বিষ্ণু ভজনের ব্যাঘাত ঘটবে—এই ভেবে অসম্মত হলেন। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার সহিত জরা যৌবন বিনিময় করলেন।

পুত্রের কাছ থেকে যৌবন গ্রহণ করে যযাতি ভোগ সুখে সহস্র বছর অতিবাহিত করেও পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। পরিশেষে তাঁর চৈতন্য হলে তিনি মনে মনে ভাবলেন—

—পৃথিবীতে যত ধানা, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সমস্ত বস্তু সব একজন মানুষকে দিলেও সেই মানুষের বিষয় পিপাসা মিটবে না।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহৃতস্য তে॥ ৯।১৯।১৩

—কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কাম কোনদিন নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু ঘৃতো-হুতির আগুনের মতই বেড়ে যায়।

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ ৯।১৯।১৪
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভিঃ জীর্যতো যান জীর্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ॥ ৯।১৯।১৬

—যে বিষয় তৃষ্ণা জীবগণের ত্যাগকরা দুঃসাধ্য এবং মানুষ জরাজীর্ণ হলেও যে বিষয় তৃষ্ণা কিছুমাত্র কমে না, কল্যাণকামী ব্যক্তির সেই বিষয় তৃষ্ণাকে সত্বর ত্যাগ করা উচিৎ।

এইসব চেতনা ও শুভবুদ্ধির উদয় হওয়াতে যযাতি পুরুকে তাঁর যৌবন ফিরে দিয়ে বনগমন করলেন। যযাতির মনে আজ এক চিন্তা, সে চিন্তা শুধু শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারীর।

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ॥ ৯।১৯।২৯

—হে ভগবন্, আপনি অন্তর্যামী, জগতের বিধাতা, পরম সহায়, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

চতুর্থ অধ্যায়

● দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা ●

কামাচারীর পুত্র যদি অতিধার্মিক হয়।
সেই পুত্র হেতু পিতার হয় পাপক্ষয়॥
বিষ্ণুভক্ত একপুত্রে বংশের পাপ নাশে।
শত তারা যা না করে এক চন্দ্র হাসে।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন—যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর নাম অনুসারে তাঁর

বংশের নাম হয় পুরুবংশ। পুরুর অসাধারণ হরিভক্তির জন্যই তাঁর এত মর্য্যাদা ও মহিমা। এই পুরুবংশের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হলেন দুষ্মন্ত।

একদিন তিনি অনুচরদের নিয়ে মৃগয়ায় বের হন এবং ক্রমে কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত। ঐ আশ্রমে সর্বসুলক্ষণা এক সুন্দরী কন্যা দুই সখীকে নিয়ে পুষ্প চয়ণ করেছিল। দুষ্মন্ত সেই কন্যার রূপে মোহিত হয় ও কথা প্রসঙ্গে জানতে পারেন ইনি বিশ্বামিত্র মুনির তনয়া। মাতা অপ্সরী মেনকা কণ্বমুনির স্নেহ যত্নে তাঁর আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছেন। কন্যার সম্মতি নিয়ে রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলার পাণিগ্রহন করেন।

তাপরর দুষ্মন্ত চলে গেলেন রাজাধানী হস্তিনাপুরে।

দিন যায়, মাস যায়, কালক্রমে শকুন্তলা প্রসব করলো একটি পুত্র। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে সে বড় হতে থাকে। কুমার এত শক্তিশালী যে সে সিংহশাবকদের সাথে খেলা করত। ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল ভরত।

কিছুদিন পরে শকুন্তলা বালকপুত্রকে নিয়ে দুষ্মন্তের নিকট গমন করলেন। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত সব ভুলে গেছেন। চিনতে পারছেন না শকুন্তলাকে। এ প্রসঙ্গে দুর্বাসার শাপের কথা আমরা সবাই জানি। এখানে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

তারপর দৈববাণী হল—হে দুষ্মন্ত! ভরত তোমারই পুত্র। পুত্ররূপে তোমার আত্মাই এর মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে। নিজের পুত্রকে গ্রহণ কর।

রাজা দুষ্মন্ত নিজের ভুল বুঝে স্ত্রী ও পুত্রকে গ্রহণ করলেন।

এই ভরতের নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম হয় ভারত।

পঞ্চম অধ্যায়

● রন্তিদেবের অতিথি সেবা ●

এ ধরায় অতিথি রূপে হরি সদা ফেরে।
অতিথিরে ঠাঁই দিলে তিনি থাকেন ঘরে॥

অণিমাদি আটটি সিদ্ধি আছে। তা দিয়ে মানুষ অনেক সম্পদ লাভ করতে পারে। রন্তিদেব বলছেন—ঈশ্বরের কাছে আমি অণিমাদি সিদ্ধি চাই না। আমি মুক্তিও কামনা করি না। আমি চাই, প্রাণীদের অন্তরে থেকে তাদের দুঃখ অনুভব করতে। আমি আব্রহ্ম-স্তম্ব অর্থাৎ তুচ্ছ প্রাণী থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত সমস্ত জীবের দুঃখ দূর করতে চাই।

ঐ রন্তিদেবের অনেক সম্পত্তি ছিল। অপরের দুঃখ দেখলে তিনি নিজের অর্থ দিয়ে তা দূর করতে চেষ্টা করতেন। দান করতে করতে এক সময় তাঁর সব সম্পদ হয়ে গেল শেষ। একবার এমন হল, তাঁর নিজেরই খাবার জুটছে না। সপরিবারে দিনের পর দিন অনাহারে লাগলেন কাটাতে। এভাবে কেটে গেল দীর্ঘ আটচল্লিশটা

দিন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে সকলে। নিজেও হয়ে গেছেন খুবই দুর্বল। এমন সময় ভগবানের অপার মহিমায় একব্যক্তি সহসা ভাত-ডাল-তরকারী-পায়েস ইত্যাদি ভাল ভাল খাদ্য নিয়ে এল। সেই সঙ্গে নিয়ে এল শীতল পানীয় জল। পরিবারের সকলের মুখে ফুটল হাসি।

কিন্তু ঘটে গেল এক বিরাট ঘটনা। রন্তিদেব ও তাঁর পরিবারবর্গ আহারে বসতে যাবেন—এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি হলেন হাজির। তিনি ক্ষুধার্ত। খেতে চাইলেন। রন্তিদেব ছিলেন ভক্তিপরায়ণ। তিনি ভক্তির সাথে শ্রদ্ধা পরায়ণ হয়ে আহার করালেন ব্রাহ্মণকে।

তারপর পরিবারের অন্যান্যদের অবশিষ্ট অন্ন ভাগ করে দিয়ে নিজে খেতে বসবেন এমন সময় আর একজন অতিথি এসে উপস্থিত।

অতিথির অনেকদিন খাওয়া হয়নি।

এই মুহূর্তেও রন্তিদেব কিন্তু বিরক্ত অনুভব করলেন না। তিনি শ্রীহরির ভক্ত সকল জীবের মধ্যে শ্রীহরি অবস্থান করেন—এ জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট আছে। তাই অতিথিরূপী—শ্রীহরিকে 'না' করবেন কি করে? হরি স্মরণ করে তিনি ঐ অতিথিকে নিজের ভাগের অন্ন থেকে কিছুমাত্র দিলেন। অতিথি ভোজন করলেন পরম আনন্দে। তারপর রন্তিদেবের উচ্চ প্রশংসা করতে করতে নিলেন বিদায়।

এমন সময় এক ভবঘুরে পথিক কয়েকটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে রন্তিদেবের কাছে এসে জানাল—আমি ক্ষুধার্ত এবং আমার কুকুরগুলোর অনেকদিন কিছু খাওয়া জোটেনি। আমাদের কিছু খেতে দিন।

রন্তিদেবের কাছে সামান্য কিছু অন্ন ও ব্যঞ্জন তখনও ছিল। তিনি ঐ আগন্তুক ও কুকুরগুলিকে দান করে শ্রীহরি জ্ঞানে তাদের নমস্কার জানালেন। রন্তিদেবের কাছে আর কিছুই খাদ্য রইল না। শুধু একটুখানি পানীয় জল বাকী আছে। তিনি মনে মনে ভাবছেন -এই জলটুকু খেয়েই আজ প্রাণ বাঁচাবেন।

এমন সময় এক চণ্ডাল তাঁর সামনে এসে বলল—আমি বড় ক্লান্ত। পিপাসায় আমার প্রাণ যায়। আমি চণ্ডাল, অস্পৃশ্য অধম, অপবিত্র বলে কেউ আমাকে জল দিতে চায় না। আপনি আমাকে একটু জল খেতে দিন। চণ্ডালের কথায় রন্তিদেব তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে জল দিচ্ছি। আমার কাছে যেটুকু জল আছে তা তুমি নিশ্চয় পাবে।

তিনি তখন ভাবছেন—আমি ভগবানের কাছে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি চাই না। মুক্তিও কামনা করি না। আমি যেন সকলের অন্তরে থেকে সকলের দুঃখের ভাগ নিতে পারি। আমার দ্বারা যেন সকল প্রাণীর দুঃখ দূর হয়।

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।

আর্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহ ভাজামন্তঃ স্থিতোযেন ভবন্ত্য দুঃখা ॥ ৯।২১।১২

অষ্টসিদ্ধি বলতে—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব বুঝায়।

রন্তিদেব বললেন—দীনজনের জীবন রক্ষাই ভগবানের চরণে আমার কামনা। আমার যেটুকু পানীয় জল আছে। এই চণ্ডালকে আমি তা দিতে চাই। এই বলে রন্তিদেব সেই চণ্ডালকে আপনার পানীয় জলটুকু দিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতির ছদ্মবেশে স্বর্গের দেবতারা রন্তিদেবকে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা এক্ষণে স্বরূপ ধারণ করে রন্তিদেবকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! তোমার ধৈর্য্য ও ঈশ্বরভক্তি পরীক্ষার জন্য শ্রীহরি আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। ধন্য তোমার জীবসেবা—ধন্য তোমার মানবপ্রেম আর হরিভক্তি। তুমি অচিরেই মোক্ষলাভ করবে। নিমেষেই তোমার সকল দুঃখ ব্যথার অবসান হবে। এই বলে দেবতারা অন্তর্ধান করলেন—

রন্তিদেব দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ও সকল কামনা মুক্ত হয়ে অশ্রু ছলছল চোখে বাসুদেব চিত্তে আত্মসমর্পন করলেন। ঈশ্বর ভিন্ন কোন কিছুতেই তাঁর আর আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি শুধু বলতে লাগলেন।

ধন ঐশ্বর্য আমি কিছুই চাই না ঠাকুর। শুধু তুমি আমার বুকের মধ্যে জেগে থাকো। আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাকো হে সর্বশক্তিমান। তোমাকে পেলেই আমার সব দুঃখ লাঘব হবে। তোমার করুণাই আমার জীবনের পরম পাথেয়। তোমার পায়ের ধুলোই আমার জীবন বাঁচানোর পথ্য। তুমি আমাকে ঐ পদরজ আর পাদোদক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখো।

দশম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ●

অপরূপ কৃষ্ণলীলা বড়ই মধুর।
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
সদা চিন্ত হৃদে কৃষ্ণ জপে কৃষ্ণ নাম।
বদনেতে বল কৃষ্ণ শব্দ অবিরাম॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ নব্বইটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তিন হাজার নয়শত তেতাল্লিশটি শ্লোকে বিস্তৃত। এই স্কন্ধে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা স্থূলভাবে তিন প্রকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি লীলা হচ্ছে—ব্রজলীলা, মথুরা লীলা ও দ্বারকা লীলা। গোকুলে ও বৃন্দাবনে যে লীলা তা 'ব্রজলীলা' নামে পরিচিত। মথুরা ও দ্বারকার লীলাকে সাধারণতঃ পুরলীলা বলা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত বিষয়ে নিরাসক্ত মুমুক্ষু এবং শুদ্ধভক্ত। সুতরাং মহাজ্ঞানী শুকদেব নয়টি স্কন্ধে ধীরে ধীরে পরীক্ষিতের চিত্তশুদ্ধি সাধন করে তবে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। এই দশম স্কন্ধে গোপীগণের যে ব্যাকুলতা ও বিরহের জ্বালা বর্ণিত আছে—তা সাধারণ হৃদয় দ্বারা বোঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অর্দ্ধস্খলিত অঙ্গবেশ। বক্ষে হাহাকার ধ্বনি। লজ্জা ভয় বিসর্জন দিয়ে ধূলিময় পথে তারা শ্রীকৃষ্ণের রথের পশ্চাতে ছুটে চলেছেন, পতিপুত্র কোথায় পড়ে রইল, সে চিন্তা একবারও মনের ভেতর উদিত হচ্ছে না—তাঁদের সমগ্র দেহ মন ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হয়ে গেছে—এইরূপ বিরহজ্বালা অনুভব করা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেহত্যাগ করেছেন, ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী বিরহবিধুর মন নিয়ে বৃক্ষের তলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য চিন্তায় মগ্ন। একটি শুকনো পাতা গাছ থেকে সনাতনের বুকে পড়ে যাওয়া-মাত্র পাতাটি দপ্ করে জ্বলে উঠল। শ্রীচৈতন্য বিরহ প্রসূত সনাতনের বুকের আগুন তখন বুঝতে পারল মানুষ। তাই শ্রীশুকদেব পূর্বে নয়টি অধ্যায়ে মানুষের মনকে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তনে করলেন অভ্যস্ত। মনকে করলেন ভগবনামমুখী। তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎকে নিয়ে ঝাঁপ দিলেন শ্রীকৃষ্ণলীলা সমুদ্রে। আগে খানা ডোবাতে সাঁতার না শিখলে সমুদ্রে কি সাঁতার কাটা যায়?

শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধ। ঐশ্বর্যময়ী এবং মাধুর্যময়ী। যে লীলায় শ্রীভগবান মানুষ রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেন পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় সম্বন্ধ স্বীকার করে ভক্তমনোরথ পূরণ করেন—সেই লীলা মাধুর্য্যময়ী। যে লীলায় মনুষ্যরূপ ছাড়া (নৃসিংহ), কোথাও জন্মগ্রহণ না করেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য প্রভাবে ভক্তমনোরথ পূর্ণ করার জন্য অবতীর্ণ হন—শ্রীভগবানের সেই লীলাই ঐশ্বর্য্যময়ী।

এককালে দৈত্যেরা পৃথিবীতে প্রবল অত্যাচার করেছিল। সামান্য কারণে অকারণে পরস্পর হানাহানি মারামারি করত। পৃথিবী ক্রমে হয়ে উঠল পাপে পরিপূর্ণ।

মানুষের তখন দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। এই অত্যাচার আর অনাচারের হাত থেকে সৎ মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিষণ্ণবদনা ধরিত্রী স্বয়ং গাভীরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

নিরুপায় ব্রহ্মা তখন ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়ে বেদমন্ত্রে জগন্নাথের স্তব করতে লাগলেন। আকাশ বাতাস আকুল করে হঠাৎ খেলে গেল বিদ্যুতের রোমাঞ্চ।

দৈববাণী হল—তোমার ডাক শুনতে পেয়েছি সৃষ্টি কর্ত্তা। আমি অবিলম্বেই যদুবংশে বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হব আর যশোদার গর্ভে জন্ম নেবেন যোগমায়া। এই যোগমায়াই আমার লীলাসঙ্গিনী। সেইসঙ্গে জন্ম নেবেন অতিকায় অনন্তনাগ।

কী গুরুগম্ভীর প্রচণ্ড অথচ ভয়ার্ত সে বার্তা।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে মথুরার যদুবংশের রাজা হলেন উগ্রসেন। উগ্রসেন আর দেবক দু'ভাই। দেবকের সাতটি মেয়ে। ঐ সাতটি মেয়েকে বিয়ে করেছেন শূর-

বংশের শ্রেষ্ঠ কর্তা বাসুদেব। শূর বংশ ছিল মথুরাতে।

আর ঐ উগ্রসেনের ছেলের নাম কংস। সে দেবকের কনিষ্ঠা কন্যা দেবকীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই ছোটবন দেবকীকে খুব ভালবাসত।

বসুদেব দেবকীকে বিয়ে করে রথে চড়ে ফিরছেন বাড়ী। তিনি নিজেই রথের রশ্মি ছিলেন ধরে। তা দেখে কংস ভাবল, বংশের জামাতা নিজে রথ চালিয়ে নিয়ে যাবে—এ হতে পারে না—আমি নিজেই রথের রশ্মি ধরব। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ত্বরিতে উঠে পড়ল রথে। তারপর নিজেই রশ্মিটা ধরল।

সহসা এক দৈববাণী হল—রে মূর্খ সারথি! যাকে তুমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছ, ঐ দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণঘাতী হবে।

'অস্যাস্তামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেহবুধ।' ১০।১।৩৪

তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই স্তব্ধ। স্তব্ধ হয়ে গেল গাছপালা পশুপাখী আর চঞ্চলা পৃথিবী। বাম নয়নটা কেঁপে উঠল কংসের। একটা শুভ অশুভের, একটা মঙ্গল অমঙ্গলের উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনায় হৃদয়টা বার বার সাড়া দিতে লাগল তার।

এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। এক একটা চোখের পলক যেন এক একটা ভূমিকম্প। সে তাই এতটুকু স্থির থাকতে না পেরে একহাতে টেনে ধরল দেবকীর চুলের গোছা আর এক হাতে প্রচণ্ড ভীমাকৃতি একটা খড়্গ তুলল তাকে বধ করতে।

বসুদেব শঙ্কিত হয়ে তখনই কংসকে বললেন—আপনি জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ। বিবেকবুদ্ধি আপনার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য যে ভগ্নীর বিয়ের দিনে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। আপনি কখনো মনুষ্যপদবাচ্য হতে পারেন না। জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু তখন অবধারিত। এটা জেনেও আপনি মরণ ভয়ে-ভীত সন্ত্রস্ত। পৃথিবীতে এর চেয়ে আশ্চর্য্য বুঝি আর কিছুই নেই। মৃত্যু দেহের জন্মের সহিত জন্মগ্রহণ করে থাকে—জন্ম ও মৃত্যু একসঙ্গেই দেহের সাথে বাস করে। আজই হোক অথবা শতবছর পরেই হোক দেহিগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

'মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥' ১০।১।৩৮

আবার গীতাতেও আছে—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"

কংস দুরাচারী শতবোঝানো সত্ত্বেও তিনি ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেন না। খড়্গ তুললেন। সে কী ভয়ঙ্কর তার মূর্ত্তি। সারা মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম। চোখ দুটো জ্বলছে ভাটার মত। বুকের মধ্যে যেন বিদ্ধ হয়েছে মহাশেল।

তখন বসুদেব বললেন—আপনার কোন ভয় নেই। দৈববাণী যা হয়েছে তাতে দেবকীর থেকে আপনার এত ভয় কেন? ভয়তো দেবকীর পুত্রের থেকেই। আজ আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, দেবকীর পুত্র জন্মিবামাত্রই আপনার হস্তে সমর্পণ করব।

নহ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদবাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্॥' ১০।১।৫৪

কংস জানতেন, বসুদেব সত্যবাদী। কথার খেলাপ তিনি কোনদিন করবেন না। তাই মুক্তি দিল দেবকীকে।

দেবকী বাঁচল বটে কিন্তু তার এ বাঁচা মৃত্যুরই নামান্তর। কারণ আপন সন্তানকে প্রত্যক্ষ ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে তাকে সারা জীবন যন্ত্রনাভোগ করতে হবে।

এসে গেল সেই বিভীষিকাপূর্ণ দিনটি। প্রথম সন্তান জন্ম নিতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বসুদেব তাকে তুলে দিলে কংসের হাতে।

কংস বললেন—এ শিশুকে আপনি নিয়ে যান। এর থেকে আমার কোন ভয় নেই। আপনার অষ্টম সন্তানই আমার মৃত্যুর কারণ। আমি তার জন্য অপেক্ষা করব।

আনন্দের সাথে সন্তান ফিরে নিয়ে চলে গেলেন বসুদেব। কিন্তু নারদ এসে বাঁধালেন গণ্ডগোল। তিনি বললেন কংসকে—যদুবংশের সকলেই প্রায় দেবদেবী কৃষ্ণের লীলাসহচর। আর সবাইতো জেনে গেছে কৃষ্ণ তোমার চিরশত্রু। পূর্বজন্মে তুমি কালনেমি নামে এক অসুর ছিলে আর বিষ্ণু তোমাকে করেছিলেন বধ। কখন কী হয় তা বলা যায় না। সুতরাং সবদিক থেকেই তোমার সাবধান থাকা দরকার।

কংসের মনে নেই শান্তি। তিনি বসুদেব আর দেবকীকে করে রাখলেন কারারুদ্ধ। প্রবল পরাক্রান্ত কংসের কাছ থেকে কোন মতেই রেহাই পেলেন না বসুদেব আর দেবকী। স্থির থাকতে না পেরে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য প্রথম পুত্রটিকে হত্যা করলেন কংস।

ক্রমে তাদের এক একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আর কংস পূর্বের কথা স্মরণ করে তাদের বধ করতে থাকে। বসুদেবের শতসহস্র অনুরোধ, দেবকীর ব্যথাভরা কান্নার হাহাকার আর অন্যান্য আত্মীয়গণের কোন কথা শুনল না সে।

কংসের সিংহাসনের লোভ ছিল প্রবল। পিতার মৃত্যু অবধি সে ধৈর্য্য ধরতে পারেনি। অবশেষে একদা পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করল। আত্মবিলাসই—যাদের ব্রত, তাদের কাছে আত্মপরিবার বর্গ তুচ্ছ। স্নেহমমতা বলে জীবনে তাদের কোন পদার্থ নেই।

এভাবে প্রতাপশালী অহংকারী কংস একে একে দেবকীর ছ'টি পুত্রকেই করলেন বিনাশ।

পূর্বেই বলেছি যে অসুররা ঐ সময় পৃথিবীর উপর প্রবল অত্যাচার শুরু করেছিল। তাই এ সুযোগে কংস অসুরদের সাথে মিলিত হয়ে লেগে গেল যাদব নিগ্রহে।

যাদবগণ মথুরামণ্ডল ছেড়ে পালাতে লাগল। আবার কেউ বা কৃষ্ণদর্শনের আশায় কংসের অনুগত হয়ে মথুরায় অবস্থান পূর্বক তাঁর সেবা করতে লাগল। তাদের বিশ্বাস—বহু সৌভাগ্যে মথুরাবাস ভাগ্যে মিলে। পদ্মপুরাণে আছে—

'দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।'

এই মথুরায় একদিন মাত্র বাস করতে পারলে হৃদয়ে হরিভক্তি জেগে উঠে। আবার —'মথুরা ভগবান্ যত্রনিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।' মথুরা হরির নিত্য লীলাভূমি।

এদিকে দেবকীর দেহে সপ্তম গর্ভের লক্ষণ পরিস্ফুট। ঐ গর্ভও বিষ্ণুর অংশ-ভূত। স্বয়ং বলরাম ঐ গর্ভে আবির্ভূত হচ্ছেন। বলরাম যদি নিহত হয় তাহলে কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং তাঁকে বাঁচাতেই হবে।

বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু তখন যোগমায়াকে আদেশ করলেন—

'গচ্ছ দেবী, ব্রজং ভদ্রে! গোপ গোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণীবসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে॥'

—হে যোগমায়ে, তুমি ব্রজধামে গমন কর। নন্দালয়ে বসুদেবপত্নী রোহিণী আছেন। আমার 'শেষ' নামক অংশ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত। তুমি তাকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে রোহিণী গর্ভে স্থাপন করো। তারপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর নন্দন হয়ে জন্মাব আর তুমি জন্মাবে নন্দরাণী যশোদার গর্ভে। হে দেবী পৃথিবীতে তুমি দুর্গা, কালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, শারদা—এই সকল নামে পারিচিতা হবে। তুমিই আমার আবরিকা শক্তি। তুমিই—যোগমায়া—আমার পরম ঐশ্বর্য্য।

যোগমায়া যথাদিষ্ট করলেন। দেবকীর গর্ভ লক্ষণ তিরোহিত হল আর রোহিণীর কোলে জন্ম নিল বলরাম। গর্ভ সংকর্ষণ করে নেওয়ার জন্য তার নাম হল সংকর্ষণ। লোকমনোরন্ধক হওয়াতে 'রাম' আর বনশালী হওয়ার জন্য 'বলভদ্র' নাম হ'ল। শক্তি ও কান্তির জন্য সংক্ষেপে তার নাম বলরাম।

বসুদেব কারাগারে বসে চিন্তা করছেন পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে। সেই ভগবান যেন তাকে বাঁচান। তাঁর দীর্ঘদিনের কাতর আহ্বান শুনে ভক্তের অভয়দাতা ভগবান পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হলেন। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান বসুদেবের শ্রী-অঙ্গকে এক বিরাট দীপ্তিতে ভরিয়ে তুললেন। দেবকীও স্বপ্নে দেখলো ঐশ্বর্যশালী ভগবানকে।

অনন্তর দীপ্তিমান চন্দ্রের মতো শুচীস্মিতা শুদ্ধসত্বা দেবকী অচ্যুতকে ধারণ করলেন।

দেবকী হয়ে উঠলেন সমস্ত জগতের আবাসস্থল। কিন্তু আপন মনের এই অপার আনন্দ অন্যকে জানাতে পারছেননা তিনি। আবার ভয়ও লাগছে তাঁর।

কংস তাকে একদিন দেখতে এলেন। দেখলেন, অজস্র অঙ্গপ্রভায় অন্ধকার কারাকক্ষ আলোকিত করে বসে আছে দেবকী। এক পুলকিত আলোর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দেবকীর দেহ। বিশ্ববিধাতা আজ তার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছেন।

কংস তাই ভাবছে, নিশ্চয়ই আমার প্রানহর হরি—দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। তাইতো এতো আলোর বন্যা—এতো মায়ার জ্যোতি।

মানস নেত্রে গর্ভশায়ী শ্রীহরিকে দেখে ফেলল কংস।

—কিন্তু আমি এখন কি করব! তবে কি দেবকীকে বধ করব। দেবকীকে বধ করলে একসংগে স্ত্রীলোকবধ, ভগিনীবধ ও গর্ভিনীবধের পাপ হবে আর এতে আমাকে সারাজীবন নরকে বাস করতে হবে। যে শুধু হিংসা করে জীবন ধারণ করে, সে

জীবন্মৃত। শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষভাব নিয়েই বরং তার জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করি।

হরি সংলগ্নমন হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন কংস। মনে নেই শান্তি—দেহে নেই বল আর হরি চিন্তা থেকে অন্তর নয় মুক্ত। এককথায় শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায় জাগরণে কৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে কংস সারা বিশ্বকে কৃষ্ণময় দেখতে লাগলেন।

'আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥' ১০।২।২৪

এখানে শত্রুভাবাপন্ন কংস বিষয়ভোগী সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষয়াসক্ত লোক মুখে হরিনাম করে, কৃষ্ণরূপ তারা ধারণা করতে পারে না। তাই কৃষ্ণপ্রেমের কোন ছোপই তাদের হৃদয়ে লাগে না।

কিন্তু শত্রুভাবেও কৃষ্ণরূপ চিন্তা করলে সে রূপ মনে লেগে যায়। সেইরূপ চিন্তা থেকে আর বিরত হওয়া যায় না। তাই কংসের শত্রুভাব বিষয়ী জীবের উদাসীন ভাব অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কত ঋষি-যোগী ও জ্ঞানীগণ নির্জনে কত শত বছর তপস্যা করেও হয়ত হরিময় জগৎ দেখতে সমর্থ হন না। কিন্তু কংস কয়েক বছরের মধ্যেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই মহাবাণীকে সার্থক রূপ দিলেন।

তবে একটা কথা কি—শত্রুভাবে কৃষ্ণচিন্তা করলে সত্যিকারের কৃষ্ণ প্রেমরস বা যথার্থ কৃষ্ণানন্দ উপলব্ধি করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● কংসকারায় কৃষ্ণমেঘ দর্শন ●

পর্বত কন্দরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নদনদী।
কৃষ্ণ সত্য সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ সে জলধি ॥
অন্তর্য্যামী সর্বভূতের অধিশ্বর হয়।
কৃষ্ণকৃষ্ণ ডাকি জগৎ দেখ কৃষ্ণময় ॥

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চসত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ১০।২।২৬

—হে ভগবান, আপনার ভজন সত্য, সত্যের দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়। আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই ত্রিকালেই সত্যস্বরূপে বিরাজ করছেন। আপনিই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি কারণ, আপনি অন্তর্য্যামী—আমরা এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্যস্বরূপ আপনার শরণ নিলাম।

সামান্য জীব থেকে পিতামহ ব্রহ্মা অবধি সকলেরই বিগ্রহ বা দেহ পতন হয়, সুতরাং এদের মধ্যে কারও শরণাপন্ন হয়ে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। যে নিজেই বিনাশশীল, সে অপরকে কী করে রক্ষা করবে! কিন্তু শ্রীহরি সত্যঘন মূর্ত্তি, তাঁর শরণাগত হলে জীবের আর বিনাশ নেই। সুকর্মফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হলেও জীব সেখানে

চিরদিন থাকতে পারে না। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—পুণ্যক্ষয় হলে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করতে হয়, কিন্তু শ্রীগোবিন্দ চরণে আশ্রয় নিলে 'গতাগতি পুনঃ পুনঃ' হয় না। তাঁর কৃপায় জীব পার্ষদদেহ লাভ করে চিরদিন শ্রীহরি সঙ্গলাভ করে থাকে। ভগবান বলেছেন—"যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—আমার ধাম প্রাপ্ত হলে আর ফিরে যেতে হয় না।

দাবানলে বনের পশুরা তাপিত হয়ে ছুটাছুটি করতে করতে কৃষ্ণ মেঘের উদয় দেখলে যেমন আনন্দিত হয়, সেইরূপ কংস, অঘ ও পুতনার সম্মিলনে আশঙ্কিত ইন্দ্রাদি দেবগণ কংসের কারাকক্ষে কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার দেখে আকুল হয়ে উঠছেন। কারাগার—কারাগার নয়। এ যেন বৈকুণ্ঠের মায়া।

তৃতীয় অধ্যায়

● কংসকারায় কৃষ্ণের জন্ম হল কেন? ●

যখন তোমার কোন সাথী না থাকিবে,
কৃষ্ণ নাম কর তখন কৃষ্ণ দেখা দিবে।
বিষম বিপদে কৃষ্ণ মানবরূপে আসি,
নিরুপায়ীর উপায় করে তারে ভালবাসি।

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলায় দেখা যায়—মায়াবদ্ধ সংসারী মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বপিতা ও বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বহু কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হয়েছেন। মহিষীদের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি বহু সন্তানের পিতাও হয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী—নিরাসক্ত সংসারী। রাজকার্য সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কখনও কখনও গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কখনও কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর জন্য কর্মব্যস্ত, কখনও গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করছেন, আবার কখনও বা কূপ খনন করে বিশ্বজন হিতায় করছেন 'পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ' তাইতো শ্রীভাগবতের লীলাময় পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ আমাদের মত সংসারী জীবের পরম আশ্রয়। তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর। সংসার ত্যাগ করার আদর্শ গ্রহণ করেন নি তিনি। সংসারী হয়েও ধর্মের চিরন্তন আদর্শ প্রচার করে গেছেন। কৃষ্ণ আমাদের মতই কর্ম করে গেছেন কিন্তু তাঁর কর্মে ছিল না কোনরূপ আসক্তি।

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।' (গীতা)

তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ নিরাসক্তভাবে কর্ম করা। স্পৃহাহীন কর্মের মধ্যে ডুবে থাকা।

'কর্মণ্যে ব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। (গীতা)

নিরাসক্তভাবে কর্ম করা মানে, কর্ম করবে—কিন্তু ফলের আকাঙ্খা করা চলবে না। ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা পাওয়ার আশা করা চলবে না, উপকার করে কৃতজ্ঞতার

ভিক্ষা অনুচিত আর কোন কিছু নেওয়ার আশা নিয়ে কাকেও কোনকিছু দেওয়া চলবে না।

এইরূপ নিরাসক্তভাবে কর্ম করাই কৃষ্ণের সংসার জীবনের মূলকথা। তাঁর ধর্মের মর্মবাণীই হচ্ছে নিরাসক্তি। অথচ এ সংসার তাঁর। তিনি কর্মের ভোক্তা। সংসারের কর্তা।

যে মানুষ নিজেকে কর্তা বলে মনে করে সে অহংকারী, বিমূঢ়াত্মা।

'অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' (গীতা)

সে হয় আদর্শ ভ্রষ্ট সংসারী। তখন তাকে জন্মজন্মান্তর দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু এ সংসারটি শ্রীহরির—সমস্ত কর্মই শ্রীহরির প্রীতির জন্য করা হচ্ছে—আত্মপ্রীতি বা আত্মগৌরবের জন্য নয়—এটা মনে রাখলে আর ভয় নেই।

আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে গোপীগণের সাথে পরম প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে সময় অতিবাহিত করছেন, হঠাৎ মথুরায় যাওয়ার প্রয়োজন হল তাঁর। তিনি রথে উঠে মথুরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তখন তাঁর পরম প্রিয় গোপীগণ শোকাচ্ছন্ন হয়ে আলুথালু বেশে তাঁর রথের পেছনে ছুটে আসছেন—কী কাতর তাঁদের ডাক—কী অসহায় আকুতি—'হে প্রাণসখা, তুমি না যাইও আজ মথুরায়।'

কিন্তু প্রাণসখা একবারও ফিরে চাইছেন না। একবারও ভাবছেন না তাঁদের কথা। ধূলির ঝড় উড়িয়ে দিয়ে নতুন প্রাণের উদ্দাম আনন্দে মেতে তাঁর রথ ছুটল মথুরার পানে। ঝড়ে কাঁপা প্রাণের আনন্দে নব নব ছন্দে নতুন দিনের জয়যাত্রার গৌরবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ আজ উদ্বেলিত। এটাই নিরাসক্তি। কৃষ্ণচরিত্রের মূল বৈশিষ্ট। নিরাসক্তিতে স্নেহ-মমতা-মায়া মোহ কিছুই নেই। নিরাসক্ত মন সমস্ত কামনা বাসনার উর্ধ্বচারী।

জনকরাজা একবার নির্লিপ্ত হৃদয়ে ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণের সাথে ধর্মালোচনা করছিলেন—খবর এল মিথিলার এক অংশে আগুন লেগে সব পুড়ে যাচ্ছে। জনকের কোনরূপ ব্যাকুলতা নেই। ব্রাহ্মণ এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে রাজর্ষি বলেছিলেন—'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতে কিঞ্চন'। সমগ্র মিথা পুড়ে গেলেও আমার কোনরূপ ক্ষতি হবে না।

এমনি নিরাসক্ত ছিলেন রাজর্ষি জনক। তা বলে তিনি কিন্তু কর্তব্যহীন নন। একথায় ভগবানের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা আর নিষ্ঠা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ নিশীথে এক লৌহময় প্রকোষ্ঠে, গম্ভীর মেঘ গর্জনের ভীষণতার ভেতর দিয়ে ভক্তগণের অভয়দাতা—শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' দেবকীর অষ্টমগর্ভ আলো করে কারাগারের অনাবৃত ধূলিময় ভূমিতে ভূমিষ্ট হলেন। যিনি রাজার রাজা—সেই রাজরাজেশ্বর পরমপুরুষ স্বেচ্ছাবৃত মানবজন্ম পরিগ্রহ করে দীনহীনের ন্যায় অসহায় শিশুর মত পড়ে আছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে ভাদ্রমাসে 'বিজয়' বেলায়

রোহিনী নক্ষত্রে বুধবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে পৃথিবীর ভাগ্যে এই শুভ মুহূর্তের উদয় হয়েছিল। সে আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা।

কিন্তু এই কারাগারে জন্মালেন কেন ?

প্রথমতঃ বদ্ধজীবের সংসার বন্ধন মানবচক্ষু দ্বারা দেখার জন্য। দ্বিতীয়তঃ কংসকারায় জন্মে মথুরামণ্ডলের কারাপ্রাচীর ভাঙার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। সেই সময় অত্যাচারী কংসের মথুরামণ্ডল যেন একটা বিরাট কারাগার হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়তঃ দরিদ্রের সখা হবে বলেই দারিদ্রের ভিতর দিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। চতুর্থতঃ নিষ্ঠুর শিশুহত্যা দেখার মত ধৈর্য্য যখন হারিয়ে ফেলেছেন মাতা দেবকী, তখন সেই অসহায় মায়ের সহায় হতে তিনি এসেছিলেন। মানুষের বিপদের দিনে যখন কেউ কোথাও থাকে না, তখনই শ্রীহরি এসে উপস্থিত হন। মানুষ যখন নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন তখনই শ্রীহরি এসে দেখা দেন।

বসুদেব দেখলেন—কী অদ্ভুত শিশু।

"নবীন জলদ শ্যাম কিবা মনোহর।
পীতাম্বর পরিহিত অতীব সুন্দর ॥
চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীমা নারায়ণ।
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বদন ॥
চন্দ্রমুখে কিবা শোভা বঙ্কিম নয়ন।
বক্ষেতে বিরাজে আহা শ্রীবৎস লাঞ্ছন ॥"

বসুদেব ও দেবকী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শিশুর স্তব করতে লাগলেন। এ শিশু যে স্বয়ং ভগবান তা বুঝতে বাকী রইল না।

বসুদেব এবং দেবকী শিশুকে বললেন—আপনার ঐ অলৌকিক রূপ ত্যাগ করুন। তা না হলে কংস আপনাকে চিনতে পারবে। আর কেনইবা আপনার এমন রূপ—তা বলুন !

অন্তর্যামী শ্রীহরি সবই বুঝলেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে তাঁদের পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—পূর্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমরা পৃশ্নি ও সুতপা নামে পরিচিত ছিলে। তোমাদের কঠোর তপস্যায় আমি এইরূপ চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছিলাম। সেদিন তোমরা বরও চেয়েছিলে। আমি অভীষ্ট বরদানেও খুশী করালাম তোমাদের। তোমরা প্রার্থনা করেছিলে আমার মত পুত্র। আমি তখন জন্মগ্রহণ করে পৃশ্নিপুত্র নামে পরিচিত হয়েছিলাম। তোমরাই আবার পরজন্মে কশ্যপ ও অদিতিরূপে বামনরূপী ভগবানের বাবা-মা হয়েছিলে। আবার এ জন্মে তোমাদেরকে পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হয়েছি। আমার এরূপ না দেখলে তোমরা মনুষ্যরূপ দেখে চিনতে পারতে না। তাই আমাকে পুত্র ভাবেই হোক আর ব্রহ্মভাবেই হোক, নিরন্তর চিন্তা করতে করতে আমার প্রতি আসক্ত হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হও।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ সর্বশঃ ॥

যে ব্যক্তি আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি সেই ভক্তকে সেভাবেই গ্রহণ করি। আমাকে সখা হিসাবে—পুত্র হিসাবে কেউ যদি ভজনা করে এবং ভালবাসে তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর অধীন হয়ে পড়ি। তার প্রেম ভক্তিডোরে আমি বাঁধা হই। আমি ভক্তের একান্ত আপনজন হতে আকাঙ্খা করি। অতএব মনের মধ্যে দীনতা হীনতা না রেখে আমার সাথে পরমাত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর।

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সেভাবে ভজি এ মোর স্বভাব ॥

চতুর্থ অধ্যায়

● বসুদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে আনয়ন ●

আমারে রাখিয়া এসো নন্দের আগারে
যশোদা কন্যারে তুমি আনিবে অচিরে ॥
এতকহি নারায়ণ হল অন্তর্ধান।
কালোরূপ আলো করে শিশু মতিমান ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীহরি তাঁর মাতাপিতাকে আপন জন্মকথা বলে নীরব হলেন। ঐশ্বর্যরূপ সংবরণ করে পড়ে রইলেন মানবশিশুর মতই। কিন্তু বসুদেবকে চিন্তান্বিত দেখে পুনরায় বললেন—পিতা, আমাকে অবিলম্বেই নন্দরাজার আলয়ে রেখে এস। যশোদা মায়ের কন্যাকে বিনিময় করে নিয়ে আসবে।

এই কথা বলেই শিশু নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। স্তম্ভিত হলেন বসুদেব আর দৈবকী। তাঁকে তুলে ধরার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠলেন মাতা। কিন্তু তার আগেই 'বসুদেব অমনি অঙ্কে করিল তাহায়'।

ওদিকে জন্মরহিত হয়েও যোগমায়া জন্ম নিল ব্রজগৃহে। মায়াবশে স্মৃতি অবলুপ্ত হয়েছে যশোদার। তার কী হয়েছে, পুত্র না কন্যা এ জ্ঞান নেই।

এক্ষণে শ্রীভগবানের নির্দেশমত বসুদেব নিজপুত্রকে বুকে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে কারাগার থেকে বাহির হলেন। অন্ধকার পুরী। প্রহরীগণ নিদ্রিত। মায়ার প্রভাবে লৌহকপাট খুলে গেল। আর্জ শ্রীহরি নন্দালয়ে যাওয়ার জন্য উৎগ্রীব—কে রোধ করবে তাকে? যাঁর ইচ্ছাশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে আবার লয় পাচ্ছে—যে প্রচণ্ডশক্তি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ তারাকে চোখের দৃষ্টির দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে—সেই মহাশক্তির সামনে লোহার কারাগার তুচ্ছ। গভীর নিশীথে ভরা ভাদরের

তাণ্ডব নৃত্যকে অগ্রাহ্য করে বসুদেব তাই প্রাণ গোবিন্দকে আঁকড়ে নিয়ে পথ চলেছেন।

শন্ শন্ বহে বায়ু বিজলী ঘন ঘন চমকায়।
অন্ধকার মেঘ থেকে ঝরে জল মুষলধারায় ॥

আকাশ অন্ধকার। মেঘের গর্জনে ভীতির সংকেত। অবিরল ধারায় বারি বর্ষণ হচ্ছে। এই দুর্যোগময়ী রজনীতে সবার কুটীরের দ্বার বন্ধ।

প্রবল বৃষ্টিতে বসুদেবের অসুবিধা হচ্ছে—তাই অনন্তদেব কৃষ্ণসেবার সুযোগ পেয়ে সহস্র ফনা বিস্তার পূর্বক বসুদেবের সর্বাঙ্গ আবৃত করে পেছনে পেছনে গমন করতে লাগলেন। মুষলধারে বারিবর্ষনের ফলে যমুনাও উত্তাল হয়ে যেন নৃত্য করতে লেগেছে। কৃষ্ণস্পর্শলোভাতুরা যমুনা কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে যেন আনন্দে হয়ে উঠেছে উন্মাদিনী। শতসহস্র আবর্তের তরঙ্গেতে নৃত্য করতে করতে আপন মনের মদিরায় বিভোর হয়ে লাস্যময়ী নৃত্য পটীয়সীর মত অলংকারের ঝংকার তুলতে তুলতে চলেছেন মা যমুনা। তাঁর যেন আনন্দের তুলনা নেই।

কিন্তু বসুদেবের মনে বিরাট চিন্তা—চোখে ভয় ত্রস্ততার ছাপ—

'কেমনে যমুনা পার হবো!
কেমনে নন্দালয়ে যাবো!
ব্যাকুল বেগে ঝরে বারি বিজলী ঘন ঘন চমকায়,
মা যমুনা তাথৈ তাথৈ নেচে যায়।
এমনি ঘনঘোর বরষায়।

বসুদেব যমুনাপুলিনে দাঁড়িয়ে অকুলের কাণ্ডারী—শ্রীহরিকে কিভাবে পার করবেন তাই ভাবছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে যাকে পরমপুরুষ ভগবান বলে বুঝতে পেরেছিলেন সেই বসুদেব এখন পিতৃত্বের মোহে বিমূঢ় হয়ে নিখিল বিশ্বপতিকে অসহায় শিশু বলে মনে করছেন—মহাপারাবারের মহাকাণ্ডারীকে নিয়ে তিনি যমুনা পার হওয়ার জন্য হচ্ছেন ব্যাকুল। হায় ভগবান! এরই নাম বাৎসল্য প্রেম!

আর আবর্তসংকুলা—যমুনাও কলকল ছলছল কণ্ঠে যেন বলছেন—বসুদেব, মাভৈঃ! আমি পথ ছেড়ে দিচ্ছি। প্রাণ বল্লভকে আমার বক্ষের উপর নিয়ে গিয়ে আমাকে ধন্য কর।

এই কথা বলে যেন ভয়ানক আবর্তসংকুলা যমুনা পথ ছেড়ে দিলেন। না দিয়ে কি থাকতে পারে? ভগবানের যাত্রাপথ রুদ্ধ করার ক্ষমতা কার? মা যমুনার বক্ষের উপর দিয়ে ভগবান শ্রীহরি যাবেন নন্দালয়ে—এতো যমুনার মহাভাগ্য। প্রাণ গোবিন্দের পাদস্পর্শে যমুনা হল ভাগ্যবতী।

[ভাগবত ছাড়া অন্যান্য পুরাণে দেখা যায় হঠাৎ যমুনার জল শান্ত হয়ে গেল। দেবী ভগবতী শৃগালীর বেশ ধরে সেই জলের ওপর দিয়ে চলতে লাগল। তাকে অনুসরণ করে বসুদেব অনায়াসে পৌঁছলেন নন্দালয়ে আবার কৃষ্ণচরণ বক্ষে ধারণ করার জন্য যমুনার মনে যে অভিলাষ ছিল অন্তর্যামী শ্রীহরি তা জানতে পেরে হঠাৎ পিতা

বসুদেবের হাত থেকে স্খলিত হয়ে জলে পড়ে যান। যমুনা তখন শান্ত হয়ে উঠে। ব্যগ্রভাবে তুলে নেন বসুদেব।]

তারপর যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে নন্দালয়ে গিয়ে বসুদেব দেখলেন, গোপগোপেরা নিদ্রাচ্ছন্ন কিন্তু গৃহের দ্বার খোলা। তখন অতি সত্বর শিশুপুত্রকে যশোদার শয্যায় শুইয়ে রেখে তার কন্যাকে নিয়ে পুনরায় কারাগারে ফিরে এলেন। দ্বার আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কেঁদে উঠল যোগমায়া। ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রহরীদের। বুঝল নবীন শিশুর জন্ম হয়েছে। কংসের কাছে পৌঁছল সেই বার্তা।

কংস উন্মত্ত হয়ে ছুটে গেল সেই সূতিকাগৃহে। দেবকী কাতর কণ্ঠে চাইল শিশুর প্রাণভিক্ষা। কিন্তু কংসের এতটুকু অনুকম্পা হল না। সদ্যোজাতাকে কেড়ে নিল বাহু থেকে। তারপর তাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করল সবেগে। অন্যান্যবারের মত শিশু কিন্তু এবার মরল না। মহামায়ার রূপ ধারণপূর্বক উঠে গেল আকাশে। তারপর কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলল—

শোন শোন অত্যাচারী কংস রাজা তুমি,
যাবার কালে এই কথা বলে যাই আমি।
অন্যায় যা করেছ তুমি ভাবতে তাহা হবে।
তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে—একথা জানিবে।

বসুদেব, দেবকী ও কংস চেয়ে দেখল—এক অপূর্ব দেবী ঊর্ধ্বাকাশে বিরাজ করছেন। দেবী অষ্টভুজা, তিনি ধনুক, শূল, বাণ, চর্ম, অসি, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধরে আছেন। তাছাড়া নানারকম দিব্যমাল্য, বস্ত্রচন্দন ও রত্নালংকারে তিনি বিভূষিতা।

দেবীকে দর্শন করে কংসের মনে বিরাট এক চৈতন্যের উদয় হল। পূর্বের দৈববাণীকে মিথ্যা বলে মনে হল তার। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে হতে ছুটে গেল দেবকী আর বসুদেবের কাছে।

—বসুদেব আর দেবকী! তোমরা আমায় ক্ষমা করো। আমি ভুল বশতঃ তোমাদের সন্তানকে হত্যা করেছি। আমি চরম অপরাধী।

কিন্তু ক্ষমা কি করা যায়? আপন ভগ্নী আর ভগ্নীপতির উপরে কংস যে অন্যায় করেছে তার কোন ক্ষমা হতে পারে না। এ অমার্জনীয় অপরাধ। তাই তাঁরা কংসের কথায় নীরব রইলেন।

কংস সমস্ত কথা মন্ত্রীদের জানায়।

মন্ত্রিগণ মন্ত্রনা দিলো—গোকুলের সমস্ত শিশুদের অবিলম্বে হত্যা করা দরকার। তা না হলে আপনার বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্চম অধ্যায়

● গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ●

আজ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরে যে ভুবন ॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥

আজ নন্দরাজের 'কুলং পবিত্রং, যশোদা কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।' নন্দরাজের বংশ পবিত্র, যশোদা কৃতার্থা, গোকুলের ধূলি পুণ্যময় তীর্থরেণুতে পরিণত। এই আনন্দ মহারাজ নন্দকে করে খুলেছে উদার হৃদয়।

ব্রজবাসিনীরা যশোদার পুত্র হয়েছে জানতে পেরে আনন্দিতমনে বসন-ভূষণ ও অঞ্জনে সুশোভিতা হয়ে দলে দলে নন্দগৃহে আগমন করতে লাগলেন। একসুরে বেজে উঠেছে তাঁদের হাতের কাঁকন। চঞ্চল গতিতে চলার ফলে তাঁদের কবরীবন্ধন হয়ে পড়ছে শিথিল। সেই সঙ্গে গোপগণও আনন্দিত হয়ে দধি দুগ্ধ ঘৃত ও নবনী নিয়ে ছুটে আসছে। যশোদার হৃদয় পুত্রবাৎসল্যে কানায় কানায় পূর্ণ কিন্তু তাঁর নিস্তরঙ্গ প্রেমসিন্ধু স্থির ও নিশ্চল। তাঁর আনন্দের সাগরে লেশমাত্র উচ্ছ্বাস নেই।

আজ ব্রজধামে দধি দুগ্ধ ভক্ষণ করার লোক নাই—মন যেখানে শিশুর আনন্দে পরিপূর্ণ—সেখানে শরীরের ক্ষুধা অনুভব করা যায় না—গভীর শোক অথবা গাঢ় আনন্দ উভয়ই সমভাবে মানুষের দেহের ক্ষুধা ভুলিয়ে দেয়।

আজ ব্রজধামে কারও দেহবুদ্ধি নেই—সমস্ত দেহকে ঢাকা দিয়ে আত্মা যেন ছাপিয়ে উঠেছে। পথিপার্শ্ব পাখিদের কলতানে মুখরিত। যেন এক নতুন পৃথিবীর সু সূচনায় জগৎ দিশেহারা। অলির গুঞ্জরণে মোহমুগ্ধ বর্ষার সকাল। ময়ূর-ময়ূরীগণ আনন্দে নাচছে পেখম তুলে। কেতকী-কদম আর যূথিকার বন্যায় পরিপ্লাবিত দিগাঙ্গণ। দলে দলে লোক আসছে ঐ অসাধারণ রূপসম্পন্ন শিশুকে দেখতে।

দূরে মহাশূন্য থেকে ভেসে আসে মাদলের ধ্বনি। চারিদিকে মিষ্টান্ন ভোজনের পর্ব। আজ কী আনন্দ ব্রজপুরে নন্দের আগারে! নন্দমহারাজ মহানন্দে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে ব্রাহ্মণদের প্রচুর বস্ত্র-অলংকার আর গোদান করলেন। সূত, বন্দী ও শিল্পীগণকেও বস্ত্রালংকার দান করলেন অকাতরে। আনন্দে গোপগণ—দধি-দুগ্ধ, ঘৃত এবং জল ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল পরস্পরের দিকে। নন্দালয় লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডারে হয়ে উঠল পরিপূর্ণ। যেন আনন্দের সায়রে বহে যাচ্ছিল উচ্ছ্বাসের হিল্লোল। আনন্দময়ের আবির্ভাবে চারিদিকে যেন আনন্দের সাগর উথলে পড়ছে! আর থেমে থাকতে পারছেন না মা যশোদা···যেন কোন ঋতুরাজের মাতাল আহ্বানে তাঁর অন্তরের কোণে কোণে হারানো ফাগুনের উৎসব রাগের আলোর মালা জ্বলে

উঠল…তাঁর চিরপিয়াসী অন্তরদুয়ারে শতবসন্ত যেন জয়গান গেয়ে উঠল কি এক পাগল করা উম্মাদনা নিয়ে! তাইতো আনন্দে অধীর হয়ে বলছেন তাঁর স্বামীকে—

ওগো নাথ! আজ আমার বুকটা কেন এভাবে আকুল হয়ে উঠছে। এ বাছাকে কোলে নিয়ে আমি কেন এত সুখ পাচ্ছি? এমন সুখ কি মর্ত্ত্যের মানুষের ভাগ্যে লাভ হয়? এই শিশুর আগমনে ব্রজধামে এত আনন্দের জোয়ার বইছে কেন? কেন এত পুলকের রোমাঞ্চ? তারপর প্রাণ গোবিন্দকে কোলে নিয়ে চুম্বন করতে করতে বলতে লাগলেন—

ওরে খোকা, তুই কে—আমার ঘর আলো করতে এসেছিস? তোকে কোলে পেয়ে আমি আজ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচছি। মনে হয় কত জন্মজন্মান্তর ধরে তোকে বুকে পেয়ে আসছি—তুই আমার চিরদিনের নয়নমনি হয়ে থাক। খোকা—

মনের বাঁধন শিথিল করে এসেছিস মোর ঘরে।
যতই হেরি তোর ঐ মুখ, নয়ন নাহি ভরে॥
সোনার মানিক পরাণপুতুল মিষ্টি তোর ঐ হাসি।
বল না আমায় ওরে খোকন কি দয়ে ভালবাসি॥
তোরে ভালবেসে আমি কাটাব এ জীবন।
আজি ধন্য হল মাতৃহৃদয় পূর্ণ আমার মন॥

আনন্দ সোহাগে চুম্বন করতে করতে চোখে জল আসে যশোদার। প্রাণের পুত্র চক্ষু মিলে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মায়ের পানে।

একদিনের ছেলের একি চাহনি! বিস্ময়ে পুলকিত হন মা জননী। অবাক হয়ে ভাবেন প্রতিবেশীরাও। সবাই যেন সেই অপরূপ সুন্দর সন্তানটিকে কোলে নেওয়ার জন্য হয়ে উঠেন ব্যাগ্র। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অজানা-অচেনা মানুষেও ভেঙে পড়ে নন্দের আলয়ে।

এত লোক খবর পেল কি করে?—ভাবছেন নন্দরাজা। আবার একদিনের এতটুকু বাচ্চা ছেলে সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কেন? মাথা গুলিয়ে যায় পিতা নন্দের। মা যশোদা পিতা নন্দ ভেবে ভেবে হয়ে উঠেন সারা। আর তাঁদের সেই ভাবনা দেখে ব্রজধামের আকাশ বাতাস আর প্রকৃতি প্রেমে পাগলপারা। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসে সুমধুর সংগীতের আওয়াজ। ভেসে আসে কাদের যেন নূপুর নিক্কনের শব্দ। সূর্যের কিরণের সাথে সাথে যেন নেমে আসে দেবতাদের রথ। স্বর্গের আঙিনায় অপ্সরাদের রিনিঝিনি আবেশ। আকাশ ভরা ছিন্নমেঘের লুকোচুরি খেলার ফাঁকে আলোর বন্যা প্লাবিত করে সারা ব্রজধামকে। আর নতুন শিশুর মিঠে হাসি মুক্তাধারার মত ঝরে পড়ে নন্দের আলয়ে। মেঘরূপসীরা সকাল থেকেই রিমঝিমে বৃষ্টির নীরব কাঁদুনি বন্ধ করে খোকার মদির পুলক স্পর্শ লাভের জন্য আসে ছুটে। স্বর্গ থেকে শোনা যায় দুন্দুভির তালেতালে দেবতাদের নৃত্যের পদঝংকার আর আনন্দের ধ্বনি। সেই আনন্দ দেখে আমার মনও বিগলিত হয়ে বলে—

আজ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
সুমধুর হরিধ্বনিতে ভরে ত্রিভুবন ।।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ আনন্দ পাইয়া ।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

● পুতনাবধ ●

অবিরাম যেইজন কৃষ্ণগুণ গায়।
অন্তকালে মোক্ষপদ সেইজন পায় ।।

আজ আমাদের প্রাণনাথের বয়স মাত্র ছ'দিন। নন্দ গরুর গাড়ীতে চড়ে মথুরা থেকে ফিরছেন গোকুলে। মনে তাঁর বিষণ্ণতার ভাব। পুত্রের জন্য মন চঞ্চল। স্নেহের স্বভাবই এই অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

ওদিকে কংস প্রেরিত পুতনা রাক্ষসী সারা গোকুলে তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরদিন কংস মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে স্থির করেছিল যে মথুরা ও ব্রজমন্ডলে দশদিনের মধ্যে সমস্ত নবজাতকদের হত্যা করতে হবে। এইরূপ ভেবে পুতনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল গোকুলে। ছদ্মবেশে বেরিয়েছে পুতনা।

অসাধারণ উদ্ভিন্নযৌবনা মমতাময়ী মায়ের রূপ ধারণ করে পুতনা উপস্থিত হয়েছে নন্দালয়ে। তার ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদামে রচিত বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বমান। কেশের চারিদিকে মল্লিকার মালা। ক্ষীণ কটিদেশে স্বর্ণখচিত মেখলা। মুখে অপূর্ব হাসির ঝিলিক—তা তাম্বুলরাগে রঞ্জিত।

তখন গভীর রাত্রি। বর্ষাকালীন নৈশপ্রকৃতি নিস্তব্ধ। সাড়া নেই—শব্দ নেই—প্রকৃতিতে থমথমে ভাব। মাঝে মাঝে দু একটা রাত্রিচর পাখীর ডাক যাচ্ছে শোনা। ঘুমন্তপাখীদের পাখা নাড়ানোর শব্দও আসছে কানে। মাথার উপর জ্বলছে অসংখ্য জোনাকীর দীপ। অনন্ত আকাশ যেন লক্ষ লক্ষ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে থমথমে বসুন্ধরার পানে। বুঝিবা নন্দালয়ে কৃষ্ণকে পাহারা দেওয়ার জন্য সে আজ নিযুক্ত।

নন্দনন্দন শুয়ে আছে যশোদার গৃহে। দুগ্ধফেননিভ শয্যায়। যশোদা আর রোহিণী উভয়ে তখনো শয্যাপার্শ্বে জাগ্রত।

গোপরাজ নন্দ করপ্রদানের জন্য মথুরায় এলে কংস তার মুখে শুনল যে নন্দের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তাই কংস বিশেষ চক্রান্ত বশতঃ পুতনাকে পাঠিয়েছিল নন্দালয়ে।

কত নরনারীইতো আজ ছ'দিন ধরে স্রোতের মত নবজাতককে দেখ্‌তে আসছে। এই নারী হয়ত দূরতম পথ অতিক্রম করে এসেছে—তাই এর এত রাত্রি হয়েছে। যশোদার মনে নেই কোনরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ। বরং যেন একটা অখন্ড মহান মাতৃত্বের গৌরব তার মনকে করেছে অধিকার। সেই অধিকারের গর্বে নন্দরাণী আরও গরবিণী।

যশোদা ও রোহিণী অবাক হয়ে সেই সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় শিশুকৃষ্ণ সেই অপরিচিতা নারীকে দেখে চক্ষু নিমীলিত করল। তখন পূতনা বলল—

—কি গো মা, তোমার মানিক আমাকে দেখে চোখ বন্ধ করল কেন? বাঃ কী ফুটফুটে চমৎকার শিশু! এমন পুত্রকে গর্ভে ধরে তোমার জীবন সার্থক হলো মা যশোদা! একথা বলেই সে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিল।

যশোদা বলেছিলেন—এসবই তোমাদের আশীর্বাদ। আমার মাণিককে আশীর্বাদ কর—এ যেন বেঁচে থাকে। আমি শুধু ওর বেঁচে থাকার আশীর্বাদ চাই।

* * * * *

শিশুকৃষ্ণ পূতনাকে দেখে চোখ বন্ধ করেছিল তিনটি কারণে। প্রথমতঃ পূতনার কলুষিত মুখ দেখতে রাজী নয় কৃষ্ণ। দ্বিতীয়তঃ অপরিচিতাকে দেখে বোধ হয় ভয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত করেছিল। তৃতীয়তঃ পূতনার সাথে চোখা চোখি হলে পূতনার ছদ্মবেশ খুলে যেতে পারে—ফলে সে আর বধ হবে না।

পূতনা শিশুকে কোলে তুলে তার মুখে স্তন প্রদান করল। আর সেই শিশু ক্রুদ্ধ হয়ে স্তনটিকে দুহাতে জোর করে ধরে স্তন্যদুগ্ধের সহিত পূতনার প্রাণশক্তিকে করতে লাগল হরণ।

ছ'দিনের ছেলে। দাঁত নাই। কতটুকুই বা তার শক্তি! সেই স্তন্যপানের ফলে তথাপি পূতনা যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চীৎকার করতে লাগল—'মুঞ্চ মুঞ্চ' 'অলং'—ছাড়ু ছাড়ু। পূতনা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি যেন ঠিকরে বের হয়ে আসছে। যন্ত্রণায় হাত পা ছুঁড়ছে।

মা যশোদা আর রোহিনী বিস্ময়ে নির্বাক।

পূতনা তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শিশুকে ছেড়ে দেবার প্রবল চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই শিশুর দেহে অযুত হস্তীর শক্তি। তখন পূতনা নিজমূর্তি ধারণ করে অতিকষ্টে আকাশপথে উড়ে গিয়ে ব্রজধামের সীমানার মধ্যেই প্রাণশূন্য হয়ে পতিত হল। কৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিলাভ করল পূতনা। তাঁরই কৃপায় তার মৃতদেহ স্থান লাভ করল ব্রজধামেই। মানবজীবনে এইরূপই হয়। সারাজীবন কলকাতায় বাস করে কেউ কাশীতে মৃত্যুবরণ করল। কেউ বা দীর্ঘকাল বৃন্দবনে বাস করে সাধন ভজন সত্ত্বেও পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দূরের কোন এক অচেনা অজানা গাঁয়ে প্রাণত্যাগ করল। তীর্থভূমি তাকে স্থান দিল না। কেউবা বাল্যকাল থেকে অবিরাম ভগবৎ নাম স্মরণ করছেন—দেশবিদেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত। কিন্তু মৃত্যুকালে

হয়ত দিনের পর দিন তিনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। গলা দিয়ে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত না হয়ে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছে।

এ সবই শ্রীকৃষ্ণের লীলা।

কিন্তু রাক্ষসীর স্বরূপ বের হল কেন? অন্তরের অশুদ্ধি নিয়ে কেউ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি কখনও ছিন্নকন্থা পরিধান করে পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করতে পারবেন না। তাঁকে প্রকাণ্ড আশ্রম স্থাপন করে গৈরিক রাগরঞ্জিত কোট, গরদের পাকড়ী ধারণ পূর্বক মোটর বাসে ভ্রমণ করতে হবে। কৃষ্ণের সেবাকার্য স্থায়ীভাবে চালানোর জন্য সেইসব ব্যক্তিকে 'হরেকৃষ্ণ' বলে আদালতে কিংবা বিচারালয়ে কিংবা জন সমাবেশে প্রবেশ করতে হবে। পুতনা মাতৃভাবের এই অভিনয় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ছলনা, ছদ্মবেশ, ছদ্মধ্বনি জীবিতকালে খ্যাতি অর্জন করিয়ে দেয় কিন্তু মৃত্যুকালকে ঠকিয়ে যায়।

নন্দালয়ে পড়ে গেল হাহাকার। চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন মা যশোদা। গোপগোপীগণ ইতঃস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর পুতনার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হয়ে শিশু কৃষ্ণকে নিরাপদ দেখে মা পরম তৃপ্তিলাভ করলেন। পুতনার সেই পর্বতপ্রমাণ দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করা হল। শ্রীকৃষ্ণস্পর্শজনিত বিশুদ্ধ মৃতদেহ থেকে অগ্নি ও ধূমের সহিত অপ্রাকৃত সুগন্ধ বের হতে লাগল। অতপর শিশুকে গৃহে নিয়ে গিয়ে মা যশোদা ও রোহিনী গোমূত্র ও গোধূলির দ্বারা স্নান করিয়ে গোময়ের দ্বারা তাঁর ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি দ্বাদশনাম লিখে তার রক্ষা বিধান করলেন।

এমন সময় নন্দ এসে পৌঁছলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পুত্রকে নিলেন কোলে। ছেলের মুখের পানে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। উভয়ের মধ্যে যেন হয়ে গেল একটা অভুতপূর্ব দৃষ্টি বিনিময়। এই দৃষ্টির মর্মার্থ বর্ণনা করার ভাষা বুঝি সৃষ্টির অভিধানে পাওয়া যাবে না।

তিন মাস গেল কেটে। মা যশোদা গৃহকর্মে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে কোমল শয্যায় শুয়ে স্তন্যপান করার জন্য কাঁদছে।

এমন সময় কংস কর্তৃক প্রেরিত শকটাসুর মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ভাবে শকট মধ্যে প্রবেশ করে নন্দনন্দনকে চেপে ধরার ইচ্ছা করল।

তখন বালক কৃষ্ণের সে কী ভয়ঙ্কর রূপ! কী প্রচণ্ড শক্তি! সারা শরীর মুহূর্তের মধ্যে বিরাট আকৃতি ধারণ করে সুদৃঢ় পদ সঞ্চালন দ্বারা শকটকে ভেঙে শকটাসুরকে করলো হত্যা। চীৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে এলেন লোকজন। শকটাসুরকে মৃতবৎ দেখে স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে সাধারণ শিশুর মতই দেখতে পেলেন।

এরপর শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন একবছর তখন একদা যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে স্তন্যদান ও মুখ চুম্বন করছিলেন। এমন সময় অনুভব করলেন, শিশু কৃষ্ণ যেন পর্বতের ন্যায় ভারী হয়ে উঠছে। তাকে আর কোলে রাখতে পারছেন না। মাতা শিশুটিকে মাটির উপর রেখে দিয়েছেন—এমন সময় তৃণাবর্ত্ত নামে এক দৈত্য দুরন্ত

ঘূর্ণির রূপে সমগ্র ব্রজধামকে ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন করে দিয়ে সবার অগোচরে বালককে অপহরণ করল।

পুত্র বিয়োগে মাতা মূর্চ্ছিত হলেন।

তৃণাবর্ত্ত কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না। শিশু তার গলদেশ এমন ভাবে চেপে ধরল যে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জোর শব্দে মাটিতে পড়ে প্রাণত্যাগ করল।

সেই শব্দে যশোদার মূর্চ্ছা গেল ভেঙে। অসুরের বুকের উপর শিশুকে দেখে ছুটে গেলেন মা। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি যেন কত যুগযুগান্তর পেরিয়ে গেছেন। প্রাণের কানাই যেন কোন অজানা অচেনা দেশ থেকে ফিরে এসেছে তাঁর ব্যথাতুর বুকে।

একদা আদর করে তিনি স্তন্য পান করাচ্ছিলেন প্রাণের মাণিককে। এমন সময় সেই মানিক মুখ বিস্তার করল। বিস্মিত হয়ে যশোদা দেখলেন—পুত্রের মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, জ্যোতিমণ্ডল, দ্বীপ-পর্বত এমনকি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণী অবস্থিত।

এটি শ্রীকৃষ্ণদেহে যশোদার প্রথম বিশ্বরূপ দর্শন। যশোদা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। ভাবছেন, হয়ত তাঁর নিজেরই মাথা ঘুরাচ্ছে—তাই এরকম মনে হচ্ছে। আবার ভাবছেন হয়ত সেটা তাঁর পুত্রের কোন এক ব্যাধির লক্ষণ।

অথচ কোনমতেই পুত্রকে পরম পুরুষ বলে মনে করছেন না।

সপ্তম অধ্যায়

● গর্গমুনি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ●

সত্যযুগে শুক্ল তিনি ত্রেতায় রক্তবর্ণ
দ্বাপরে জন্মিলেন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ॥
সেই হেতু 'কৃষ্ণ' নাম শ্রীহরির হল।
বড় মধুর এই নাম সদা কৃষ্ণ বল ॥

একদিন পুরোহিত (যদুবংশের) গর্গমুনি বসুদেবের অনুরোধে নন্দরাজের ব্রজধামে উপস্থিত হন। নন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন—আমার পুত্রদ্বয়ের নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করুন।

রোহিনীপুত্র বলরাম শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আজ তার বয়স তিন মাস আঠার দিন। শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর বয়স এখন তিন মাস দশদিন।

গর্গমুনি নানাবিধ জ্যোতিষশাস্ত্র নাড়াচাড়া করে বললেন—রোহিনীপুত্র স্বীয় গুণের দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে আনন্দদান করবেন, সুতরাং ইনি পরিচিত হবেন রাম নামে। শুধু তাই নয়, ইনি আবার অমিত বলশালীও হবেন। তাই 'বল' নামেও খ্যাতিলাভ করবেন। এখন এঁর নাম রাখা হোক বলরাম। তারপর দ্বিতীয় পুত্রটি

সম্পর্কে গর্গ বললেন—হে নন্দ, তোমার এই পুত্র সত্য-ত্রেতাদি যুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছেন। তাই এর নাম হবে কৃষ্ণ।

আসন্‌ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

অষ্টম অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ ও যশোদার দ্বিতীয়বার বিশ্বরূপ দর্শন ●

জীবের জীবন তিনি কৃষ্ণ বিশ্বময়।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র যে রয়॥
বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত তিনি খ্যাত চরাচরে।
কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই এই সংসারে॥

নন্দালয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ক্রমে বড় হয়ে উঠছে। হামাগুড়ি দিচ্ছে। পা-পা হাঁটি হাঁটি করে হাঁটতেও লেগেছে। বড়টির চেয়ে ছোটটি আরো বেশী চঞ্চল। বালক কৃষ্ণের উৎপাতে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ। যশোদার আদুরে গোপাল গো দহন করার পূর্বেই খুলে দেয় বাছুরগুলিকে। পরের বাড়ী থেকেও সে দধি দুগ্ধ চুরি করে খায়।

একদা বলরাম ও গোপবালকগণ খেলা করতে করতে এসে যশোদাকে জানাল যে, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। কৃষ্ণ বলছে—না মা, আমি মাটি খাইনি, ওরা মিথ্যা বলছে। তুমি আমার মুখের ভেতরটা দেখ। তাহলেই বুঝতে পারবে।

অন্যান্য বালকেরা পুনরায় বলছে—না গো মা যশোদা, গোপাল ননী না খেয়ে মাটি খেয়েছে। হয়ত অসুখ বিসুখ হবে।

কথা শুনে যশোদা মা রেগে গিয়ে লাঠি নিয়ে শাসন করতে উদ্যত হন গোপালকে। গোপালের কোন কথাই শুনছেন না।

তাই পরম পুরুষ আজ বড়ই বিপদগ্রস্ত। চারিদিকে সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। কেউ তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে না। হয়ত কোন বিষয়মাটি লোলুপ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের শাসন দেখে হাসছে, মনে মনে বলছে—বেশ হয়েছে প্রভু, আমরা যখন বিষয়মাটির মোহে আচ্ছন্ন থাকি তুমি তখন হাস। আজ আমরা হাসছি।

যশোদা বললেন—যদি মাটি নাই খাস—তা হলে সত্যই হাঁ কর দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ তখন অক্লেশে মুখ বিস্তার করল। মা গভীর আগ্রহে বালকের কচি কচি দাঁত ও মুখের ভেতর লক্ষ্য করলেন।

অদ্ভুত ব্যাপার। আবার সেই ঘটনা। তার মুখের মধ্যে দেখা গেল বিশ্বরূপ।

ঐটুকু মুখের মধ্যে চন্দ্র সূর্যের জ্যোতি—সাত সমুদ্রের কল্লোল—গ্রহনক্ষত্রের উঁকি ঝুঁকি, আকাশ পৃথিবীর মিলন—মানুষের কোলাহলপূর্ণ অপার সৌন্দর্য্য। এ যেন অযাচিত—অপ্রত্যাশিত বিশ্বরূপ দর্শন।

যশোদা ভাবছেন—একি স্বপ্ন না সত্যি! একি আলোর বন্যা না অন্ধকারের ইঙ্গিত? একি মায়ার ঐশ্বর্য না প্রলয়ের কল্লোল?

সব যেন কেমন হয়ে গেল মায়ের! ভাবছেন—একি তবে সত্যই পরম পুরুষ! না এ আমার মতিভ্রম! পরপর দুবার একই ঐশ্বর্য দেখছি কেন? এ নিশ্চয়ই ভগবান! কিন্তু আমার পুত্রকে আমি প্রাণের গোপাল বলেই জানি।

একথা ভেবে মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করে। পরম তৃপ্তিতে মায়ের হৃদয় যায় ভরে।

শুধু পিতা মাতা নয়, প্রতিবেশীদের অন্তরে পরম প্রীতি সঞ্চয় করে আত্মভোলা স্নেহে আর প্রাণঢালা আদরে মায়ের কোলে গোপাল বড় হতে লাগল দিনের পর দিন।

নবম অধ্যায়

● যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন ●

প্রাণের গোপাল আমার গোলোকের হরি।
তোরে পেয়ে হৃদয়খানি গেল যে মোর ভরি॥
থাকরে বুকে স্নেহের মানিক বড় আদরের ধন।
তোরে পেয়ে ধন্য হোল আমার এ জীবন॥

নন্দরাণী দধি মন্থন করছেন আর গাইছেন কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্পর্কিত গান। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীগণের মধ্যে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে গ্রাম্যচারণগণও নন্দপুত্রের বাল্যলীলা অধিকার করে ছোট্ট ছোট্ট গান রচনা করেছিল এক্ষণে যশোদা কখনো জোরে জোরে মন্থন দণ্ড টানছে আবার কখনো বা ধীরে ধীরে টানছে আর তারই তালে তালে বাজছে তার হাতের কাঁকন। মুখে ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কবরী থেকে খসে পড়েছে মালতীর মালা। দুলছে কানের কুণ্ডল। যশোদার হাতে কৃষ্ণসেবার কাজ। মুখে কৃষ্ণগান আর মনে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ।

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ ছুটে এসে মন্থনদণ্ড ধরে মায়ের কাজ থামিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে তার কোলে উঠে স্তন্যপান করতে লাগল। এদিকে উনুনের উপর দুধের কড়া উৎরে গেলে যশোদা তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে উনুনের দিকে ছুটে গেল। বালক গোপাল তখন রাগে চীৎকার করতে করতে একখণ্ড পাথরের টুকরো দিয়ে দধিমন্থন ভাণ্ডটি ভেঙে দিয়ে নিকটবর্ত্তী একটি ঘরে ঢুকে নির্জনে ননী চুরি করে খেতে লাগল।

যশোদা এসে সমস্ত ব্যাপার দেখে পুত্রকে খুঁজতে খুঁজতে একটি ঘরে গিয়ে দেখেন যে তাঁর পুত্র গোপাল কয়েকজন সঙ্গীদের পিঠের উপর চড়ে আনন্দে ননী খাচ্ছে আর তাদেরকে দিচ্ছে।

মাতা তখন একটা ছড়ি নিয়ে যেই তাকে প্রহার করতে যাবার উদ্যোগ করেছে, অমনি গোপাল একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে মারল ছুট। মাও ছুটতে লাগলেন তার পিছনে পিছনে। ছুটছে গোপাল—ছুটছেন মা যশোদা।

বৃহৎ নিতম্বভারে গলদঘর্ম যশোদা পুত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে পারছেন না ছুটতে। তারপর বহুকষ্টে ধরে ফেললেন। নিরুপায় বালক তখন কাঁদছে। রগড়াচ্ছে চোখ। চোখের কাজল হাতে মুখে পড়েছে ছড়িয়ে। ভয়ে ভয়ে মায়ের পানে একবার তাকাচ্ছে আর একবার চোখ বুজোচ্ছে। মা বেত হস্তে করছেন তিরস্কার।

হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ ঘসতে ঘসতে আধো ঢাকা—আধো খোলা করে কেঁদে লাল হওয়া চোখের এককোণ দিয়ে মা যশোদার দিকে তাকানোই বা কেমন—তা কে জানে!

যশোদামায়ের কী বিরাট ভাগ্য—স্বয়ং ঈশ্বরকে শাসন করছেন। যাঁর শাসনের ভয়ে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা তাদের নির্দিষ্ট কাজ যথারীতি করে চলেছে, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি দেবগণ যাঁর ভয়ে দেবকার্য যথানিয়মে করছেন সম্পাদন, শিব, ব্রহ্মা যাঁর শাসন মেনে চলেছেন অবনত মস্তকে, মৃত্যুরাজ যমও যাঁর ভয়ে ভীত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর অনুশাসনে ও নিয়ন্ত্রণে চালিত, অখিলবিশ্বের নিয়ন্তা সেই ভব ভয়হারী মুকুন্দ-মুরারী আজ তোমার গোপাল। তাকে তুমি করছ শাসন, ওগো ভাগ্যবতী মা যশোদা, ঐ রকম পুত্রকে পেয়ে আজ তোমার জন্ম সার্থক। তোমার পায়ের ধুলো আমাকে একটু দাও! তুমি ওকে মেরো না মা, তার চেয়ে বরং আমাকে শাস্তি দাও, ওঁর হয়ে আমি পিঠ বাড়িয়ে দিচ্ছি।

মা যশোদা বুঝলেন—গোপালকে আর ভয় দেখানো উচিৎ নয়। এই ভেবে বেতটি ফেলে দিয়ে পুত্রকে রজ্জু দ্বারা বাঁধতে ইচ্ছা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র দু'বছর।

যাঁর আদি নেই—অন্ত নেই—ভেতর নেই-বাহির নেই, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওত-প্রোতভাবে আচ্ছন্ন করে তাঁর অন্তরে বাইরে বিরাজিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর স্বরূপের কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ—বাৎসল্য প্রেমময়ী যশোদা সেই জ্ঞানাতীত পরমব্রহ্মকে নিজপুত্র-জ্ঞানে বাঁধতে লাগলেন। তবে দড়ি দিয়ে নয়, মাথার ফিতে দিয়ে।

দড়ি দিয়ে বাঁধলে বাছার কোমল অঙ্গে খুব লাগবে—তাই মমতাময়ী মা ফিতে দিয়ে বাঁধতে লাগলেন গোপালকে। কিন্তু কোন মতেই বাঁধতে পারছেন না! ফিতার পর ফিতা দেওয়া হল। কিন্তু সবসময় দু'আঙুল ফিতে কম পড়তে লাগল।

দুরন্ত বালক ছটফট করছে—বাধা দিচ্ছে—পালানোর চেষ্টা করছে। মা ঘেমে যাচ্ছেন। হয়ে উঠছেন ব্যাকুল। প্রাসাদে যত ফিতে ছিল পরপর যোগ করেও বাঁধা গেল না গোপালকে। তা দেখে গোপাল স্বেচ্ছায় মেনে নিল বন্ধন।

তাই ব্যাকুলতার দ্বারাই আমাদের কৃষ্ণকৃপা লাভ করতে হবে। মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা আর ব্যগ্রতার দ্বারাই গোপাল বন্ধন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলা—দামবন্ধন লীলা নামে পরিচিত। দাম অর্থাৎ ফিতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদরে বাঁধা হয়েছিল বলে ত্রিভুবনে তিনি দামোদর নামে পরিচিত।

দশম অধ্যায়

● নলকুবর ও মণিগ্রীব উদ্ধার ●

মুক্তির দাতা তুমি ওগো নারায়ণ।
দেখা দাও দেখা দাও অখিল কারণ।
নলকুবর মণিগ্রীবে উদ্ধারিলে যথা।
আমাকে সংসার থেকে মুক্তি কর তথা॥

শ্রীশুকদেব দামবন্ধন লীলার পর যমলার্জ্জুন ভঞ্জন কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। শ্রীশুকদেব বললেন—নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুটি পুত্র ছিল। তারা ছিল অতিশয় গর্বিত ও অহংকারী। সর্বদা মদিরা পান পূর্বক পুষ্পিত বনবীথিকার ধারে রমনীগণের সহিত বিহার করত। তাছাড়া ধনমদ, বিদ্যামদ, আভিজাত্যমদ ও বারুণীমদে তারা সর্বদা থাকত উন্মত্ত।

একদিন ঘটল এক ঘটনা। সেদিন তারা মন্দাকিনীর জলমধ্যে অবগাহন করে যুবতীগণের সাথে জলক্রীড়া করছিল, এমন সময় দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে হরি-গুণগান করতে করতে আকাশপথ দিয়ে সেই স্থান অতিক্রম করছিলেন। নারদ লক্ষ্য করলেন তাদের। দেবর্ষিকে দেখে বিবস্ত্রা রমনীগণ লজ্জিত হল এবং ভয়ে ভক্তিতে তীরভূমি থেকে বস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তা পরিধান করল। কিন্তু উলঙ্গ সেই কুবের পুত্রদ্বয় নারদকে দেখেও কোন ভয়-লজ্জা অথবা সম্ভ্রমের পরিচয় দিল না।

এটাই স্বাভাবিক যে ইন্দ্রিয়ভোগে ডুবে থাকলে পুরুষ একেবারে উন্মত্ত হয়ে পড়ে, মেয়েরা কিন্তু একেবারে চৈতন্য হারিয়ে ফেলে না।

'কামাতুরানাং ন ভয়ং ন লজ্জা'।

স্ত্রীলোকেরা শক্তিমান পুরুষের অধীন; তারা পুরুষদের ইন্দ্রিয়ভোগের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তারা ভেতরের চৈতন্যটুকু হারিয়ে ফেলে না। তারা পুরুষকে শরীর দিলেও সবসময় মন দেয় না। কিন্তু পুরুষ যখন কামান্ধ হয় তখন আপনার আর্থিক অবস্থা, সমাজের নিয়ম, আত্মার অধোগতি কিছুই সে মনে রাখে না। তখন তার জীবনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বিধিমতে বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ব্যবহারেও পুরুষদের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। অনেক পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করেছে, লালন পালন করার ক্ষমতা নেই, তথাপি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। উন্মত্ত মানুষ চোখবুজে নিজের ধ্বংসের মুখে ছুটে যাচ্ছে। পুত্র কন্যাগণকে ভবিষ্যতের ভিক্ষুক করে রেখে যাচ্ছে। তথাপি চিত্ত সংযম নেই—

নেই বিবেকবুদ্ধি। অপরিমিত ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা স্ত্রীলোকের স্বভাব নয়—এটা পুরুষের দুর্বলতা, তাই সেদিন নারদের সামনে মন্দাকিনী বিহারিণী নারীদের লজ্জা হয়েছিল। কিন্তু নলকুবর আর মণিগ্রীব তখন নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়েছিল।

এই দৃশ্য দেখে অন্তর্যামী নারদ উলঙ্গ নারীদের অভিশাপ না দিয়ে বরং উলঙ্গ কুবের পুত্রদ্বয়কে বললেন—হে কুবের পুত্রদ্বয়, যেহেতু নির্লজ্জের মত আমার সামনে উলঙ্গ অবস্থায় জড়বৎ দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেইজন্য তোমরা অবিলম্বেই জড়ের মত বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্ত হও। তবে বৃক্ষযোনিতেও তোমাদের পূর্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। ছত্রিশহাজার বছর বৃক্ষযোনি ভ্রমণ করে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিলাভ করবে এবং পুনরায় দেবদেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হবে।

এটা অভিশাপ নয়—দেবর্ষির কৃপা। কুবের পুত্রদ্বয় চিরদিনই পাপ করত ক্রমে তাদের অধোগতি হত। কিন্তু তাদেরকে বৃক্ষে পরিণত করে দেবর্ষি তাদের পাপের পথ রোধ করে দিলেন এবং বৃক্ষযোনিতেও কৃষ্ণদর্শন হবে—একথা বলে তাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণ তার জন্মের পর থেকেই প্রাসাদের নিকটবর্তী প্রকাণ্ড দুটি অর্জুনগাছ দেখে-ছিলেন। গত কয়েকবার এ পৃথিবীতে এসে বৃক্ষ দুটিকে উদ্ধার করার জন্য মনের মধ্যে তার কৃপার সঞ্চার হয়নি। আজ স্বয়ং উদূখলে আবদ্ধ হয়ে বদ্ধজীবের যে কী দুঃখ তা তিনি মর্মে উপলব্ধি করছেন। নিজের বন্ধনের ভেতরে দিয়ে অনুভব কর-ছেন বদ্ধজীবের অসহায় আকুতি। তাই বুঝি তিনি উদূখলটিকে টানতে টানতে আঙিনার বাইরে গিয়ে অর্জুন বৃক্ষ দুটির দিকে ভালকরে তাকিয়ে বৃক্ষদ্বয়ের ভেতর দিয়ে যাবার জন্য উদূখলটিকে আকর্ষণ করলেন।

প্রবল আকর্ষণের ফলে বৃক্ষ দুটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে প্রচণ্ড শব্দে ভূমিতে নিপাতিত হল। তখন দুজন সিদ্ধপুরুষ "শ্রিয়া পরময়া কুকুভঃ স্ফুরন্তৌ"—উজ্জ্বল জ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাষিত করে বৃক্ষদ্বয় থেকে হলেন নির্গত। তারপর নিবেদন করলেন—

হে ভগবন্, হে সর্ব কারণের কারণ, হে পরমপুরুষ! আপনার অসীমকৃপায় আজ আমরা ধন্য। তাই প্রার্থনা করছি, আমাদের জিহ্বা যেন সর্বদাই আপনার নাম কীর্তন করে। কর্ণদ্বয় যেন অহরহ আপনার লীলাকথা শ্রবণ করে আর হস্তদ্বয় যেন আপনার সেবায় সর্বদা ব্যাপৃত থাকে। হে জনার্দন, আমাদের মন যেন সর্বদা আপনার পাদপদ্ম চিন্তা করে এবং চক্ষুদ্বয় যেন আপনার বিগ্রহ ও আপনার ভক্তগণকে দর্শন করে সার্থক হয়, আমাদের মাথা যেন আপনার নিবাসস্বরূপ এই ধরণীর ধূলিতে সর্বদাই অবনত থাকে।

বালক শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে হাত নেড়ে আশীর্বাদ করলেন। ভক্ত বন্ধন মুক্ত হল; প্রভু কিন্তু আবদ্ধ রইলেন। তাঁর বন্ধন কেউ মুক্ত করল না।

বৃক্ষপতনের শব্দ শুনে নন্দ ও গোপগণ বজ্রপাতের আশঙ্কা করে ছুটে এসে

শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে আবদ্ধ দেখে তৎক্ষনাৎ বন্ধনমুক্ত করলেন। তারপর কুবের পুত্র-দ্বয়কে দেখে হলেন বিস্মিত।

* * *

এদিকে কংস কিন্তু মহা চিন্তায় পড়েছে কোনমতেই শিশুকৃষ্ণকে বধ করতে পারছে না।, ব্রজধামে উৎপাত লাগিয়েই রেখেছে সে।

কংসের উৎপাতে তাই একদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপানন্দের আদেশানুসারে নন্দ গোকুল ত্যাগ করে কৃষ্ণকে নিয়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীসাথীরা সবাই চলেছেন শকটে চড়ে বৃন্দাবনের বনপথে। বৃন্দাবনের গাছপালা তাঁকে যেন জানাচ্ছে স্বাগত —পশুপাখী জানাচেছ শুভ অভিনন্দন আর বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস যেন দুবাহু বাড়িয়ে বৃন্দাবনচন্দ্রকে সাদরে আলিঙ্গন করতে ছুটে আসছে। দূর থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সে সংগীত—শুধু সঙ্গীত নয়, সে যেন হৃদয়ের করুণ রাগিনী।

প্রাণের গোপাল যায়রে আজি মধুর বৃন্দাবনে।
মাতা পিতার কোলে বসি চলে মোদের কালোশশী
সখাগণে পরিবৃত হয়ে ব্রজধামে॥
কিবা শোভা মনোলোভা চলেরে গোপাল
গোকুল মলিন করি ব্রজের দুলাল,
রাঙাতে ঐ বৃন্দাবন হরিতে গোপীর মন
শ্রীহরি চলিছে হেরো যমুনা পুলিনে।
প্রাণের গোপাল যায়রে আজ মধুর বৃন্দাবনে।

প্রায় এক বছর হল; আমাদের প্রাণগোবিন্দ বৃন্দাবনে এসেছেন। এরই মধ্যে বৃন্দাবনের বনস্থলী—পর্বত ও যমুনাপুলিন তাঁর নিকট অতি পরিচিত হয়ে উঠল। সেখানে শ্রীদাম-সুদাম-সুবল ও বসুদামকে নিয়ে তিনি মাঠে গরু চরাতে যান। মধুর মুরলী ধ্বনিতে বৃন্দাবনের মানুষ-পশুপাখী গাছপালা আর কল্লোলিনী কালিন্দী চঞ্চল হয়ে উঠে। গোবর্ধন পর্বত, লতানিকুঞ্জ সুশোভিত বন লীলাময়ের লীলারসে হয়ে উঠে আপ্লুত।

এইরূপে লীলারসে দিনগুলি কাটাতে কাটাতে একদা এক বৎসরূপী অসুর বালকগণের অনিষ্ট করার জন্য উপস্থিত হল। নিমেষেই বালক কৃষ্ণ অভিনব কৌশল দ্বারা সেই অসুরকে করলেন বধ।

অপর একদিন এক মহাবলশালী অসুর বকের রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে হঠাৎ গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ কৃষ্ণকে উদরের মধ্যে সহ্য করতে না পেরে বকাসুর তাকে উদ্গার করে ফেলল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তার দুটি ঠোঁট ধরে করে দিলেন দ্বিখণ্ডিত। ভ্রাতার মৃত্যুতে বকাসুরের কনিষ্ঠ অঘাসুর কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে

শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার চেষ্টা করতে লাগল। অঘাসুর এক বিরাট অজগরের মূর্তি ধারণ করে মুখ বিস্তারপূর্বক নিশ্চলভাবে বৃন্দাবনের বনপথে অবস্থানপূর্বক করতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা। গোবৎসসহ কৃষ্ণ গোপবালকদের সাথে সন্ধ্যায় গৃহে ফেরার সময় প্রবেশ করলেন সেই সাপের মুখে। কিন্তু কৃষ্ণকে সেই সাপ হজম করতে পারেনি।

পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণ অজগরের গলার মধ্যে গিয়ে নিজের আকৃতিকে এমনভাবে বিস্তার করলেন যে সাপ আর মুখ বন্ধ করতে পারল না। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে হল পতিত। অঘাসুরের উদরের মধ্যে মৃত গোবৎস ও বয়স্য গোপবালকগণকে নিজের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন। তারা সকলে তখন সেই অসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অঘাসুরের দেহ থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বেরিয়ে এসে কৃষ্ণের দেহে করল প্রবেশ। মুক্তি পেল অসুর। মুকুন্দনাম সার্থক হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের।

[কৃষ্ণের পাঁচ বছর বয়সের এই ঘটনাকে গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠ বর্ষ বয়সের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছিল। এর একটি কারণ আছে! পরবর্তী কাহিনীটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে।]

একাদশ অধ্যায়

● ব্রহ্মার মোহভঙ্গ ●

তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তুমি মহাকাশ।
এ ধরায় বহুরূপে তোমার প্রকাশ॥
অহংকারী ব্যক্তি সব করে যারা গর্ব।
তাদের অহং কর প্রভু তুমি সদা খর্ব॥

অঘাসুর বধ হয়েছে। গোপবালকগণ নিশ্চিন্ত। যমুনা তীরে এসে কৃষ্ণ গোপবালকগণকে বললেন—ওরে শ্রীদাম, সুবল ওরে স্তোকল, বেলা দুপুর হয়ে গেছে। বাছুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আমরা যমুনা পুলিনে গিয়ে ভোজন করি চল।

—ঠিক আছে সখা। চল তবে।

সবাই সম্মত। মাঝখানে খেতে বসেছেন কৃষ্ণ। তার চারপাশে মণ্ডলাকারে শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ অংশু, অর্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ প্রভৃতি বারজন সখা। তারপর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মণ্ডলাকারে একদল গোপবালক—তারপর আবার একদল। এভাবে পরপর অসংখ্য মণ্ডল রচনা পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রাবদ্ধ করে চক্রাকারে গোপবালকগণ উপবেশন করলেন।

কী অভুতপূর্ব পরিবেশ! কিশলয়ের সমারোহে ভরে উঠেছে বনবনান্ত। পাখীর কলতানে যমুনার শীতল সমীরণে ও পত্র পুষ্পের শিহরণে প্রকৃতি মাতোয়ারা।

এমন সময় বাছুরগুলিকে আর মাঠের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। চিন্তায় পড়ল সবাই। শ্রীকৃষ্ণ তাদের আশ্বাস দিয়ে গোবৎসগুলির অনুসন্ধানে করলেন প্রস্থান। ভোজন কালে কৃষ্ণের বামদিকের কোমরে বাঁশীটি যেমন অবস্থায় ছিল—বামকক্ষে শিঙা ও বেত্রদণ্ড যেমন ছিল - দক্ষিণ হস্তে দধিমাখা অন্নের গ্রাস যেমন ছিল সেইরূপ অবস্থাতে তিনি ধেনুগুলিকে খুঁজতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার এই মাধুর্য্য গাঢ়তর ভাবে অনুভব করার জন্য ব্রহ্মা গোবৎসগুলিকে হরণ করে এক নির্জন গিরিগুহাতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোরু অন্বেষণে গেলে ব্রহ্মা গোপবালকগণকে মায়ামুগ্ধ করে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকেও অবচেতন অবস্থায় সেই একই গিরিগুহামধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন। এইরূপে কৃষ্ণের সর্বস্বই অপহৃত হল।

শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন গোরুগুলিকে। আশে পাশে ফনীমনসার ঝাড় তাকে আমন্ত্রণ জানায়- লতাপুষ্পশোভিত ঝর্ণা তার পা দেশ ধৌত করে। মালভূমির পার্বত্য উপত্যকা গগণস্পর্শী পর্বত ঝাউ বনের স্নিগ্ধ মধুর বাতাস—বনফুলের গন্ধ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু কোন কিছুই তার ভাল লাগছে না।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে— এ সবই ব্রহ্মার কার্য বুঝতে পেরে স্বীয় অচিন্ত ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাবে উপনিষদের ব্রহ্মের মতো—'একোহহং বহুস্যামঃ'—এক অদ্বিতীয় আমি বহুরূপে লীলা করব—এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করলেন। একথা ভাবতে ভাবতে সমগ্র যমুনাপুলিন গোপবালক ও গোবৎসে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সব বৎসদেরকে নিয়ে গৃহাভিমুখে করলেন যাত্রা। যতগুলি গোবৎস ও গোপবালক ছিল, তাদের যে পরিমাণ দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোশাক পরিচ্ছদ, যষ্টি-শিঙ্গা, বাঁশি, নাম, গুণ, বয়স, আহার বিহারাদি ছিল—শ্রীকৃষ্ণ অবিকল সেই ভাবেই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' —বাক্য সার্থক হল। বাৎসল্যবতী গোপরমনীগণ প্রতিদিন দিবাবসানকালে যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণের আগমনসূচক বেণুরব শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে আজও সেইরূপ ছিলেন। সেই উৎকণ্ঠা, সেই ব্যগ্রতা, সেই আনন্দ! কিন্তু আজ একটু পার্থক্য হল—অন্যদিন ব্রজনারীগণ একে একে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে, পরে আপন পুত্রকে স্নেহচুম্বন করেন, কিন্তু আজ গোপীগণ নিজ পুত্রগণকেই প্রথমে কোলে তুলে নিলেন। গাভীগণও গোশালার অতি ছোট স্তন্যপায়ী বৎসগুলিকে পরিত্যাগ করে গোষ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ধেনুগুলির প্রতি অধিকতর স্নেহপ্রদর্শন করতে লাগল - চাটতে লাগল তাদের শরীর।

কিন্তু এমনতো কোনদিন হয়নি। দেখায়নিতো কোনদিন এমন স্নেহ! তবে কেন এমন হল! পরদিন থেকে এরূপ লক্ষণ দেখা যেতে লাগল কেন?

প্রায় একবছর অতিবাহিত হতে আর মাত্র পাঁচ ছ'দিন বাকি। বৃন্দাবনে যে এতবড় একটা স্নেহের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু বলরামের কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগে। ব্রহ্মা কর্তৃক কৃষ্ণের গোধন অপহরণের দিন বলরাম

গোষ্ঠে গমন করেন নি। সেদিন বলরামের জন্মনক্ষত্র যোগ থাকায় মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠান করার জন্য রোহিণী তাঁকে কৃষ্ণের সাথে গোষ্ঠে যেতে দেন নি। তাই ব্রহ্মার কার্য-কলাপ বলরামের অগোচরেই ছিল।

এক্ষণে বিশ্বাত্মা বাসুদেবে যেমন বলরামের স্নেহ ছিল, গোবৎস ও গোপবালক-গণের প্রতিও সেই ভালবাসা সমানভাবে জেগে উঠল। এটা কোন দৈবী মায়া কিনা তা জানতে চাইলে কৃষ্ণ সমস্ত বিষয় অবগত করিয়ে বলরামের কৌতুহল নিবৃত্ত করলেন।

একবছর কেটে গেলে ব্রহ্মা বৃন্দাবনে এসে দেখলেন যে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গোবৎসহগণসহ পূর্ববৎ বাল্যলীলা করছেন। যেখানে গোপবালক ও ধেনুদের রেখেছিলেন—তারা সেইরূপ অচেতন হয়ে আছে।

বিস্মিত হলেন ব্রহ্মা। স্থির নেত্রে নতুন গোবৎস ও গোপবালকদের দিকে চেয়ে তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারত গোপবালক ও গোবৎসগণ চতুর্ভুজ শংখচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হলেন। ব্রহ্মার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মোহিত করতে গিয়ে। তিনি নিজ মায়াজালে নিজেই বিমোহিত হয়ে পড়লেন। তারপর বিনীত ও সমাহিত চিত্ত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন।

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষ জাগসে।
কিমস্তি নাস্তিব্যপদেশ ভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ১০।১৪।১২

—হে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত, গর্ভস্থ শিশু জননীর গর্ভের ভিতর যেরূপ পদ সঞ্চালন করে, সেই পদ সঞ্চালন কি মাতার নিকট অপরাধ বলে গণ্য হয়? তুমি সমস্ত কার্য্য কারণের আধার স্বরূপ। আমি তোমার ভেতরে থেকেই অপরাধ করেছি। সুতরাং আপন জননীর মত আপন সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যঃ অক্ষরঃ অজস্র সুখঃ নিরঞ্জনঃ পূর্ণোহদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ॥ ১০।১৪।২৩

—হে ভগবন্, তুমি সত্য, নিত্য, অক্ষয়, সনাতন পুরুষ, স্বপ্রকাশ, নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ, তুলনারহিত, সর্বাত্মা, সর্বকারণস্বরূপ, সর্বদোষবর্জিত, উপাধিশূন্য ও অমৃত। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

অতঃপর ব্রহ্মা গোপীগণের সৌভাগ্য উপলব্ধি করে হৃদয়ের উচ্ছাসে বলে উঠলেন—

অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্॥

—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অবাংমনসোগোচর পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যাদের মিত্র, সেই নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই—ভাগ্যের সীমা নাই।

এইরূপে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে ব্রহ্মা অবশেষে বললেন-

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ, সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্॥ ১০।১৪।৩৯

—হে কৃষ্ণ, তুমি অখণ্ড জ্ঞানময়, তুমিই জগতের প্রভু, তুমিই জগতের আধার স্বরূপ, অনুমতি দাও প্রভু তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি সত্যলোকে ফিরে যাই।

প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে কী মিনতির ভাষা। ভক্তিরসে হাবুডুবু খাচ্ছে তার হৃদয়। ভাব স্বচ্ছ। ভাষার ছটা নেই। মধুর ছন্দ সংযোগে অতি কোমল শব্দ সমষ্টি ব্রহ্মার প্রাণের ধ্বনিটিকে ভক্তের প্রাণের ভেতর প্রতিধ্বনিত করে তুলছে। শ্রীকৃষ্ণ একটি কথাও বলল না চক্ষুর ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান করল। ব্রহ্মা তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে চরণে প্রণাম করতঃ অভীষ্ট ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অন্তর্হিত হল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।

অতএব ব্রহ্মার মায়ায় বিমোহিত হয়ে গোপবালকগণ—এই একবছরের কোন সংবাদই জানতেন না। এক বছরের পর যখন তারা মায়ামুক্ত হল সেদিনই তারা অঘাসুর বধ হয়েছে বলে সকলের নিকট ঘোষণা করল।

* * * *

এরপর পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধেনুকাসুর বধ এবং কালিন্দীর বিষাক্ত জলপানে অচেতন গো ও গোপগণের পুনর্জীবন লাভ বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঁচ বছর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোবৎসগুলি চারণ করত কিন্তু ছ'বছরে পড়তেই তারা বড় বড় গাভীগুলিকে চারণ করতে লাগল। বলরাম কৃষ্ণের থেকে মাত্র ৮ দিনের বড়। সুতরাং তারা সমবয়স্ক। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে এরা প্রথম গাভীচরাতে আরম্ভ করে। এই দিনটিকে বৈষ্ণবগণ গোপাষ্টমী বলে থাকেন।

একদিন শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ নিকটস্থ তালবৃক্ষে পরিশোভিত এক সুবৃহৎ বন থেকে তাল এনে খাওয়া প্রস্তাব করল। কিন্তু সেখানে গর্দভরূপধারী মহাবলশালী ধেনুকাসুর বহুজ্ঞাতীগণে পরিবৃত হয়ে সেখানে বাস করে। নরমাংস-ভোজী সেই অসুরের ভয়ে ঐ তালবনে কেউ যেতে সাহস করে নি। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকগণের তাল খাওয়ার কথা শুনে হাসতে হাসতে তৎক্ষণাৎ তালবনে প্রবেশ করে ফল পাড়তে লাগল। ধেনুকাসুর প্রবল বেগে ছুটে এল। অমনি বলরাম তার পেছনের পা দুটি ধরে ঘুরাতে ঘুরাতে মেরে ফেলে তাকে তালগাছের উপর নিক্ষেপ করল। ধেনুকাসুরের আত্মীয়স্বজনগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করল, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তখন অসুরগুলিকে করল নিহত। এরপর থেকেই মনুষ্যগণ নির্ভয়ে তালবনে যাতায়াত করতে লাগল এবং গো-মহিষাদি পশুগণও সেখানে তৃণ-ভক্ষণ করতে আরম্ভ করল।

দ্বাদশ অধ্যায়

● কালিয় দমন ●

কালিয়রে তোর জনমসাধ মুছরে চোখের জল
কৃষ্ণপদ মাথায় নিয়ে জীবন তোর সফল ॥

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সাথে কালিন্দীর তীরে গমন করলেন। সেদিন বলরাম বাড়িতেই ছিলেন—গোপবালকগণের সহিত গোচারণে বের হন নি। তখন গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গোবৃষাদি পশুগণ—দ্রুতবেগে যমুনায় গিয়ে জলপান আরম্ভ করল। যমুনার জল সর্বত্রই সুস্বাদু ও সুখকর। কিন্তু সেই স্থানটির জল বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর কারণও ছিল। যমুনার সন্নিকটে একটি হ্রদ ছিল। কালিয়নাগের বিষাগ্নির দ্বারা ওর জল সর্বদাই যেন ফুটতে থাকত। ঐ হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে গেলে বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে হ্রদমধ্যে নিপতিত হত। সেই হ্রদের তীরে একটি মাত্র কদম্ববৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন গাছ ছিল না। বহুদিন পূর্বে গরুড় অমৃত আহরণ করে ঐ কদম্ববৃক্ষে ক্ষণকাল বিশ্রাম করেছিলেন, তাই অমৃতস্পর্শে কদম্ব বৃক্ষটি বিষের ক্রিয়া অতিক্রম করে বেঁচেছিল।

একদা প্রবলবর্ষায় হ্রদের বিষাক্ত জল প্লাবিত করে যমুনায় প্রবেশ করে। তাতে কলুষিত হয় যমুনার জল। তা দেখে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন—ঐ কালিয় নাগকে দমন করতেই হবে।

গ্রীষ্মকাল। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চারিদিক। 'প্রখর তপন তাপে জগৎ তৃষ্ণায় কাঁপে'। ফেটে চৌচির হয়ে যায় তৃষ্ণার্ত প্রান্তর। মাঠের মধ্যে ধূলায় ধূসর রুক্ষউড্ডীণ পিঙ্গল জটাজাল নিয়ে কোন এক মহাতাপস যেন ধ্যানে বসেছেন।

কৃষ্ণ গোপালবালকদের সাথে গরু চরাচ্ছেন।

এমন সময় পিপাসাপীড়িতা গাভী ও বালকগণ অজ্ঞানতাবশতঃ সেই বিষাক্ত জল পান করে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল।

কালিয়নাগের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধ জন্মাল কৃষ্ণের। তিনি প্রথমে অমৃতবর্ষিনী কৃপাদৃষ্টির দ্বারা তাদেরকে বাঁচিয়ে তুললেন।

তারপর আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য হয়ে উঠলেন তৎপর। কালিয়কে এবার দূর করতেই হবে। দেখতে দেখতে একটি গাভীকে ধরে নিয়ে জলের তলায় চলে গেল কালিয়।

আর অপেক্ষা নয়। সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ কটিদেশে দৃঢ়ভাবে বস্ত্রবন্ধন করে হ্রদের তীর ভূমিস্থ অতি উচ্চ কদম্ববৃক্ষে আরোহন করলেন। তারপর সমস্তগোপ বালকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে প্রবলবেগে লাফিয়ে পড়লেন সেই বিষাক্ত হ্রদের জলে। চারি-

দিকের কাষায়বর্ণ জল স্ফীত হয়ে উঠল। সেই অগাধ জলরাশির মধ্যে সাঁতার দিতে লাগলেন কৃষ্ণ। অমৃতময় কৃষ্ণ আজ গরলসাগরে নিমগ্ন।

কালিয় তৎক্ষণাৎ এসে "সন্দশ্য মর্মসু রুষা ভুজয়া চচ্ছাদ"—তাঁর মর্মস্থলে দংশন করতে করতে নিজে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিসর্পিল দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণদেহ আবেষ্টন করল। মিশে গেল কালোয় কালোয়। প্রভু নিশ্চল হয়ে রইলেন সর্পের আবেষ্টনীর মধ্যে—যেন বিষের নিকট অমৃতের ঘটল পরাজয়।

জলের তলায় অনেকক্ষণ চলল যুদ্ধ। তীরভূমিতে গোপবালকগণ করে উঠল হাহাকার। চতুর্দিকে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপীগণ উপস্থিত হলেন। কান্নার রোল পড়ে গেল হ্রদের তীরে। মা যশোদা পুত্রশোকে পাগলিনীর মত হয়ে সর্পহ্রদে লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন। সকলেই কাঁদছেন—ব্রজাঙ্গনারা-মাথা কুটছেন তাদের প্রাণনাথ কৃষ্ণের জন্য। চীৎকার চেঁচামেচিতে সমাকুল সেই পরিবেশ।

শুধু নিশ্চল একজন। যিনি অনুজ কৃষ্ণের অমিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি সবাইকে বারণ করছেন কাঁদতে। মা যশোদাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধরে রেখেছেন। পিতা নন্দকে আশ্বাস দিচ্ছেন—কৃষ্ণ এখুনিই কালিয়নাগকে দমন করে ফিরে আসবে।

তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং প্রভু বলরাম।

দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে কালিয়নাগের আবেষ্টনীর মধ্য থেকে হল মুক্ত। এহেন শক্তিমান শিশুকে দেখে কালিয় ভয় পেল কিছুটা। মনে চিন্তা হল তার কে এমন শক্তিমান? সে একশত মাথার একশ চক্র বিস্তার করে দুশ রাঙন চক্ষু দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে। আর পরমেশ্বর কৃষ্ণ তখন তার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। কালিয়ও তাঁর সাথে ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় সুযোগ খুঁজতে লাগল দংশন করার জন্য। কিন্তু পারল না। তার আগেই ব্রজগোপাল আবার স্বীয় হস্তের দ্বারা কালিয়ের মাথাটি কিঞ্চিত নত করে তার প্রশস্ত ফনার উপরে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই পরিশোভিত মনির আভায় রঞ্জিত পদদ্বয় নিয়ে সানন্দে করতে লাগলেন নৃত্য।

যন্ত্রনার দাপটে জলের উপর মাথা তুলতে বাধ্য হল সাপ। তার মাথায় নাচছেন শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্ববিধাতার পদভারে সাপের মুখ দিয়ে রক্ত উদ্গীরণ হতে লাগল। তার ফনা গেল ভেঙে। অবিরল রক্তবমন করতে করতে ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ল কালিয়নাগ।

হ্রদের তীরের জনমণ্ডলীর মুখে ফুটল হাসি। আনন্দে অধীর হয়ে গোপবালকগণ চীৎকার করে। পুলকের সঙ্গে কেউ বা ছোটাছুটি করে। কেউ বা ভীত হয়ে প্রাণসখার অমঙ্গল আশঙ্কায় হয় শিহরিত। মা যশোদা গগনবিদারী কান্নায় ফেটে পড়লেন। পুত্রের মঙ্গলের জন্য কভু বা গোলোকবিহারীকে জানাতে লাগলেন আপন মনের ব্যথার কাহিনী।

প্রাণগোবিন্দ আনন্দেই নাচছেন সেই সাপের মাথায় কী মনোরম সেই দৃশ্য! হ্রদের তীরে অগণিত গোপ-গোপী, মা যশোদা, পিতা নন্দ আর অগণিত গোরু বাছুর, অসংখ্য পুষ্পবিতান—তৃণভূমি এবং সেই কদম্ববৃক্ষ। তারই মাঝখানে কালিয় হ্রদে কালিয়নাগের মাথায় চড়ে সানন্দে নেচে নেচে বংশী বাজাচ্ছেন অখিল কলাশাস্ত্রের গুরু, মোহন মুরলীধারী মদন মোহন কৃষ্ণ।

মাথার ব্যথায় আর শ্রীগোবিন্দের পদঝংকারে নিরুপায় হয়ে সাপ তখন চরাচর গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে করল স্মরণ।

নামী অপেক্ষা নামই প্রবল। নামীকে না চিনে নামগ্রহণ করলেও পাপী তাপীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কালিয় জানে না যে স্বয়ং ভগবানই তার মাথার উপর। সে যে কৃষ্ণের চরণলাভ করেছে—এ জ্ঞান তার নেই। তার তখনো ধ্যান ভঙ্গ হয়নি যে, অজ্ঞানে কৃষ্ণনাম করে মুক্তির পথে সে পা বাড়িয়েছে। ইচ্ছা করলেই সে বৈকুণ্ঠলাভ করতে পারত কিন্তু পারল না। সংসার আর স্ত্রীগণের মায়ায় বশীভূত হয়ে ইচ্ছে করল প্রাণে বাঁচাতে।

নাগপত্নীগণও থামতে পারল না। স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজ নিজ সন্তানকে সামনে নিয়ে এসে কাতর প্রার্থনা জানাল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। করুণ মিনতির স্বরে করতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি।

ওগো বিশ্ববিমোহন জগজন প্রভু! আপনি আমাদের স্বামীকে মুক্তি দিন! অপরাধী সর্পরাজের প্রতি আপনি যে দণ্ড বিধান করেছেন তা উপযুক্তই হয়েছে। আপনি দুষ্টের দমন করার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সর্পরাজ নিশ্চয়ই বহুসুকৃতির অধিকারী। নতুবা যে চরণধূলি লক্ষ্মীদেবীর কাম্য—সেই চরণধূলি সর্পরাজ অনায়াসে প্রাপ্ত হল কিভাবে? সত্যিই সর্পরাজ ভাগ্যবান—ভাগ্যবান স্বামীর স্ত্রীদের কথা আপনি নিশ্চয় রক্ষা করবেন। ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখুন। যে পদধূলি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই পদধূলি যাঁরা পান, তাঁরা স্বর্গও কামনা করেন না, পৃথিবীর একাধিপত্যও চান না, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিতেও তাদের ইচ্ছা নেই। রসাতলের রাজা হওয়ার লোভ তাঁদের থাকে না। তাঁরা চান শুধু আপনার শ্রীচরণে বিলিন হয়ে থাকতে। তাই হে কৃষ্ণ! হে করুণার সিন্ধু। হে জনার্দন পরমপুরুষ! এই সর্পরাজের সকল অপরাধ ক্ষমা করে আজীবন আপনার চরণ সেবার অধিকার দিন।

কালিয়ের চক্ষুগুলি কেমন যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তার স্ত্রীগণও কৃষ্ণধ্যানে হয়ে গেল তন্ময়। এমত অবস্থায় সর্ববিধ ক্ষমার অবতার প্রভু সহাস্য বদনে আদেশ দিলেন—তাই হবে। তবে তোমরা আর কেউ এ হ্রদে থেকো না। অবিলম্বেই সমুদ্রে গমন কর।

কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়দের নিয়ে সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করল সুরু।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

● আজিও বাজিছে বাঁশী বৃন্দাবনে ●

শোন শোন ভক্তগণ শোন একমনে।
কৃষ্ণ বাজায় বাঁশী আজও বৃন্দাবনে॥
শ্রীকৃষ্ণে রাখিলে মন বাঁশী যাবে শোনা।
তখনই হবে দূর সংসার যাতনা॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে নয়টি গীত আছে। রুদ্রগীত, দেবগীত, বেণুগীত, গোপীগীত, ঐলগীত, যুগ্মগীত, ভ্রমরগীত, ভিক্ষুগীত ও ভূমিগীত। এদের মধ্যে গোপীগীত ও ভ্রমরগীতই শ্রেষ্ঠ। ভাগবতের দশমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায় 'বেণুগীত' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তা বর্ণনা করলাম।]

তখন শরৎকাল। সোনালী আলোর বন্যায় বৃন্দাবন ঝলমল। পদ্মগন্ধে সরোবর আকুল। বর্ষণধোত মেঘমুক্ত আকাশের নীচে সবুজ শস্য আর বনানীর উপরে আলোছায়ার লুকোচুরির খেলা। শিউলি ফুলের মনউদাসী গন্ধে আর কাশপুষ্পের শুভ্র সমারোহে ধরণী পরিপ্লাবিত। কুহু আর কেকাধ্বনিতে দিগদিগন্ত দিশেহারা। রূপোর দুয়ার খুলে সোনার মন্দিরে বেজে উঠেছে মধুর বাঁশরী।

শরতের এই অনবদ্য সুষমার মাঝখানে শিশির সিক্ত পথ দিয়ে আজ প্রাণতম—পূর্ণতম প্রাণগোবিন্দ আমার বনমধ্যে প্রবেশ করে বাজাতে আরম্ভ করেছেন কামনা উদ্রেককারী বাঁশী। সেই বাঁশীর শব্দ শুনে বৃন্দাবনের গোপগোপীগণের হৃদয় হয়ে উঠেছে উত্তাল। গৃহ কর্মে বসে না মন। সেই সুর কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে প্রাণকে আকুল করে তুলছে। সেই বাঁশী বাজছে যেন স্বর্গ মর্ত্য প্লাবিত করে—চারিদিক অভিভূত করে এক গভীর ভাবরসে। কী এক অপরূপ মায়ায়।*

তখন গোপললনারা আর থেমে থাকতে না পেরে কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণগানে ডুব দিয়ে অবগাহন করতে করতে আবেশ তনুমনে নিজ নিজ সখীর নিকট প্রাণের ভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। গোপীগণ দেখছেন—নটের মত পরম রমণীয় বেশে সেজেছেন শ্রীকৃষ্ণ। মাথায় তার ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে ফুল—পরিধানে সোনালী বসন, গলায় বৈজয়ন্তী মালা। তিনি বৃন্দাবনের সুশোভিত কাননপথে বাজাচ্ছেন বাঁশরী। পেছনে গোপবালকগণ।

* [কৃষ্ণের তিনটি বাঁশী। রাখালদের আনন্দ দেবার জন্য 'বৈণবী' বাঁশী। গোপীদের আকর্ষণ করার জন্য 'হৈমী' আর ত্রিজগতকে সম্মোহন করার জন্য 'সম্মোহিনী'।]

আজ প্রাণগোবিন্দের শ্রীচরণস্পর্শে বৃন্দাবন হয়ে উঠেছে পরম রমণীয়। ব্রজকুল অভিসারিকা শ্রেষ্ঠ গোপীও শুনতে পেয়েছেন ঐ মুরলী ধ্বনি। কিন্তু গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। তাঁর কোন কাজে নেই মন। কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরঝংকারে তিনি হয়েছেন পীড়িতা, মন ভার করে বসে আছেন সদা। কখনো বা অশ্রুসিক্তবদনে সখীদের বলছেন—

সখীরে, আজ কি শুনিলাম কালিন্দীর কূলে,
শ্যামের বাঁশরী ডাকিছে আমারে 'প্রাণ সখী আয়' বলে।
তোরা বল সখী বল
তোরা করিস না রে ছল
মম প্রাণনাথে কেমনে হেরিব আজি কদম্ব মূলে॥

শ্রেষ্ঠা গোপীর এই আর্তি শুনে অন্যান্য গোপীগণের চোখ ভরে উঠে জলে: তাঁর সেই অশ্রুসিক্ত লোচনেই গৃহে বসে তদ্গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐ নটবর বেশ পরিদর্শন করছেন। ধন্যবাদ দিচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবনকে। আর বৃন্দাবনের পাখীদের বলছেন—ওরে পাখি! তোরা বড় ভাগ্যবান। পূর্বজন্মে তোরা বুঝি মুনি ঋষি ছিলি। তাই এ জন্মে সর্বদা কৃষ্ণদর্শন করতে পারছিস। আবার কীট পতঙ্গদের বলছেন—ওরে কীট পতঙ্গ, ওরে প্রজাপতি! আজ তোদের জীবন সার্থক। সর্বদা কৃষ্ণদর্শন করে হৃদয়কে করলি সার্থক। আর আমরা সব কুলনারী। গৃহের মধ্যে থেকেই শুধু তাঁর বাঁশীর সুর শুনছি। সংসারের বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে যেতে পারছি না।

এইভাবে কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত গোপীগণ পরস্পর কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে করতে হয়ে উঠলেন তন্ময়। তাদের চেতন ও অবচেতন মনে সঞ্চারিত হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগ।

* * *

আজও কিন্তু সেই বৃন্দাবনে মধুর স্বননে বাঁশরী বাজছে। হে কলির বদ্ধ জীব! সর্বকর্ম মাঝে কান পেতে শুনুন সেই বংশীধ্বনি। আমরা যদি গভীর ভক্তি ও একাগ্রতা নিয়ে কান পেতে শুনি সেই সুর তাহলে আমাদের মনেও সঞ্চারিত হবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগ। যেমন করে একাগ্রতার দ্বারা লেখাপড়া শিখে মানুষ অনেক উপরে উঠতে পারে তেমনি ঈশ্বর সাধনাও। ইচ্ছা করলে আমরা নিজদিগকে অবশ্যই কৃষ্ণানন্দে ভরিয়ে রেখে তাঁর কৃপা লাভ করতে পারি।

ভগবানতো নিজেই বলে গেছেন—জীবগণ, মাভৈঃ। মন থেকে সন্দেহ দূর কর। আমি কলিযুগে সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে থাকব। তোমরা সর্বদা স্মরণ-মনন ও চিন্তন দ্বারা আমার করুণা লাভ করবে। সন্দেহ দূর করে শীঘ্রই মনকে মন্মনা কর। আমি তোমাদের সামনা সামনিই আছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

● গোপীগণের কাত্যায়নী ব্রত ও কৃষ্ণ কর্তৃক বস্ত্রহরণ ●

লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করি সর্বস্ব সঁপিলে।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ওগো তাহাতেই মিলে॥
অসার সংসার মাঝে কৃষ্ণমাত্র সার।
দিবানিশি চিন্তা কর শ্রীচরণ তাঁর॥

শরৎ বিদায় নিয়েছে। এসে গেছে হেমন্ত। শ্রীকৃষ্ণের বয়স মাত্র সাতবছর। কুমারী গোপীদের বয়স চার থেকে ছ'বছর। কোন কোন ব্রজললনার বয়স আরো একটু বেশী। ঐ সময় ব্রজাঙ্গনাগণ যোগেশ্বরেশ্বর রসিকেন্দ্র চূড়ামণি পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য হেমন্তের প্রথম মাস থেকে হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্বক একমাস ব্যাপী দেবী কাত্যায়নীর ব্রত আরম্ভ করলেন।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরু হবিষ্যভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥

এখন প্রশ্ন হল—কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন কেন? কারণ মাতৃরূপিনী মহামায়ার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। মহামায়া কাত্যায়নী পরমকরুণাময়ী। কাত্যায়নী সন্তুষ্ট হলে কৃষ্ণকে পেতে তাঁদের কোন অসুবিধা হবে না। তাই তাঁরা এই ব্রত করেছিলেন।

বঙ্গপ্রকৃতির ঋতুচক্রের ক্রমপর্যায় অনুসারে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্তকাল বলে আমরা জানি এবং কার্ত্তিক মাসকে হেমন্তের প্রথম মাস বলে বুঝি। কিন্তু পণ্ডিত শিরোমণি ভক্তপ্রবর শ্রীধর গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় লিখেছেন—

'হেমন্তে প্রথমে মাসি' বলতে তৎকালীন যুগে অগ্রহায়ণ মাসকে বুঝাত। আবার তখনকার দিনে পাঁচ ছ বছর বয়সেই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনাবোধ বিশেষভাবে জাগরিত থাকত। আর সেই চেতনাবোধের ফলেই কুমারীগণ প্রত্যহ অরুণোদয়ে যমুনার জলে স্নান করে বালি দ্বারা দেবী মহামায়া কাত্যায়নীর প্রতিমা নির্মান পূর্বক পত্র-পুষ্প, ফল-মূল ধূপ-দীপ ও নবপল্লবের দ্বারা দীর্ঘ একমাস ব্যাপী তাঁর পূজা করতে লাগলেন—

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিণ্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

এইরূপে একমাস অতিবাহিত হলে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গোপীগণ যমুনার তীরে নিজ নিজ বস্ত্র খুলে রেখে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে সানন্দে জলক্রীড়ায় মগ্ন হলেন। আর গাইতে লাগলেন—

এসো এসো নন্দদুলাল এসো ব্রজেশ্বর।
একসাথে আজ আনন্দেতে হইগো বিভোর॥
আমরা যত নারী অবলা
তোমায় নিয়ে করব খেলা
কালিন্দীর এই কালো জলে নাচিবো দিন ভর॥

সখীগণের মুখে এই আহ্বান সংগীত শুনে সর্বব্রতফলদাতা প্রাণনাথ গোপাল তখন সখাগণে পরিবৃত হয়ে নদীতীরে করলেন আগমন। তারপর কি করলেন জানেন?

প্রাণনাথ আমার শিশুর মত ক্রীড়ারচ্ছলে কুমারীগণের বস্ত্র অপহরণ করে সমীপস্থ কদম্ববৃক্ষে উঠে পুনরায় বাজাতে লাগলেন মোহন মুরলীখানি।

তখন অবাক হয়ে গোপীগণ পরস্পর বলতে লাগলেন—

ওগো সখী দেখ দেখ—একি কাণ্ড হোল।
নন্দদুলাল বস্ত্র নিয়ে বৃক্ষেতে উঠিল॥

বলতে বলতে গোপীগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে লজ্জায় ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে মিনতির সুরে জানালেন হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা—প্রাণসখাগো! হে আমাদের প্রাণনাথ! হে গোপীজনপ্রিয়! তুমি আমাদের বস্ত্রগুলি ফিরে দাও। হে ব্রজ-গোপাল, হে শ্যামসুন্দর মদনমোহন! আমরা তোমার চরণের দাসী। লজ্জায় জল থেকে উঠে যেতে পারছি না। তোমাকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তুমি আমাদের তৃষ্ণার শান্তি প্রাণের আরাম—তুমি আমাদের জান-মান-ইজ্জত। আমাদের—

বস্ত্রগুলি দাওগো ফিরে ওগো ভগবান।
লজ্জাভরণ দিয়ে তুমি রাখো নারীর মান॥
আমরা তোমার পায়ের দাসী
আমরা তোমায় ভালবাসি
বস্ত্র নিয়ে এসো নেমে ওগো দয়াবান।

—হে ধর্মজ্ঞ! হে বিশ্ব আনন্দদাতা, লজ্জা নিবারণকারী পরমপুরুষ ভগবান কৃষ্ণ! তোমাকে বারবার মিনতি করে বলছি—তুমি আমাদের বস্ত্রগুলি ফিরে দাও। আর ছলনা করো না।

কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন—বস্ত্রে যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে উঠে এসে নিয়ে যাও।

—কিন্তু লজ্জায় যে যেতে পারছি না।

—তবে ওখানেই থাক।

—কি বললে? তুমি যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর তাহলে নন্দরাজাকে বলে দেবো:

বিশ্বচতুর কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন—নন্দরাজ কি করবে আমার। সে তো স্নেহশীল। আমায় খুব ভালবাসে। আর কংস! সে বৃদ্ধ—স্থবির। অতএব কেউ কিছু করতে পারবে না আমার। তবে তোমরা যদি সত্যি সত্যিই আমাকে

ভালবাস তাহলে উঠে আসতে দোষ কি? আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা যে কতখানি সত্য তা আমি যাচাই করতে চাই।

অগত্যা নিরুপায় কুমারীগণ তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় একহাতে লজ্জা আবৃত করে সেই কদম্ব বৃক্ষের তলায় গিয়ে অপর হাতে নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করলেন। ব্রজ-বালাদের উলঙ্গ মূর্তির দিকে কৃষ্ণের ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি উদার স্বভাব পঞ্চবর্ষীয় বলকের মতো মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছেন।

তাঁদের সেই আত্মসমর্পণের ফলে শ্রীহরি বরদান করলেন, হে অবলা ব্রজাঙ্গণাগণ, তোমাদের কাত্যায়নী পূজা সিদ্ধি হল। এবার তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আগামী শারদ পূর্ণিমাতে তোমরা আমার সাথে মিলিত হতে পারবে। এখন ব্রজে ফিরে যাও। 'যাতবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়ে মা রংসথ ক্ষপাঃ'।

একথা বলেই কৃষ্ণ আবার তাঁর বাঁশীখানি বাজাতে লাগলেন। সেই বাঁশীর সুরে যেন ধ্বনিত হতে লাগল—

ব্রজে ফিরে যাও ব্রজাঙ্গনা তোমরা যত গোপললনা
শারদ পূর্ণিমায় হবে আমাদের মিলন।
ধৈর্য্যধর আর কটা দিন মনের আশা পুরবে সেদিন
সব বাসনা পূর্ণ হবে, পাবে আলিঙ্গন ॥

এইরূপে কৃষ্ণকে সর্বস্ব প্রদান করে (বস্ত্রহরণলীলারূপ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে) গোপ কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণমিলনের অধিকারী হয়ে পুরুষরত্ন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ পূর্বক গৃহে ফিরে গেলেন।

(কার্ত্তিকী পূর্ণিমা সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে হয়। সুতরাং শারদ পূর্ণিমা কার্ত্তিক মাসে পড়ে। এই শারদ পূর্ণিমাতে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিথির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে এই শারদপূর্নিমা কোন বছর কার্তিক মাসে, কোন বছর বা অগ্রহায়ণ মাসে হয়ে থাকে।)

পঞ্চদশ অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ ●

গোবর্ধন যাঁর কাছে কন্দুকের সম।
সেই কৃষ্ণপদে কোটি বার নম ॥

কাত্যায়নী ব্রতের পরের বছর।

ব্রজধামে দীর্ঘ ক'মাস বৃষ্টি না হওয়ার জন্য ব্রজবাসিগণ বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পূজা করতে হয়েছেন উদ্যোগী। তাই পড়ে গেছে মহাধুমধাম। ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ হবে ব্রজভূমিতে। বিপুল আয়োজন—বিরাট কোলাহল সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যজ্ঞস্থলী।

বালক কৃষ্ণ এই সব দেখে তাঁর পিতা নন্দকে বললেন—জীবগণের পুষ্টির জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ না করে বরং গো ব্রাহ্মণ ও পর্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হোক। সেই যজ্ঞে

নারায়ণ নিবেদিত অন্ন দীন-দুঃখী ও পতিত জীবগণের মধ্যে বিতরণ করা হোক। এখন আমাদের তৃণপ্রদান এবং গোবর্ধন পর্বতকে পূজা করা ও মাল্যদান একান্ত প্রয়োজন। কারণ নারায়ণই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞফলদাতা। তিনি বৃষ্টি দেবেন। নারায়ণই গোবর্ধন পর্বতে অবস্থান করে আছেন।

নন্দরাজ কথাগুলি মেনে নিয়ে ইন্দ্রপূজা দিলেন বন্ধ করে। মহাসমারোহে আরম্ভ হল গোবর্ধন পূজা।

. দেবরাজ ইন্দ্র সহ্য করতে পারলেন না তাঁর এই অপমান। কুপিত হয়ে মেঘ-সমূহকে প্রবলভাবে বারিবর্ষণ করতে আদেশ দিলেন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্ল তৃতীয়া থেকে নবমী পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী চলল বর্ষণ। সারা বৃন্দাবন যেন ভেসে যায়। ব্রজবাসীরা বুঝতে পারলেন—এ নেহাৎই ইন্দ্রের কোপ। কিন্তু কৃষ্ণ যখন আমাদের ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে গোবর্ধন পূজার কথা বলেছেন অতএব কৃষ্ণকেই জানানো হোক। ও যদি ভগবান হয় তাহলে নিশ্চয়ই এ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাবেন। একথা আলোচনা করে ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের সম্মুখে গিয়ে বললেন—

'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথঃ গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাৎ ভক্তবৎসল ॥' ১০।২৫।১৩

বিপদভঞ্জন কৃষ্ণ তাঁদের অভয় প্রদান করলেন। তারপর সকলকে সাথে নিয়ে গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে দুই হস্তে অচলরাজকে উৎপাটিত করে 'দধার লীলয়া ছত্রাকমিব বালকঃ' বালক যেমন অনায়াসে একহস্তে ছত্রধারণ করে সেই রকম অনায়াসে একহস্তের একটিমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা ওকে তুলে ধরলেন। তখন গোপ-গোপীগণ, গোসমূহ, শকট-ভৃত্য-পুরোহিত সকলে পর্বতের নিচে নিলেন আশ্রয়।

প্রবলবেগে হচ্ছে বারিপাত। সৃষ্টি বুঝি লয় পায়। সপ্তম বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তের একটি মাত্র অঙ্গুলিতে বিশাল পর্বতকে ধারণ করে আছেন—দক্ষিণ কটিতে তাঁর দক্ষিণ হস্ত। গ্রীবা-অধর বঙ্কিম ভাবে ভাবিত। অপরূপ মানিয়েছে রূপের নাগরকে। রাতুল চরণদুটি অপূর্ব ছন্দে বিজড়িত হয়ে অলৌকিক মায়া রচনা করছে।

অনন্তশক্তির আধার শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কে আর এই বিরাট অসম্ভব কাজ করতে পারবেন? তাঁরই সৃষ্টি গোবর্ধনকে তিনি তুলতে পারবেন না তো পারবে কে? গোবর্ধন তাঁর কাছে তো কন্দুকের সমান।

স্বর্গের দেবতাগণ অবাক হয়ে গেলেন। ইন্দ্রের মোহ ভঙ্গ হল। তাঁর অহংকারের হল পতন। তাই তৎক্ষণাৎ ভগবান কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বললেন—প্রভু। দেবতাদের অধিপতি বলে আমি নিজেকে সবচেয়ে বড় মনে করতাম। আমার সে মোহ ভঙ্গ হয়েছে আজ। আমাকে ক্ষমা করুন। ত্রিভুবনে আপনার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। আপনি সকল বুদ্ধির মূল কারণ। আমরা আপনার তেজের কণিকামাত্র।

ভগবান নির্বাক—নিস্পন্দ !!

ষোড়শ অধ্যায়

● রাসলীলা ●

শান্তি যদি চাও তবে কর কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে মোক্ষলভি যাবে অমৃতধাম॥
কৃষ্ণনামে আছে তৃপ্তি কৃষ্ণনামে সুখ।
কৃষ্ণনামে আনন্দলাভ, মরে যায় দুখ॥

হরিদ্বারের মহাপুণ্যময় গঙ্গাতীর। পতিতপাবনী গঙ্গা—যার নাম উচ্চারণ করলে মানুষের দেহ মন হয় পবিত্র। যে গঙ্গাবারি-স্পৃষ্ট বাতাস মানুষের মনের জমাটবাঁধা কামনা বাসনা তরল করে দেয়—যে গঙ্গাতীর মানুষের জীবন মরণের আশ্রয় স্বরূপ সেই গঙ্গাতীরে বসে মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কীর্ত্তন করছেন। রাসলীলা প্রেমকাহিনী নয়। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ সুলভ তৃপ্তির গল্পও নয়। কামব্যাধি দূরীকরণের লীলা। ভগবানের সাথে কামগন্ধহীন দেহমিলনের লীলা—এই লীলা গোপীপ্রেম আস্বাদনের লীলা—এই লীলা মধুর রসের লীলা।

[পদ্মপুরাণে আছে—ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ রামচন্দ্রকে দেখে তাঁর সাথে উজ্জ্বল রস উপভোগ করবার বাসনা অনুভব করেন। তারপর সেই সমস্ত ঋষিগণ স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয়ে গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক কৃষ্ণের সহিত মধুর রস উপভোগ করে অবশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। সুতরাং দণ্ডকারণ্যের মুনি ঋষিরাই গোকুলের গোপরমনী।]

রাসলীলা কৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদনের খেলামাত্র। কৃষ্ণের প্রতি লজ্জা মান ভয় ত্যাগ করে যে ব্যক্তি জীবন সমর্পন করতে পারে সেই সত্যিকারের কৃষ্ণ প্রেমিক—এটা প্রমাণ করার জন্যই এই রাসলীলা।

এই লীলার মর্মার্থ বোঝা খুব শক্ত। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহগ্রস্ত বিষয়কীট এই মধুর রসের সাধনা করতে পারে না। পতন হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পদে। শান্ত-দাস্য-সখ্য ও বাৎসল্য ভাবে কৃষ্ণ আরাধনা করার পর তবে মধুর রসের সাগরে ডুব দেওয়া যেতে পারে। রমণীদের সঙ্গে বিহার আলিঙ্গন থাকবে অথচ কামগন্ধহীন হবে সেই আলিঙ্গন—এ খুবই কঠিন ব্যাপার। অসাধারণ ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য ও শ্রদ্ধার সহিত এই লীলার অর্থ বুঝতে হবে আমাদের। তাই রাসলীলাকে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার লীলা বলা হয়।

সাধারণ বিহারের একটা জ্বালা আছে—অবসাদ আছে কিন্তু এই কৃষ্ণ আর গোপ-রমণীদের বিহারের মধ্যে কোন জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই নেই। এটা অপ্রাকৃত মধুর লীলা। তবে এটা কামসম্ভুত নয়—প্রেমসম্ভুত। এটা কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্যই।

গোপীদের হৃদয়ে কামগন্ধ নেই আছে প্রেম—তাদের কামনাই প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

এই নিষ্কাম প্রেমেই গোপীদেরকে পতিকোল থেকে কৃষ্ণকোলে টেনে এনেছিল। কৃষ্ণের গুণাবলীর এমনই আকর্ষণ। কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা নিয়ে কৃষ্ণস্পর্শন ও আলিঙ্গন পাওয়ার জন্যই গোপীগণ উৎগ্রীব। যে সকল মুনিঋষিগণ পরমাত্মা দর্শন পূর্বক সমস্ত কামনা বাসনার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছেন সেই সর্ব বন্ধনহীন—সর্বকামনা-বিহীন শান্ত ঋষিগণও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। শ্রীহরিতে এমনই গুণের আকর্ষণ।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

'আত্মারাম' বলতে ব্রহ্মা, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাবকে যিনি রমণ করেন অর্থাৎ যিনি এই সাতটি অর্থের জ্ঞানানুশীলনে রমণ করেন তাঁকে 'আত্মারাম' বলে।*

*   *   *   *

আজ পূর্ণিমা তিথি। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জসমূহ বর্ষাধৌত হয়ে শ্যামশোভা ধারণ করেছে। এমন দিনে কৃষ্ণ তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন। তিনি গোপীগণকে বলেছিলেন যে শারদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে তাঁদের কাত্যায়নী পূজার উদ্দেশ্য সফল হবে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হবেন।

বস্ত্রহরণ লীলার প্রায় এক বছর পরে শারদ পূর্ণিমাতে প্রস্ফুটিত মল্লিকাকুসুম শোভিত রজনীসমূহ সমাগত দেখে শ্রীকৃষ্ণ অঘটন ঘটন পটীয়সী স্বরূপশক্তি যোগমায়া-শক্তিকে আশ্রয় করে ভগবান হয়েও ভক্তগণের সাধনায় সিদ্ধিদান করেছিলেন রাসলীলার মধ্য দিয়ে।

কারণ প্রেমময়ী গোপবামাগণের সাধনার সাধ্যবস্তু শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ প্রাপ্তির কিছুটা বাকি ছিল। তাই তাঁদের আর এক বছর সাধনা করতে হয়েছিল অন্তরের আরাধ্য দেবতাকে পাওয়ার জন্য পরম আর্তি নিয়ে। সর্বস্বত্যাগের সাধনায় উন্নীত না হলে তো পরমপুরুষকে একান্তভাবে পাওয়া যায় না।

লীলাময় ভগবানের লীলা বোঝার শক্তি কার আছে। যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতাও নড়ে না—যাঁর ইঙ্গিতে মুহূর্তে প্রলয় ঘটে যেতে পারে, সেই সর্বশক্তিমান লীলাবিগ্রহ ভগবানের ইচ্ছা কে বুঝতে সক্ষম, স্বয়ং ব্রহ্মা কিংবা শিবেরও সে শক্তি নাই। তাছাড়া ভগবানের সাধনা পূর্ণ হলে তিনি স্বয়ং গোলোক ছেড়ে ছুটে আসেন সাধনার ফল দানের জন্য। তাই বস্ত্র হরণের একবছর পরে শারদ পূর্ণিমাতে শারদ প্রকৃতির অপূর্ব মনোলোভা শোভা পরিদর্শনে প্রীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম সর্বযোগেশ্বর এবং আত্মণ্যবরুদ্ধ সৌরভ হয়েও রমণ করতে ইচ্ছা করলেন।

'ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥' ১০।২৯।১

---

* 'আত্মারাম' শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা জানবার জন্য মৎপ্রণীত 'মহাপ্রভুর কৃষ্ণ অভিসার' গ্রন্থখানি দেখুন।

ভগবানতো নিত্যশুদ্ধ পরমপুরুষ। তিনি গোপীগণের দেহ ও মন নিয়ে কিরূপে রাসলীলা করবেন? তাই তাকে 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' হতে হল। তিনি অঘটন ঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীভগবান বিভিন্ন অবতারে একই লীলা সম্পাদন করে গেছেন কিন্তু রাসলীলায় যোগমায়ার আশ্রয় নিলেন কেন? কারণ, তিনি ব্রজরমণীদের কথা দিয়েছিলেন—তাদের আত্মসমর্পণে বিগলিত হয়ে তাদেরকে আলিঙ্গন দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি রাখতেই হবে। তাঁকে ব্রজরমনীদের প্রেমের অনুরূপ লীলা করতে হবে। (এখানে 'রমন' বলতে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন।)

তাই রাসবিহারী সত্য রক্ষার জন্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার নিমিত্ত অচিন্ত্য মহাশক্তির আশ্রয় নিয়ে নিজের মায়ায় নিজে বিমোহিত হয়ে নিজেকে ভুলে ব্রজরমণী-গণের প্রেমভাবে ভাবিত হয়ে—প্রেমানুরূপে সেজে—প্রেমানুরূপ লীলায় লীলান্বিত হয়ে অভিনব রাসলীলা আস্বাদন করতে চলেছেন।

রাসবিহারী রাসলীলা করতে গিয়ে সুন্দরী ব্রজনারীগণের মনোহারী সুমধুর বাঁশীটি বাজালেন। সেই বংশীধ্বনি চতুর্দিকে অনুরণিত করে দূরব্রজপল্লীর কুটীরে কুটীরে করল প্রবেশ। সমস্ত গোপীকে চকিত করে তাঁদের হৃদয়ের প্রতিরন্ধ্রে প্রতি-ধ্বনিত হতে লাগল। সেই ধ্বনী গোপীবক্ষে প্রবেশ করে সহস্র ঝংকার তুলে বায়ু তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে শ্রীকৃষ্ণের হৃদযে এসে গোপীহৃদয়ে করল এক অপরূপ মায়াসৃষ্টি। তখন কোন গোপী গো-দোহন করছিলেন। কেউ পরিবারবর্গকে অন্ন পরিবেশন করছিলেন। কেউবা আপন শিশুকে কারাচ্ছিলেন স্তন্যপান। আবার কেউবা পতি-সেবায় ছিলেন বিভোর। সব কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। কৃষ্ণের কর্মনাশা বাঁশী সব দিল ভুলিয়ে। কাজ আর হল না। কেউবা তখন বস্ত্র ও অলংকার পরছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে উতলা মন সব করে দিল গোলমাল। ফলে বক্ষের উত্তরীয় বস্ত্ররূপে পরিধান করলেন। কটিদেশের চন্দ্রহার উঠল কণ্ঠে। কণ্ঠের স্বর্ণালংকার কটিতে পেল স্থান। চোখের কাজল চারু অধরে অধরের রক্তিম রাগ উঠল চোখে। পায়ের বাঁকা মল হয়ে গেল হাতের বালা।

কৃষ্ণচিন্তায়—কৃষ্ণব্যাকুলতায় সব হয়ে যাচ্ছে গোলমাল। মাথার ঠিক নেই গোপীদের। মনকে গৃহের মধ্যে কোনক্রমেই বাঁধতে পারছেন না। বলছেন—

আজ কালার বাঁশী মন হরেছে কি করি উপায়!
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আজি মুরলি বাজায়।
ওলো সখি, ঘর ছেড়ে আজ আয় বেরিয়ে আয়॥

এই গান করতে করতে একে অন্যকে লক্ষ্য না করে উতলা গোপীগণ পতি-পুত্রকে ভুলে (অনন্যলক্ষিতোদ্যমা) আপন শরীর ও বেশভূষার দিকে লক্ষ্য না দিযে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে মধুবৃন্দাবনের বনভূমির দিকে চললেন নৃত্যের ভঙ্গীতে। খুশীতে তন্ময় তাদের মন। স্বামী ভ্রাতা পিতা মাতা কারও বারণ মানছেন না। যাঁরা পরিজন কর্তৃক বাধা পেয়ে গৃহে অবরুদ্ধ রইলেন তাঁরা নয়ন মুদ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণের

ধ্যান করতে লাগলেন। স্থূল দেহ ত্যাগ করে ক্ষীনদেহে রাসোৎসবীতে গিয়ে তাঁরা মিলিত হলেন রাজেশ্বরের সঙ্গে। বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ গোপী তখন—

শ্রবণেতে ব্রজেশ্বরী আনন্দিত মনে।
স্বামী সংসার ত্যাগ করি প্রবেশিল বনে॥

গোপীগণ কুমারী বিবাহিতা সকলেই যমুনা পুলিনে রমনীয় বনানীতে হলেন উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন—এই বনে হিংস্র পশু আছে। তোমরা ফিরে যাও। তাছাড়া তোমাদের এমন কি প্রিয় কার্য্য আছে—যা আমাকে করতে হবে! মাতাপিতা ও পতিগণ তোমাদেরকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করছেন। তোমরা এখানে দেরী করে আত্মীয় স্বজনগণের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিও না বাছা! এখনই গৃহে ফিরে যাও।

কৃষ্ণের কথা শুনে গোপীগণ ভাবছেন—যাঁর জন্যে তাঁরা এতদূর ছুটে এসেছেন পতিপুত্র ত্যাগ করে—হিংস্র শ্বাপদ সংকুল বন অতিক্রম করে তাঁর মুখে এই ছলনাময়ী কথা কেন? তাঁরা কি তাহলে ফিরে যাবেন? মুখ শুকিয়ে গেল প্রত্যাখ্যানের কথা শুনে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণের সামনে। অবশেষে মনোবেগ প্রশমিত হলে তাঁরা বললেন—হে পুরুষরত্ন! দেহি দাস্যম্। তোমাকে দেখে আমরা চঞ্চল ও উদ্বেলিত হয়েছি। ওগো তাপিত হৃদয়ের একমাত্র শরণ! তোমার স্পর্শসুখ দিয়ে আমাদের হৃদয়ের তাপ দূর কর। তোমার চরণের দাসী কর। হে ঠাকুর, আমাদেরকে তোমার পদধূলি দাও।

তোমার চরণের ধূলি দাওগো ঠাকুর
চরণের ধূলি দাও।
তোর প্রেমের ভিখারিনী মোরা
করুণা নয়নে চাও॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন দুইবাহু প্রসারণ করে গোপীগণকে পরম আনন্দে করলেন আলিঙ্গন। নৃত্যরঙ্গে হাস্য পরিহাসে মুখর হয়ে উঠল সমস্ত বনভূমি। আর সেই সঙ্গে—

মকুল ধরিল মালতীর বনে হাসে যেন শিশুচাঁদ।
রক্ত আভার হাসির রাশিতে ভেঙে গেল খুশীবাঁধ।
আজি পুষ্পে ভরিল বনডালি
পদ্ম শালুক দেয় করতালি
সবুজ কাননের অবুজ ভূমিতে নাচিতে করে গো সাধ।
আজি রাসপূর্ণিমার মধুর লগনে বন হল উম্মাদ॥

শারদ পূর্ণিমায় বনভূমি উন্মাদ হল কেন? সে শুধু পরম পুরুষ কৃষ্ণেরই শ্রীচরণ স্পর্শে সচ্চিদানন্দময় রসরাজের আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছায় ও উচ্ছ্বাসে। শুধু তাই নয়। সহসা—

শিউলি প্রসব করিল শারদীয় ফুলভার।
তার অঙ্গে অঙ্গে শাখায় শাখায় পুষ্প ধরে না আর।

তারই তলায় মহা কোলাহলে কখনো বা গোপীগণ ছুটে আসেন আর আনন্দে নাচতে থাকেন।

গোপীগণ আসি শিউলির ছায়ে
রুণু ঝুনু ঝুনু নুপুর বাজায়ে
পায়ের আঘাতে ফোটাবে কুসুম সময় নেই যে তার ॥

সে এক আনন্দঘন স্বর্গীয় মধুর পরিবেশ। কী অপরূপ নৃত্য পরিবেশন। শ্রীগোবিন্দ আজ সখীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রেমাকুল ছন্দে নাচতে শুরু করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নাচছেন—নাচছেন গোপীগণ। তালে তালে তানলয়ছন্দে চলছে সেই নাচ। নাচ চলছে কখনো করুণ মিনতির সুরে—কখনো বা সুরসপ্তকের উদাত্ত ঝংকারে। কখনো বা—

রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজে ফুলেরই নুপুর।
ব্রজবালার মুখ তাই আনন্দে মধুর ॥

সখীদের গাত্র বস্ত্র হয়ে পড়ছে শিথিল—মাথার কবরী পড়ছে খুলে। অনাবিল আনন্দে কামগন্ধহীন হয়ে সখীদের আলিঙ্গন দিতে দিতে নাচছেন প্রাণগোবিন্দ আমার। আবার বাজাচ্ছেন মোহন মুরলীখানিও।

মোহন মুরলীখানি বাজে
বাজেরে চঞ্চল ছন্দে।
বাজে প্রিয় মিলনের অনুরাগে
বাজে প্রেমফুল গন্ধে ॥
বাজে ঝুম-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু—॥

প্রিয়তম প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেই উদ্দাম নৃত্যলীলায় মিলনের মধুবৃন্দাবন সহসা হয়ে উঠল চঞ্চল ও উদ্বেলিত। ব্রজধাম হয়ে উঠল গোলোকের প্রমোদ কানন।

এইভাবে নাচতে নাচতে হঠাৎ প্রাণগোবিন্দ আমার শ্রেষ্ঠা গোপীকে সঙ্গে নিয়ে হলেন অন্তর্হিত। মহামিলনের আনন্দে বিভোর হয়ে সেই শ্রেষ্ঠা আরাধিকার মনে হয়েছিল অভিমানের উদয়। তাই তিনি পথে চলতে চলতে বললেন—প্রাণসখাগো, আমি যে আর পথ চলতে পারছি না। পথের কণ্টকে আমার চরণতল হচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত। আমার হাত দুটি ধরে তুলে নাও সখা আমি যে চলিতে আর পারি না।

কৃষ্ণ তখন পরম সোহাগভরে তাকে কাঁধে তুলতে আগ্রহী হলে ভাবে বিগলিত পরম সোহাগিনী তাঁর চরণ যুগল বাড়িয়ে দিলেন। আর সেই সঙ্গেই যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রপ্রভাবের মত এক অপূর্ব আলোকের ঝিলিক দিয়ে বিশ্ব যাদুকর হৃদয় দেবতা আমার বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটতে লাগলেন সেই কানন মধ্যে। শ্রেষ্ঠা গোপী আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন—

বনমালীগো, বলো তুমি লুকালে কোথায় ?
ক্ষমা কর প্রভু, মোর হেন দোষ—একি করিলাম আমি হায় !

তুমি যে আমার জীবনের অধীন
ক্ষনেক ভালবাসা দলিয়া।
বাঁধভাঙা যথা স্রোত ছুটে যায়
নলিনীরে ফেলি সেই মত হায়
কোথা গেলে তুমি চলিয়া ॥
তুমি নাই প্রিয় জানিয়াও চাঁদ
বৃথাই উদিবে গগনে।
হলেও এ ঘোর অমানিশা পার
কশৃতনু মোর হবে দুঃখ ভার
প্রাণনাথ তব স্মরণে ॥
ফিরে এসো প্রভু এ হৃদয় মাঝে মরিব নহিলে হায় !
বনমালীগো, বল তুমি লুকালে কোথায় ?

এভাবে বিলাপ করতে করতে সেই বনপথেই মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে রইলেন প্রেম পরশ পাথর স্পর্শে স্বর্ণবরণী মহাভাবস্বরূপিনী সেই গোপিনী।

এদিকে সখিগণ ইতস্ততঃ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলেন এখানে ওখানে। নিমেষের মধ্যে সেই রাসমণ্ডলে নেমে এল এক রিক্ততা ও শূন্যতার একতারা ঝংকার। বিরহ জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন গোপীগণ। উন্মত্ত পতঙ্গের মতো ছুটতে লাগলেন বিজন বিপিনে। 'প্রাণনাথ—প্রাণনাথ বলে ডাকতে ডাকতে হয়ে গেলেন ব্যর্থপ্রায়। কোথাও দেখা পেলেন না প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের।

গোপীগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠা গোপীকে 'অনয়ারাধিত নূনং' নিয়ে নির্জন স্থানে চলে গেছেন। কিন্তু পথিমধ্যে কোন নিক্কনধ্বনি শুনতে পেলেন না। তাই বিস্মিতও হয়েছিলেন।

অবশেষে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক স্বপ্নাচ্ছন্না পরিবেশে এক বিরহিনীকে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পান। কিছুটা চমকে উঠে গোপীগণ তখন পরিহাস করতে করতে কভু বা ব্যথিত হয়ে তাঁকে করালেন চেতন।

বহুকষ্টে চেতনা ফিরে পেয়ে পুনরায় কাঁদতে কাঁদতে সেই গোপী বললেন অন্যান্য সখীদের—সখিগো, আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলব। হাতের বলয় ভেঙে চুরমার করে দেবো। বিষাক্ত তীরের আঘাতে আহত হরিণীর মত কৃষ্ণের বিরহে আমার প্রাণ সর্বদা দগ্ধ হচ্ছে। সে আমাকে এখানে ফেলে কোথায় চলে গেল ? তোরা বল সখি বল।

সখিরা তখন বলছেন—সখিরে, শুধু তোর প্রাণ পুড়ে যায়নি, কৃষ্ণবিরহে আজ আমরাও দগ্ধ হচ্ছি। আর থামতে পারছি না। এই কথা বলে তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করলেন—চল সবাই, আমরা পুনরায় রাসমণ্ডলে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে সেই রাসেশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকি।

এই ভাবে ব্যাকুল নয়নে পথপানে চেয়ে চেয়ে ফিরে এসে গোপীগণ কৃষ্ণগুণে বিমোহিত হয়ে ডাকতে লাগলেন একস্বরে—হে কৃষ্ণ, তুমি দেখা দাও। হে প্রাণ-গোবিন্দ, তুমি একবার সাড়া দাও,হে গোপীজনবল্লভ, হে ভক্তজনপ্রাণ, হে প্রিয়তম পূর্ণতম ভগবান, আমরা তোমার কাছে কি এমন দোষ করেছি যে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে ? তুমি ফিরে এসো নাথ, এ দাসীদিগকে পায়ের তলায় রেখে দলিত মথিত করো। তুমি ফিরে এসো প্রভু, আমাদের হৃদয় বৃক্ষের রিক্ত শাখায় বসে তুমি একবার গান গাও। তোমার বিরহের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে আমাদের হৃদয় চিতা। তুমি এসে শান্তির বারি দিয়ে এ চিতা নিভিয়ে দাও। আমাদের অন্ধকার জীবনে তুমি আলোর বাতি নিয়ে এসো নাথ

'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মা বিষমে ভবাম্বুবে।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং চিন্তয় ॥'

—হে নন্দনন্দন, তোমার এ দাসীরা বিষম ভবসাগরে পতিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি কৃপা করে তোমার পাদ পদ্মের ধূলিকরে রাখো। তোমার পায়ের ধূলো হতে পারলেই আমাদের শান্তি।

এইভাবে জীবনের আকুতি জানিয়ে রোদন করতে করতে তাঁরা আবার যেন সোহাগ বিজড়িত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১০।৩১।৩৯

—হে আর্তিহারী মধুসূদন! হে ব্রজের নন্দন! হে অন্তরের অন্তরতম ভগবান! তোমার এই দাসীদিগকে একবার দেখা দাও। তোমার বিরহে আমাদের মরণ ঘনিয়ে এসেছিল—এখন বারবার তোমার নামগান করার ফলে আমাদের সেই মরণ দূর হয়েছে। তোমার কথামৃত পান করে আমরা যেন মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে উঠেছি। ফিরে পেয়েছি নতুনজীবন। তুমি পাপতাপহারী শ্রুতিমঙ্গল—কবিদের দ্বারা সমাদৃত। যে ব্যক্তি তোমার কথামৃত মানুষের মধ্যে কীর্তন করে বেড়ায় তার মত দাতা আর কেউ নেই। হে প্রিয়ো, দয়া করে একবার দেখা দাও—

দেখা দাও—দেখা দাও ওগো কৃষ্ণগোপাল।
তোমালাগি মোরা ছাড়িয়াছি ঘর ভুলিয়াছি দেশকাল ॥
তোমার বিরহে আজ কাঁদে শুকশারী
তোমা লাগি কাঁদি মোরা ব্রজনারী।
বাঁশরীর ছন্দে ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গে
এসো এসো কৃষ্ণ গোপাল।
এসো কৃষ্ণগোপাল এসো গিরিধারী
এসো তুমি বনমালী এসো ত্রিপুরারি
অভিমান ভুলে এরাসমণ্ডলে
ফিরে এসো গিরিধারীলাল ॥

ওগো গিরিধারীলাল—তুমি দেখা দাও- তুমি আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হও—তুমি একবার দয়া করে অধম দাসীদের হৃদয় মন্দিরে আবির্ভূত হও···বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন গোপীরা। আর তখন করুণাঘন—দয়ালঠাকুর সদা হাস্যময় পীতাম্বর আমার—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পিতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ॥

মন্মথের মনকে দলিত মথিত করে ত্রিভুবনমোহন রূপ মাধুর্য নিয়ে সাক্ষাৎ মদনমোহন বৈজয়ন্তী মালাধারণ পূর্বক গোপীগণের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে দণ্ডায়মান হলেন।

তারপর সেই নবকিশোর—নটবর অধর সুধায় বেণুরন্ধ্র প্লাবিত করে সম্মোহন সুরমূর্ছনার বন্যা বইয়ে দিলেন সেই শারদ জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীর মায়াঘেরা বনান্তরাল।

তখন সেখানে যে কী মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল তা বলাই বাহুল্য। যে কাম দেব সহস্র জগৎকে বিমোহিত করে থাকেন, সেই কামদেবের মনেও উদয় হয় কাম, যার শ্রীরূপ দর্শন করলে তাও দূরীভূত হয়, তাই 'মন্মথমন্মথ' অর্থাৎ কামদেব মদনের রূপকে পরাজিত করে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তাই তিনি 'মন্মথমন্মথঃ'।

তখন কোন গোপী কৃষ্ণের হস্তধারন করলেন, কেউ বা অঞ্জলি পেতে তাঁর চর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করলেন, কেউবা তাঁর চরণযুগল আপনবুকের উপর ধরলেন আপন। সে কী আনন্দ—গোপীদের তখন কী প্রেম আকুলতা বা তারই তৃপ্তি। হারানোধন প্রাপ্তির আনন্দে তাঁরা দিশেহারা আত্মহারা।

কৃষ্ণ তখন বললেন—গোপীগণ, তোমরা আমার জন্য ত্যাগ করেছ জাতি কুল মান, ত্যাগ করেছ আত্মীয়-স্বজন লোকাচার বেদাচার গৃহ সংসার ছিন্ন করে আজ নির্জন বনভূমিতে হয়েছ আমার শরণাপন্ন তোমাদের এই ঋণ আমি কী দিয়ে পরিশোধ করব—তা তোমারা আমাকে বল। তোমাদেরকে দাও দেবার মতো আমার যে কিছুই নেই গোপীগণ। আমি এখন কি করব—তোমরা আমাকে আদেশ দাও

একথা শুনে গোপীগণ উত্তর দিলেন—আমরা তোমাকে ছাড়া আর কোন কিছু চাইনা গো। শুধু চাই তোমার করুণা। তোমার অধরসুধা নিয়ে আমরা ধন্য হতে চাই। প্রাণনাথ। তোমাকে আলিঙ্গন করে আমাদের এই মনুষ্য জীবন সফল করতে চাই এসো ঠাকুর—এসো প্রাণনাথ বুকে এসো—এ দুঃখ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করে দাও। তোমার চরণে লীন করে দাও। তোমার অনন্তরূপ মধ্যে আমার অস্তিত্বকে মিশিয়ে আমাদেরকে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে দাও—মিলিয়ে দাও ভগবান, তুমি মিলিয়ে দাও

গোপীগণের এই ব্যাকুল আর্তনাদ শুনে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভগবান শ্রীহরি দয়াল গোপীনাথ আর থেমে থাকতে পারলেন না। পুনরায় আরম্ভ করলেন রাস।

একসঙ্গে দুলে উঠছে। লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণের জমাটবাঁধা একখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের চক্র ধাচ্ছে দেখা। হঠাৎ তার ভেতরে এক একবার চারিদিক আলোকিত করে লক্ষ বিদ্যুতের রেখা চমকে উঠছে—কোন সময় কেবল মেঘ—কখনোবা বিদ্যুতের ঝলকানি। দমকে দামিনী বারেবার। দেবগণ কখনো দেখছেন, নবমেঘরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আবার কখনো উজ্জ্বলা গোপীগণের রূপচ্ছটায় সেই ঘনশ্যামকে হারিয়ে যেতে দেখছেন। এক একবার মনে হচ্ছে—সেই লক্ষ গোপীও লক্ষ কৃষ্ণকে নিয়ে একখানি অখণ্ড আনন্দের সত্তা জমাট বেঁধে হয়ে গেছে একাকার। বহু গোপী স্থির হলে দেখা যাচ্ছে বহুকৃষ্ণ। কী অপূর্ব সৌন্দর্য বিরাজ করছে রাসমণ্ডলে। একবার এক অখণ্ড সত্তা আবার বহু বহু গোপী ও বহু বহু কৃষ্ণ। সেই আনন্দ বিজড়িত মুখগুলিতে দেখা যাচ্ছে স্বেদবিন্দু। চাঁদের কিরণে-নৃত্যের অঙ্গভঙ্গীতে সেই স্বেদবিন্দুগুলি হীরকখণ্ডের মায়া সৃষ্টি করছে। গোপীদের কবরীবন্ধন হয়েছে শিথিল। ফুল খসে পড়ে তৃণভূমি গেছে ঢেকে। বহুরূপের ও বহুকণ্ঠধ্বনির সম্মিলিত একাকার গোপীগণের কৃষ্ণলীলাগীতি আকাশ বাতাসকে ছাপিয়ে চলছে। নানাবিধস্বর একত্র হয়ে সৃষ্টি করছে একটা মহামোহময় সংগীত। এমন নৃত্য—এমন গানতো দেবগণ কখনো দেখেননি বা শোনেন নি। যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি—যিনি নিত্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর সেবাগ্রহণ করেন এবং লক্ষ্মীদেবীর সাথে বিলাস করে থাকেন সেই 'রমেশ' আজ ব্রজবালাগণের সঙ্গে আলিঙ্গন, করমর্দন, প্রণয়নিরীক্ষণ, উদ্দামবিলাস ও হাস্যপরিহাস করে বিহার করতে লেগেছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর সহিতও বিলাসলীলায় পরিতৃপ্তি না পেয়ে সেই রমাপতি বুঝি আজ গোপীবল্লভ সেজে তাঁর অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করছেন।

আজ কী আনন্দ ব্রজপুরে মিলনের মধুবৃন্দাবনে। গোপীগণের মালা ও অলংকার কখন যে খসে পড়েছে তা কেউ বুঝতে পারেন নি। তাঁদের কেশের বন্যায় কৃষ্ণবক্ষ আজ প্লাবিত।

> কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
> রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ১০।৩৩।২০

এইরূপে যমুনাপুলিনে স্থলক্রীড়া শেষ করে পরিশ্রান্ত রাসবিহারী ও ব্রজললনাগণ যমুনার জলে জলক্রীড়া আরম্ভ করলেন। শ্রীগোবিন্দ মনের আনন্দে অবগাহন করছেন যমুনার জলে। পবিত্র ভাগ্যবতী যমুনা তাই নিজেকে গর্বিত ও ধন্য মনে করছে। সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের পাদস্পর্শে আজ আনন্দে ভরে উঠেছে পূতসলিলা কালিন্দীর উজ্জ্বল স্নিগ্ধশীতল বক্ষ।

জল ক্রীড়ার পর তাঁরা পুষ্প রেণুগন্ধময় যমুনার উপবনে করতে লাগলেন কুঞ্জবিহার। কতক্ষণ যে চলল এ বিহার তার ঠিক নেই। পরম পরিতৃপ্তিতে সবাই হয়ে উঠল আকুল। দেহ হল শিথিল।

এইভাবে গোপীগণের সাথে আপনশ্রুতি পালন করে কামগন্ধ বিবর্জিত সত্য সংকল্প বাসুদেব প্রেম মাধুর্যময়ী রাসলীলা শেষ করলেন।

নিত্যগোলোক বৃন্দাবনে নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে অনন্তকাল ধরে। ভক্তগণের উপর কৃপাহেতু ভূমানন্দের ভূমিতে অবতরণ। কৃপাসিন্ধু রসিকশেখর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ভৌমবৃন্দাবনে রাসলীলা প্রকটণ ভক্তগণের সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিদান করার জন্য এবং জগৎকে অনুরাগাত্মিকা ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

রাসলীলা ভৌমবৃন্দাবনে সংঘটিত হলেও পরম ত্যাগের এই লীলা। "নিবৃত্তি পরেরং রাসলীলা"। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের গোপী গোবিন্দের মিলনের মাধুর্যময়ী লীলা। ভগবানের সহিত ভক্তের মিলনের লীলা। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার পরিপূর্ণ মিলনের এই মধুরলীলা। এই রাসলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময় জগতের বস্তু।

রাসলীলার তত্ত্ব-মহিমা ও রসাস্বাদন কামবিবর্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মনের অধিকারী ছাড়া ইন্দ্রিয়ারাম মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

* * *

রাসলীলা সাঙ্গ হলে গোপীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করলেন। দেবী যোগমায়া এক একটি মায়াগোপী সৃষ্টি করে গোপদের গৃহে রেখেছিলেন সেই রাত্রে। যার ফলে গোপীগণের গৃহে কোনরূপ অশান্তির সৃষ্টি হয় নি।

অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ধুর্য শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যপূর্ণ লীলার সন্ধান পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা। মধুর রসের ভক্তছাড়া অন্যভক্ত এই লীলার রস আস্বাদন করতে পারবেন না।

শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার আর একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে কামদেব মদনের দর্প চূর্ণ করা। বিশ্বামিত্র ও পরাশরাদি মুনিগণকে পরাজিত করে কামদেব গর্ব করে বলেছিলেন যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। শ্রীকৃষ্ণ তাই গোপীগণের সঙ্গে নিষ্কাম মিলন মেলার মধ্য দিয়ে মদনকে পরাভূত করেছিলেন।

রাস করিলেন হরি মদনে জিনিতে।
অন্য কোন ভাব তার না হয় মনেতে॥
মদন বাণেতে হৈল সবে মুগ্ধ মন।
বিশ্বামিত্র পরাশর আদি মুনিগণ॥
বাড়িল মদন দর্প তাহে অতিশয়।
ভাবে মনে মম বাণে স্থির কেহ নয়॥
এইরূপ দর্প মনে করিত মদন।
বিনাশিতে সেই দর্প শুনহ রাজন॥
রাসলীলা করে হরি তাহার কারণ।
ঈশ্বরের রাসলীলা অপূর্ব কথন॥

এই রাসলীলার আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখবার জন্য মহাযোগী শিব গোপীর ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু যোগমায়া দ্বারীরূপে নিযুক্ত থাকায় তিনি

রাসমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারছেন না। যোগমায়ার সাথে শিবের তর্কবিতর্ক চলেছিল অনেকক্ষণ। ভগবান কৃষ্ণ তা জানতে পেরে দ্বারে এসে বললেন—মহেশ্বর, তুমি এলীলা দেখার অধিকারী নও। কারণ, তোমার মধ্যে কামশক্তি বিরাজমান; কামশক্তির অধিকারীরা এ লীলা দেখতে পারে না। তুমি গোপীবেশ ত্যাগ করে কৈলাসে ফিরে যাও।

মহাদেব তখন বললেন—ঠিক আছে প্রভু, আজ আমি ফিরেই যাচ্ছি। তবে আজ আপনি রাসলীলা না দেখালেও একদিন আমি পৃথিবীর ঘরে ঘরে এ লীলা দর্শন করাব।

এই লীলার সাক্ষ্য স্বরূপ বৃন্দাবনে রাসস্থলীর অদূরে গোপেশ্বর শিব আজও হয়ে আসছেন।

পরবর্তী যুগে শান্তিপুরে তিনিই অদ্বৈতাচার্যরূপে আবির্ভূত হন এবং প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের উদ্দণ্ড নৃত্যও প্রেমোল্লাসের মাধ্যমে দ্বাপরের গোপীগোবিন্দের মিলনমাধুর্যপূর্ণ রাসলীলার আনন্দ কাঙ্ক্ষিত মানুষের ঘরে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

● কংস-নারদ মন্ত্রণা মণ্ডপে ●

ষোলকলা পাপ যবে নরের হয় পূর্ণ।
বাসুদেব আসি তখন করে তা চূর্ণ॥

আর দেরী নয়—এবার কংসকে বধ করা প্রয়োজন। কারণ, এর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। একথা ভাবতে ভাবতে নারদ একদিন কংস সমীপে এসে তাঁকে বললেন যে, অষ্টমগর্ভে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ করেছে বলে খ্যাত তা ভুল। যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। আর রোহিনীর পুত্র বলরাম। দেবকীর সপ্তম গর্ভের পুত্র। ওরা বৃন্দাবনে অসাধারণ শক্তি নিয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে

এই কথা শুনে ভোজরাজ কংস—

নিশম্য তৎ ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেব জিঘাংসয়া॥ ১০।৩৬।১৮

কোপবশতঃ বিচলিত চিত্ত হয়ে তখনই বসুদেবকে বধ করার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ করলেন।

দেবর্ষি কংসকে বোঝালেন যে বসুদেবকে হত্যা করে কোন লাভ নেই। বরং কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করে বধ করা হোক।

দেবর্ষির কথা শিরোধার্য করে ভোজরাজ কংস চানুর ও মুষ্টিক নামে দু'জন মল্লযোদ্ধাকে আহ্বান করে ধনুর্যাগপর্ব উপলক্ষ্যে এক মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনী করার

কথা বললেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণ বললেন—বহুমঞ্চপরিশোভিত মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক এক দুরন্ত হাতীকে রেখে দেওয়া হবে—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারদেশে এলেই সেই হাতীর আক্রমণে তাঁরা নিহত হবেন। আর যদি হাতীর আক্রমণ থেকে ওরা কোনক্রমে রক্ষা পায় তাহলে এই মল্লযোদ্ধাদের হাতেই বিনষ্ট হবেন।

এছাড়া মন্ত্রীগণের সাথে কংসের আরো অনেক মন্ত্রণা চলতে লাগল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

● কংসের দূতরূপে অক্রূরের গোকুলে আগমন ও গোপীগণের বিরহ লীলা ●

ভক্তের প্রাণ হরি ভক্তের অধীন।
ভক্তির ডোরেতে বাঁধা তিনি নিশিদিন॥

কংসের অত্যাচারে অনেকেই মথুরা ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু অক্রূর কোথাও যাননি। অক্রূরকে কংস নিজদলযুক্ত করে নিয়েছেন। কংস জানতেন না যে অক্রূর কৃষ্ণভক্ত। তাই একদিন কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার সমস্ত পরিকল্পনার কথা বললেন তাকে। তারপর ধনুর্যাগ ও যদুপুরীর শোভা দর্শন মানসে কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় আহ্বান করাব জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলেন। পরম কৃষ্ণভক্ত অক্রূর কৃষ্ণদর্শনের অভিলাষে সানন্দে রথে আরোহণ করে পাড়ি দিলেন নন্দালয়ে। মনে তাঁর অজস্র চিন্তার তরঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ 'ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা'—তাঁর সর্বদর্শী চক্ষুর দ্বারা অন্তর বাহির সবই দেখতে পান। সুতরাং তিনি আমাকে কংস দূত মনে করে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবেন না। এই রূপ চিন্তা করে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে কৃষ্ণপ্রেমের [illegible] অক্রূর সায়াহ্নে গোকুলে উপস্থিত হলেন। আর উপস্থিত হওয়ামাত্র কৃষ্ণ-বলরামকে প্রত্যক্ষ করে প্রেমানন্দে হয়ে উঠলেন বিহ্বল। তারপর প্রণাম করলেন দণ্ডবৎ হয়ে।

পরমদাস অক্রূরকে গৃহমধ্যে নিয়ে গিয়ে বিধি অনুসারে পাদদ্বয় ধোত করতে লাগলেন দুইভাই। 'প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ।' অক্রূর হয়ে উঠলেন স্তম্ভিত। কৃষ্ণকে বললেন—অপরাধ নেবেন না প্রভু। আমার পায়ে জল দিয়ে আমাকে মহাপাপী করবেন না। আপনি পরম পুরুষ ভগবান। আপনার পদধূলি নেওয়ার জন্য আমি বহুবর্ষ ধরে অপেক্ষা করে আছি।

কৃষ্ণ তখন সহাস্যে বললেন—আমাকে যাই বলো না কেন, আপনি আমার অতিথি। আমরা অতিথির প্রতি কর্তব্য করেছি মাত্র।

এইভাবে আতিথ্য প্রদর্শন শেষ হলে ভক্ত অক্রূর কংসের সমস্ত কথা [illegible] শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণনা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তখন 'প্রহস্য নন্দং পিতরং' হাসতে হাসতে পিতার কাছে ছুটে

গেলেন এবং মথুরা যাত্রার জন্য অনুমতি চেয়ে বললেন—পিতা, মথুরার রাজা কংস ধনুর্যাগ ও রাজপুরীর শোভা দেখানোর জন্য আমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তুমি আমাদেরকে অনুমতি দাও।

পিতা নন্দ প্রথমটাতো ঘাবড়ে গেলেন। প্রাণের গোপালকে ছেড়ে দিতে তাঁর মন চাইছে না। ভাবতে ভাবতে যশোদার কাছে গিয়ে বললেন—হ্যাগো, কংসের নিমন্ত্রণে গোপাল মথুরা যেতে চায়। ওর কোন অমঙ্গল হবে না তো?

যশোদা বলছেন—না-না, সেখানে পাঠিয়ে লাভ নেই। প্রাণের গোপালকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না। সেখানে গেলে ওর অমঙ্গল ঘটতে পারে।

এমন সময় বাঁশীখানি বাজাতে বাজাতে মায়ের কোলে এসে কৃষ্ণ বললেন—ভয় নেই মা। কেউ আমার কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। মহারাজ কংসকে আমি ভালরূপেই চিনি। সে আমাকে খুব ভালবাসে। সারা জীবনব্যাপী তপস্যা করেছে আমাকে দেখার জন্যে। তুমি আমাকে অনুমতি দাও মা। আমি সেখান থেকে অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

—না-না. সেখানে তোর কোন মতেই যাওয়া চলবে না। কংস লোক হিসাবে ভাল নয়। সে একটি জঘন্য শয়তান—সে শঠ প্রবঞ্চক।

—না মা, তিনি খুবই মহান। আমাকে দেখার জন্য তিনি উৎগ্রীব হয়ে আছেন। আমাকে যেতেই হবে।

পিতা নন্দ বললেন—তাহলে আমিও যাবো তোদের সাথে। তোদেরকে অক্রূরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না।

—কোন ভয় নেই পিতা! আমার মন বলছে, কংস আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না।

মথুরাতে যাওয়ার জন্য পুত্রের এই আগ্রহ দেখে নন্দ তাঁর স্ত্রীকে বললেন—যশোদা ছেলে যখন যেতে চায় তাহলে ওকে অনুমতি দাও।

—না-না, আমি অনুমতি দেবো না। আমি কোন মতেই ওকে যেতে দিতে পারবো না। ওকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত বাঁচবো না।

অবশেষে বালক কৃষ্ণের অশেষ পীড়াপীড়িতে মাতা তাকে মথুরা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কোন মতেই শান্তি পাচ্ছেন না। অহরহ কান্নার উজান বয়ে চলছে তাঁর চোখে। প্রাণের গোপালকে মথুরা যাওয়ার অনুমতি দিয়ে মা যশোদা অন্নজল ত্যাগ করেছেন। বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে অবস্থান করে আছেন।

মহা সমারোহে কৃষ্ণের মথুরা যাওয়ার আয়োজন চলছে। ভগবান কৃষ্ণ আজ বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরা চলে যাবেন। মাতাপিতাকে দুঃখের অন্ধকার কারা কক্ষে বন্দী করে গোপললনাদের বিরহ জ্বালায় ফেলে দিয়ে সুবল-শ্রীদাম-দাম-বসুদামকে কাঁদিয়ে নন্দদুলাল আজ মথুরায় চলে যাবেন।

এই সংবাদ ত্বরিতে প্রচার হতে লাগল সারা ব্রজধামে।

তাইতো কাঁদছেন বিরহিনী ব্রজবধূ উন্মাদিনী হয়ে। অক্রূরকে 'ক্রূর' বলে

গালিগালাজ দিচ্ছেন। নিজেদেরকে 'কুরূপিনী' বলে ধিক্কার জানাচ্ছেন। বলছেন—

আমরা বড় অভাগিনী / কৃষ্ণ সেবার কিবা জানি
সখিরে, এখন কি করি উপায়।
সখা কৃষ্ণ যাবে মথুরায়॥

সখা কৃষ্ণের ওদিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি কী এক অনাবিল আনন্দে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ব্রজধামকে যেন শেষ দেখা দেখে নিচ্ছেন। বৃন্দাবনের ফুল লতাপাতা তাঁর মাথায় যেন চামর ব্যজন করছে আর সেই চামরের ব্যজনে গোপাল আমার আনন্দে তন্ময় হয়ে যেন গাইছেন—

পলাশের রঙে রঙে রাঙা হল হৃদয় আমার।
মথুরার ডাক মোরে চঞ্চল করে অনিবার॥

ব্রজের শ্রেষ্ঠা গোপী এ সংবাদ পেয়ে আর থামতে পারছেন না। তিনি আশু বিরহের যন্ত্রণা উপলব্ধি করে গৃহকর্ম ত্যাগ করেছেন। বুকে বিরহের আগুন। তিনি আক্ষেপ করতে করতে ছুটে এসে কৃষ্ণের পদতলে পড়ে জানাতে লাগলেন মর্মন্তুদ বিরহের মর্মবেদনা—ওগো প্রাণনাথ, আমার এত সাধের এত আশার কুঞ্জ—এক নিমেষে একি ম্লানিমায় ভরিয়ে দিলে? আমার বালিকা প্রাণের সোহাগ প্রদীপটুকু একটি ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে কেন? সকাল সাঁঝে বসে জীবনের রঙিন জাল বোনার মাঝে বিরলে সঞ্চিত সব প্রীতির পুষ্পাঞ্জলিটুকু তোমার চরণে যে দিয়ে ফেলেছি নাথ। তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেও নাগো! তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে আর বাঁচব? কার চরণতলে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে জীবনকে সার্থক করব? তুমি আমাকে বল প্রভু—তুমি বল! তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না!

—আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি কোথায়? তোমার প্রেম ভক্তি আর ভালবাসার মন্দিরে আমি চিরকাল বসে থাকবো। নিষ্কাম প্রেমভক্তির দ্বারা যখন তুমি আমার নাম স্মরণ করবে তখনই আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াব।

—কিন্তু আমার বিদ্রোহী জীবনের উন্মত্ত ঝঞ্ঝার জয়গান—রুদ্রমাদলের তীব্র জয়োল্লাস—তোমার প্রেমের সোনার কাঠি আর রুপার কাঠির স্পর্শে—সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে দেবতা! আমার আমিত্বটুকু তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে দিয়ে আমি যে ধন্য হয়ে আছি। তোমার অদর্শনে সেই স্মৃতিগুলো আমাকে যে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। আমিও তোমার সাথে যাবো প্রিয়তম! আমাকে তোমার দুর্গম পথের সাথী করো! জীবন যুদ্ধের সব যশ—সব খ্যাতিকে ছাপিয়ে তোমাকে আপন করে পাওয়ার অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে আজ আমি গতিহারা ছন্দে খুব্ধ মৃগের মতো ছটফট্ করছি। তুমি যদি চলে যাবে—তাহলে কেন বাঁশীর তানে আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিলে! তুমি বল নিষ্ঠুর—তুমি বল! তুমি কেন আমাকে পতিকোল থেকে টেনে এনেছিলে? তুমি শঠ—তুমি প্রতারক—এসব তোমার মেকি ভালবাসা।

—তুমি অবুঝ হচ্ছ কেন সখি? 'পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্' আমাদেরকে এভাবে যুগযুগ ধুরতে হবে। এই ঘোরার মাঝে আছে অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা-অনেক লাঞ্ছনা। তুমি বিগত জন্মগুলির কথা স্মরণ করে দেখো—জগতের মঙ্গলের জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে—এখনও অনেক বিরহ যাপন করতে হবে। তোমার বিরহ যন্ত্রণা দেখে জগৎবাসী শিখবে ঈশ্বর ভক্তি—তোমার ঈশ্বর সাধনা দেখে মায়াবদ্ধজীব মুক্তির স্বাদ খুঁজতে চেষ্টা করবে—তোমার কৃষ্ণ-ভজনে ব্রজধাম হয়ে উঠবে ভারতের সেরা তীর্থভূমি মুক্তি মধুবৃন্দাবন।

—প্রভু!

—তাই আজ তুমি ফিরে যাও। আমাকে কর্তব্য পালন করতে দাও। জগৎবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার হাতে সমর্পণ করলাম বিরাট দায়িত্বভার।

শ্রেষ্ঠাগোপীর মনের মধ্যে প্রতিভাত হল বিদ্যুতের ঝলক। স্মৃতি পথে উদিত হল চারযুগের বিরহের প্রেমগাথা।

বিরহিনী তখন জানালেন তার শেষ কথা—

"বধু কি আর বলিব আমি,
জনমে জনমে জীবনে জীবনে প্রাণনাথ হইও তুমি।"

কেউ বলছেন—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ক্ষণভঙ্গুর। তিনি নিত্য নতুন রমণী পিয়াসী। একদিন তিনি নিজপ্রেমে আমাদেরকে বশীভূত করেছিলেন। আমরা তার উপর বিশ্বাস করে গৃহ-স্বজন, পতিপুত্র সব কিছু ত্যাগ করে দাসী হয়েছিলাম। আজ তিনি সমস্ত ভুলে নিষ্ঠুর হয়ে মথুরা চলে যাচ্ছেন।

কাঁদছেন সুবল, কাঁদছেন শ্রীদাম, কাঁদছেন দাম-বসুদাম আরো কত শত সখা সখী। কেউ বলছেন—তুমি যদি চলে যাবে তাহলে আমাদেরকে অমন ভাবে ভালবাসলে কেন। আমাদেরকে কেন দিয়েছিলে মধুর আলিঙ্গন? বিনোদ খেলা খেলে আমাদের মন চুরি করেছিলে কেন? তুমি কি শুনতে পাওনা বধির—আমাদের এই হৃদয়—মরুর কান্না? তুমি জ্ঞানী হয়ে উদাসীনের মত কেন দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কথা বলছ না কেন সখা? তুমি কি মূক হয়ে গেছ? তুমি বল—তুমি বল—তুমি উত্তর দাও প্রাণেশ্বর? তোমার চিন্তা করতে করতে যদি আমরা মারা যাই তাহলে তাতে যা পাপ হবে তা তোমাকে নিতে হবে—এটা তুমি জেনে রেখো!

প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ নিরুত্তর। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মথুরার ডাক এসেছে তাঁর প্রাণের ছন্দে ছন্দে। মথুরার বাঁশীর তানে তাঁর দেহ মন উদ্বেল। তাইতো তিনি সমস্ত মায়ামমতার উর্ধ্বচারী হয়ে সব ভুলে নতুন আনন্দের উজানে পাড়ি দিতে চলেছেন।

গোপীরা কেউ উপুড় হয়ে কাঁদছেন—কেউ বা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন—কেউ বা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ভূমিশয্যা নিয়েছেন। তাঁদের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু—বয়ে চলেছে প্রবল বেগে।

এরই নাম বিরহ। এটাই বিরহের জ্বালা। যদি বিরহের জ্বালা না থাকে তবে

মিলন এত মধুর হবে কেন? মিলন এত মধুর বলেই তো বিরহের জ্বালা আছে! আজ আসন্ন বিরহের অনন্ত শূন্যতার প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে গোপীরা যেন নতুন করে বংশীধ্বনি শুনছেন। নতুন করে শ্রীকৃষ্ণ যেন তাদের বস্ত্র হরণ করছেন। আজ তাদের রাসলীলা হচ্ছে—সেই বনক্রীড়া—সেই জলকেলি—সেই কুঞ্জ উৎসব—নেই কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়ে—বক্ষে বক্ষ দিয়ে—হাতে হাত দিয়ে—চরণে চরণ দিয়ে—নূপুরের তালের সাথে নূপুরের তাল দিয়ে আর মনের সঙ্গে মন মিশিয়ে মহানহোৎসব। আজ নিষ্ঠুর অক্রূর সব মিথ্যা করে দেওয়ার আয়োজন করছে।

আজ আসন্ন বিরহে গোপীগণের অঙ্গ কৃষ্ণক্ষুধাতুর। তথাপি কৃষ্ণ তাদেরকে ছেড়ে চলেছেন। শুধু দেহ দূরে যাচ্ছে না তার প্রেমময় মন আজ মথুরা বাসিনী রমণীদের মধ্যে হারিয়ে যাবার উপক্রম করেছে। গোপীগণের বিরহজনিত নিঃশ্বাসে ব্রজপুরী উত্তপ্ত। বাতাসে মর্মভেদী বিলাপের সুর। নারীদের বস্ত্র অলংকার সব শিথিল প্রায়। হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে গোপাল, হে মাধব! তুমি যেও না মথুরায়। সহস্র কৃষ্ণনাম উত্থিত হয়ে বিরহের আকাশ ফেলছে ছেয়ে। মা যশোদা আর রোহিনীর অশ্রুজলে পথের ধূলি আজ সিক্ত।

গোপীদের এ বিরহ জ্বালা বড়ই মর্মান্তিক। এতো দেহের বিচ্ছেদে দেহের ক্রন্দন নয়, এ পরমাত্মার বিরহে জীবাত্মার চিরকালের ক্রন্দনধ্বনি। সেদিনের ঐ রোদন ধারার সাথে যুগযুগান্তরের নিখিল বিশ্বজনের রোদনধারা মিশে গিয়েছিল বলেই গোপী বিরহ এতই মর্ম্মস্পর্শী। কৃষ্ণের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এভাবেই কেঁদেছিলেন।

এতবড় একটা শোকসংকট অথচ অক্রূর নির্বিকার। নন্দপ্রমুখ গোপগণ মহারাজ কংসের জন্য নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে অন্যান্য শকটযোগে চলেছেন। চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরার দিকে। গোপীরা পুনঃ পুনঃ কেঁদে উঠছেন। আর কৃষ্ণ! তিনি 'ফিরে ফিরে চাহে নিরবধি'। তাঁদেরকে দিচ্ছেন সপ্রেম দৃষ্টি। কভু বা বলছেন—

আবার আসিবো আমি এই ব্রজধামে।
আবার আসিবো ফিরে যমুনা পুলিনে॥

রথ দৃষ্টির বহির্ভূত হল। পথ পার হন কৃষ্ণ। উন্মুক্ত আকাশ তার মনে এনে দিচ্ছে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্লাবন। ব্রজধামের আনন্দের হাট গেল ভেঙে কৃষ্ণহারা বৃন্দাবন হয়ে উঠল অন্ধকার—

'নন্দপুর পুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'।

বড় দুঃখিত হয়ে এক সখী বলছেন—

'সখিগো, কেমনে ধরিব হিয়া।
মোর প্রাণনাথ মথুরায় যায়
আমারই আঙিনা দিয়া॥'

কিন্তু কে কাকে দেবে সান্ত্বনা। বিরহ যন্ত্রণায় ভুগছে সবাই। সবাই কাঁদছে। কিন্তু গোপীদের গুরুজনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কোন কোন ব্রজললনা বলে।

আর কাউকে কেউ কলঙ্কিনী বলবে না। এবার থেকে শান্তিতেই থাকতে পারবি। কিন্তু একজনের অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তিনি নীরবে বসে গাইতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ বিরহগীত—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবে লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন, কংস বধ ও মথুরা বিজয় ●

সর্বপাপ মুক্ত হয় হরিনাম বলে।
যমেরে দিয়া সে ফাঁকী যায় স্বর্গে চলে ॥

অপরাহ্নে রথ এসে মথুরার সন্নিকটস্থ উপবনে হল উপস্থিত। অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে নিজগৃহে যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, যদুকুলদ্রোহী কংসকে বধ করে তাঁরা দু'জনে অক্রুরের গৃহে গমন করবেন।

অক্রুর বিমনা হয়ে প্রস্থান পূর্বক মহারাজ কংসকে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করে চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হয়ে মথুরাপুরী দর্শন করবার ইচ্ছায় নগরীর ভেতরে প্রবেশ করলেন। অপূর্ব মথুরানগরী, অপূর্ব তার প্রাসাদ—রাজপথ আর নরনারী। শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়ে নগর পরিদর্শন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন—এমন সময়ে 'বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং'—সুন্দর বদন বিশিষ্টা এক কুব্জা রমনীকে দেখতে পেয়ে রসরাজ কৃষ্ণ তার সাথে কথোপকথন করতে আরম্ভ করলেন।

কুব্জা বলল—আমার গ্রীবা, বক্ষ ও কটিদেশ বক্র বলে আমাকে সবাই ত্রিবক্রা বলে। আমি কংসরাজের অনুলেপন সম্পাদন কারিণী দাসী।

কুব্জা তখন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে কংসের জন্য প্রস্তুত অনুলেপনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অঙ্গশোভা রচিত করল। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে কুব্জার বক্রতা আরোগ্য হয়ে গেল। সে সুন্দরী রমণীমধ্যে পরিগণিত হয়ে শোভা পেতে লাগল। তখন "উত্তরীয়ন্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া"—তার মনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করবার ইচ্ছা উদিত হওয়ায় সে হাসতে হাসতে কৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ পূর্বক তাঁকে স্বগৃহে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল।

স্বীয় কার্য্য সাধন করে কুব্জার মনোভিলাষ পূর্ণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সাথে নিয়ে কংসের ধনুর্যজ্ঞশালার সন্ধান নিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন এবং কংসরক্ষিত ও সংপূজিত একটি বিরাট ইন্দ্রধনুর ন্যায় ধনুক দেখতে পেলেন।

প্রাণচঞ্চল শ্রীগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ সেই ধনুকটিকে ইক্ষুদণ্ডের মত দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন। সেই ধনুক ভাঙার শব্দে কংস অতিশয় ভীত হয়ে উঠলেন। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার উদয় হল তাঁর। শরীর দিয়ে ঝরতে লাগল স্বেদ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নগরের বহির্দেশে পরিস্থাপিত শকট সমূহের নিকট এসে দুগ্ধ মিশ্রিত অন্নভোজন করে সুখে রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মল্লরঙ্গভূমির দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। চারিদিকে তূর্য্য-ভেরী নিনাদিত হচ্ছে। মালা ও পতাকার দ্বারা সুশোভিত বহু মঞ্চ। নন্দ প্রভৃতি সামন্তরাজগণ বিভিন্ন মঞ্চে সমাসীন। মহারাজ কংস অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে প্রধান রঙ্গমঞ্চে অধিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় কুবলয়পীড় নামে এক হাতী এসে বাধা দিল। মাহুত হাতীটিকে উত্তেজিত করতে আরম্ভ করল, যাতে সে ওদেরকে বধ করে।

কিন্তু লীলাময়ের কী অপরিসীম লীলা। হাতীতো কৃষ্ণের কাছে সামান্য একটা পিপীলিকার সমান। অন্তর্য্যামী ভগবান তখন গজদন্তদুটিকে ধরে এক আছাড়ে অনায়াসেই হাতীটিকে বধ করলেন। তারপর উভয়ে দুটি দন্তই উৎপাটন করে প্রবেশ করলেন মল্লরঙ্গ ভূমিতে।

সবাই বিস্মিত নয়নে চেয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দিকে। কেউ দেখছেন কৃষ্ণের রূপ—কেউ অনুভব করছেন তাঁর অসাধারণ শক্তির কথা। কংসের মনে হল—স্বয়ং যমরাজ উপস্থিত। আর বুঝি রক্ষে নেই।

কৃষ্ণের বয়স তখন এগার বছর।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ চানুরের সাথে ও বলরাম মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। স্নেহ প্রীতির সন্দেহ নিরসন করে শেষ হল মল্লযুদ্ধ। দারুণ উত্তেজনার সহিত চানুর ও মুষ্টিকের ভবলীলা হল সাঙ্গ। এরপর সক্রোধে অন্যান্য মল্লযোদ্ধা এক একে আসতে লাগল এবং সেই অল্পবয়স্ক বালক দুটির হস্তে নিমেষেই নিহত হতে লাগল। কেউ কেউ ভয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তখন মহারাজ কংস ভয়ে, ক্রোধে জ্ঞান শূন্য হয়ে উন্মাদের মত আদেশ দিলেন—এখনই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নগর থেকে বের করে দেওয়া হোক। নন্দরাজকে বেঁধে রেখে গোপগণের যা কিছু সব কেড়ে নেওয়া হোক। বসুদেবকে হত্যা করা হোক।

কংসের এইরূপ উন্মাদবৎ আচরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ ধীরভাবে লম্ফ প্রদান পূর্বক কংসাধিষ্ঠিত উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করলেন। তারপর সুদৃঢ় হস্তে কংসের কেশরাশি আকর্ষণ করে তাঁকে উচ্চ মঞ্চ থেকে ভূমির উপর ফেলে দিয়ে তাঁর দেহের উপর হলেন পতিত। বিরাট পর্বতের ন্যায় বক্ষে বসলেন চেপে।

জনগণ হাহাকার করে উঠল। যুদ্ধ চলল কিছুক্ষণ। তারপর মৃত্যুবরণ করলেন কংস। কংস নিহত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য মুক্তিলাভ করলেন। কারণ—কংস পান ভোজন-বিচরণ-নিদ্রা ও জাগরণে সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করতেন। তারপর পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে বন্ধন মুক্ত করে মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরামণ্ডলীর

রাজা করলেন ভগবান কৃষ্ণ। নন্দরাজ ফিরে গেলেন গোকুলে। বসুদেব গর্গাচার্য ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন কার্য সম্পাদন করালেন। তারপর অবন্তীপুর নিবাসী কশ্যপগোত্রীয় সান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গবেদ ও উপনিষদ করলেন শিক্ষা। গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কৃষ্ণ সান্দীপনির মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলেন যমরাজের কাছ থেকে।

তারপর মথুরায় ফিরে গেলেন দুই ভাই।

ত্রিংশ অধ্যায়

● উদ্ধবের ব্রজধামে গমন ও গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান ●

'শ্রীগুরুর সেবা কর, কর নাম গান।
[illegible]'

কৃষ্ণ একদা প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে ডেকে বললেন—হে উদ্ধব, আমি ব্রজের গোপীগণের মদবিরহজনিত মনোদুঃখে অত্যন্ত চিন্তিত আছি। গোপীগণের জন্য আমার মন আমার চঞ্চল। কারণ তারা তাদের মন আমাতেই সমর্পণ করেছে। তারা আমার জন্য কুল-মান-লজ্জা সবই করেছে ত্যাগ। সুতরাং তাদেরকে সান্ত্বনা করা আমার একান্ত কর্তব্য।

উদ্ধব রথে আরোহণ পূর্বক ব্রজধামে করলেন যাত্রা।

বর্ষণধৌত মনোরম সকাল। মেঘমুক্ত আকাশে সুনীল স্নিগ্ধ কান্তি। [illegible] গন্ধে ব্রজধাম মুখরিত। মাটির কঠিন আবরণ ভেদ করে নবাঙ্কুর শস্য শিশুর দল বেরিয়ে পড়েছে নবজীবনের জয়যাত্রায়। আকাশে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘরাজির অপূর্ব সুর বিন্যাস। তথাপি বৃন্দাবনের পথে প্রান্তরে ধ্বনিত হচ্ছে কৃষ্ণ বিরহের সুর ঝংকার। ভরা নদীর কূলে কূলে কৃষ্ণহারার কান্না। 'বিনে শ্রীহরির কেমনে করি নয়নবারির সংবরণ?' ব্রজললনাদের কুটিরে কুটিরে শুধু অনন্ত বিয়োগের [illegible] অঙ্গীকার আর বিবর্ণ কানন বীথির পাতায় পাতায় বিরহের আলপনা। তারই মাঝখান দিয়ে রথে চড়ে চলেছেন উদ্ধব।

ক্রমে নন্দ ও যশোদার গৃহে উপনীত হলেন। আদ্যোপ্রান্ত সমস্ত ঘটনা বললেন সেখানে। যশোদার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল স্নেহের অশ্রু। পিতা নন্দও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বলতে প্রায় কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন—উদ্ধব, তুমি ওকে একবার আসতে বলবে। ওকে না দেখতে পেয়ে ওর মা আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছে। কেঁদে কেঁদে ব্যথাভরা জননী শরীরকে জীর্ণ করে ফেলেছে। শেষ হয়ে গেছে অভাগিনীর সমস্ত কান্না। ওর মায়ের জীবনের কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছেলেকে নিয়ে কত রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল—কিন্তু সব স্বপ্নের মুখে ছাই দিয়ে চলে গেল বাছা!

কথাগুলো শুনে যশোদার কান্না যেন হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে উঠল সবল বেগে।

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে বলতে লাগলেন—বাছা আমার ননীচুরি করে খেত বলে আমি কতবার শাসন করেছি—লাঠি নিয়ে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছি। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি কতবার। কতবার গালমন্দ করেছি। ওকে আমি ভগবান বলে জানি না—পুত্র বলেই জানতাম। আর সেইজন্যই বুঝি আমার প্রাণে আঘাত দিয়ে চিরতরে চলে গেল বেটা। ছেলেটা খুব ভাল ছিল। ওর মুখের মা-মা ডাক আজও আমার কর্ণকুহরে বাজছে। আমি যেন সয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে শুনছি আমার গোপালের 'মা-মা' বুলি। আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না উদ্ধব, তুমি আমার গোপালকে এনে দাও।

উদ্ধব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কাঁদবেন না মা। আপনার গোপাল আপনারই আছে। সে তার সমস্ত কাজ শেষ করে আবার আপনার কোলে ফিরে আসবে। আবার সে মা মা বলে ডাকবে। আপনার আদরে আর পিতার সোহাগে কৃষ্ণ গোপাল আবার লালিত পালিত হবে। আবার একদিন ব্রজধাম মুখর হয়ে উঠবে গোপালের আগমনে।

যশোদা মা বললেন, বাছা, আমি কিন্তু সেই বিশ্বাস রাখতে পারছি না যে, আমার গোপাল আবার ফিরে আসবে। সে আমার ঘরকে অন্ধকার করে দিয়ে চলে গেছে। আমি এমন অভাগিনী—আমি অভাগিনী। তা না হলে ছেলে কখনো তার মাকে ছেড়ে যেত না। আমি কেন সেদিন তাকে বেঁধে ছিলাম। কেন সেদিন তার সেই আবদার শুনেও তাকে অগ্রাহ্য করেছিলাম—ওগো তোমরা আমাকে বলো—কোথায় গেলে আমার গোপালকে দেখতে পাবো? আমার গোপাল সেদিন কাতর-কণ্ঠে কেমন বলেছিল—

আমায় বেঁধে রেখো না গো মা জননী!
আমি চুরি করে আর খাব না ননী॥

কিন্তু আমি এমনই নিষ্ঠুরা এমনই পিশাচী, সেদিন তার কথা শুনিনি। তাকে দুষ্ট ছেলে বলে তিরস্কার করেছিলাম।

নন্দালয়ে এরূপ যশোদা মায়ের বিলাপ ধ্বনি শুনে ছুটে এলেন গোপ গোপীরা। উদ্ধবের রথকে দেখতে পেয়ে কেউ কেউ ভাবলেন—হয়ত শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন তাই মা যশোদে স্নেহে বিভোর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন।

কেউ ভাবছে—আবার কি সেই অক্রুর এলেন? ঐ কালমুখো অক্রুরকে আর ফিরে যেতে দেবো না। এই সব বলতে বলতে চীৎকার ও চেঁচামেচি ক'রে গোপ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মতো বেশভূষাধারী উদ্ধবের চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াতে লাগলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ। জিজ্ঞাসা করলেন কত রকমের কথা।

উদ্ধব তখন কৃষ্ণের সমস্ত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে শুনতে লাগলেন। প্রাণ গোবিন্দের প্রতি তাদের ভালবাসা যেন ছাপিয়ে উঠল। তারা করতে লাগলেন অশ্রুমোচন।

উদ্ধব তখন বললেন—হে গোপীগণ, তোমরা শান্ত হও। সব ব্যথা ভুলে গিয়ে তোমাদের প্রাণনাথের কথা শোন। এই কথা বলে উদ্ধব পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে পড়তে লাগলেন—হে গোপ গোপীগণ, বিরহ ও মিলন—একই লীলার দুটি দিক্‌মাত্র। তোমরা যদি সর্বদা আমার ধ্যানকর কিংবা আমার কথা চিন্তা কর, তাহলে অচিরে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। হে গোপীগণ, আমি বৃন্দাবনে রাসক্রীড়ার প্রবৃত্ত হলে যে সকল গোপী পতিপুত্র কর্তৃক নিবারিত হয়ে রাস মহোৎসবে যোগ দিতে পারেনি—সেই গোপীগণ আমার গুণাবলী নিরন্তর চিন্তা করে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছে।

উদ্ধবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃতবাণী শ্রবণ করে গোপীগণ বুঝলেন যে রাস-লীলা উ লক্ষ্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণস্মরণ, শ্রীকৃষ্ণভজন ও শ্রীকৃষ্ণচিন্তনই সবধর্ম সার। রাস-লীলায় উপস্থিত থেকে তারা শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব সঙ্গলাভ করেছেন—এক্ষণে বিরহের সময় শ্রীকৃষ্ণচিন্তন ও শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করলে তারা সমভাবেই ফলপ্রাপ্ত হবেন।

উদ্ধব এইরূপে গোপীগণের বিরহব্যথা দূর করে মথুরায় ফিরে গেলেন।

একবিংশ অধ্যায়

● কুব্জার কৃষ্ণপ্রেম ●

যে ভাবে যে কৃষ্ণ ভজে যে ভাবে যে চায়।
ধন-মান-ঐশ্বর্য-বন্ধু-মুক্তি-ভক্তি পায়॥

শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গন্ধানুলেপন প্রস্তুত কারিণী কুব্জার গৃহে হলেন উপনীত। তা দেখে কুব্জা আনন্দে হয়ে উঠল দিশেহারা। সে কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করবে। চারিতার্থ হবে তার জীবন আর মন। চরিতার্থ হবে তার কাম।

এইসব ভাবতে ভাবতে সে তখন উজ্জ্বল বসন ভূষণ পরিধান করে গন্ধমাল্যে সুসজ্জিত হয়ে কৃষ্ণকে অভিনন্দিত করলেন। উপাদেয় খাদ্যে তৃপ্তি ভরে ভোজন করা-লেন। তার চামর দিয়ে ব্যজন পূর্বক সুকোমল শয্যায় নিয়ে তাঁর সাথে করতে লাগলেন রতিবিহার।

পরমপুরুষকে চিনতে পারলো না কুব্জা। পরমসম্পদ প্রাপ্ত হয়েও সে সেই সম্পদকে যথার্থ কাজে লাগাতে পারল না। শুকদেব পরীক্ষিতকে তাই বলেছিলেন—যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে ইন্দ্রিয় সুখ প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি কুবুদ্ধি সম্পন্ন। হতভাগিনী কুব্জাকে ধিক্।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্যশালী। তিনি বলেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজা-ম্যহম্'—যে আমাকে যেভাবে ভজনাকরে আমি তার সেই ভাব অনুযায়ী ফল প্রদান করে থাকি।

কুব্জা কৃষ্ণের কাছে ইন্দ্রিয় সুখ চেয়েছিল—তা পেল, সে ইচ্ছা করলেই মুক্তি

লাভ করতে পারত, কিন্তু করেনি। বিষয় ভোগ ছিল তার প্রবল। শ্রীভাগবত কুব্জাকে তাই 'উপস্থসুখলম্পদা'—ইন্দ্রিয় সুখলোভী বলে নিন্দা করা হয়েছে। আমরা অধিকাংশ মানুষই এক রকম। মানুষ আজ বুদ্ধি দোষে অখণ্ড আনন্দের উৎস শ্রীসচ্চিদানন্দকে ভুলে যশ-মান-অর্থ ও খণ্ড সুখের আশায় প্রাণপাত করছে, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই চায় সে তাকেই পায় আবার যে কৃষ্ণ সেবা করে যশ মান অর্থ চায় সে তাই পায়, তখন তার আর কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না। আমরা অনন্ত পার্থিব তৃষ্ণানি পীড়িত। তাই কৃষ্ণকে না চেয়ে তার কাছে ধন মান চাইছি। আমরা সকলেই যেন কুব্জার মত উপস্থসুখলম্পদ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

● অক্রুরের হস্তিনাপুরে গমন ও কুব্জা সাক্ষাৎকার ●

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণভজন জীবের প্রধান কাজ।
কৃষ্ণনামে মেতে ওঠ ত্যজি মান লাজ॥

অক্রুরকে হস্তিনাপুরে পাঠানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ একদা বলরাম ও উদ্ধবের সাথে তাঁর বাসভবনে গিয়ে বললেন—আপনার মতো সাধুকে পেয়ে আমরা ধন্য। দেবগণ স্বার্থপর—যতটুকু পূজা পায় ততটুকুই ফল তারা প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ অহেতুকী কৃপা করে থাকেন। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি জলময় তীর্থসমূহ ও দেবগণ বহুদিন সেবিত হলে তবে জীবগণকে পবিত্র করে থাকেন কিন্তু সাধুদর্শন হলে তৎক্ষণাৎ সুফল পাওয়া যায়। ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ করলেও সর্বসিদ্ধি হয়ে থাকে।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।

কিন্তু আমরাতো সাধারণভাবে প্রায়ই সাধুসঙ্গ করি। আশ্রমে যাই—সেখানে থাকি—আলাপ আলোচনা করি তবু আমাদেরতো সর্বসিদ্ধি হয় না।

সাধুসঙ্গ অর্থ সাধুর সাথে বাস বা সাধুকে প্রণাম করা বুঝায় না। সাধুসঙ্গ মনের একটা বিশিষ্ট অবস্থা। সাধুর গৃহে অনেক কীট পতঙ্গ থাকতে পারে [illegible] সাধুকে অহরহ দেখছে আবার সাধুর আশ্রমের পাশে অনেক ইতরপ্রাণী বাস করে তাহলেতো তারাও সর্বসিদ্ধিলাভ করতে পারত। না, সাধুসঙ্গের পূর্ণফল লাভ করতে হলে অহংকার বিমুক্ত হয়ে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও মাৎসর্যের ঊর্ধ্বচারী হয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। ধনীলোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত দারিদ্র্যব্যক্তি কিন্তু দীন নহে। বাসনা বিবর্জিত অহংকার শূন্য, সর্বরিক্ত, [illegible] বুদ্ধিত্যাগী সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনকারী গৃহীই প্রকৃত দীন।

আবার সাধুদের মনের ভাব নির্মল না হলে বাইরের সন্ন্যাসচিহ্ন সম্পূর্ণ নিষ্ফল। আজকাল অনেক সাধুই গৃহীর কর্তব্য ও সামাজিক কাজ করছেন। এমনকি আশ্রমের

বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেক সাধুকে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এতে সন্ন্যাসজীবন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। তাই বর্তমান যুগে সাধুসঙ্গ দুর্লভ।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বললেন—কুরুপাণ্ডবদের অবস্থা জানার জন্য আমার মন চঞ্চল। মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। আপনি দয়া করে হস্তিনাপুরে গিয়ে ওদের কুশল সংবাদ আনয়ন করুন।

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের কথা এড়াতে পারলেন না। সানন্দেই হস্তিনাভিমুখে করলেন যাত্রা।

অক্রূরকে দেখে কুন্তীদেবী বিশেষভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করে বিনীতভাবে প্রণাম করে বললেন—আমার পুত্রগণ অতি দুঃখের মধ্যে কাল যাপন করছে। আপনি কৃষ্ণকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন—তিনি যেন অবিলম্বে এখানে এসে আমাদের দুঃখ দূর করেন।

অক্রূর তখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—হে রাজন, আপনি সমদর্শী হয়ে রাজ্যলোভ ও অন্ধপুত্রস্নেহ ত্যাগ করুন। পাণ্ডবদের উপর নির্যাতন করবেন না। আপনার ঐ দুর্বিনীত পুত্রদের নিজহস্তে দমন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র অক্রূরের কোন কথাই নিলেন না। তিনি রাজা। সাধারণ সাধুর কথা তার কানে ভাল লাগবে কেন?

অগত্যা অক্রূর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন মথুরায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা ●

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা যেই জন পড়ে।
মুক্তিপদ লভি যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

কংসের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী অস্তি ও প্রাপ্তি পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে দুঃখের কাহিনী বললেন। জরাসন্ধ কন্যাস্নেহে বিমোহিত হয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং পৃথিবীকে যাদবশূন্য করার জন্য করতে লাগলেন উদ্যোগ। তারপর একদা অসংখ্য সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাদের সৈন্য নিধন করে করলেন পরাজিত। বলরাম বন্দি করলেন জরাসন্ধকে। কৃষ্ণ কিন্তু দয়াপরায়ণ হয়ে মুক্ত করে দিলেন তাকে।

মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন রাজা। তথাপি তিনি নিরুৎসাহ বোধ করলেন না। বহুসৈন্য নিয়ে সপ্তদশবার যদুগণেরসহিত যুদ্ধ করলেন কিন্তু প্রতিবারেই হলেন পরাজিত।

আয়োজন চলছে অষ্টাদশ বারের। এই সময় কালযবন তিনকোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য

নিয়ে মথুরা অবরোধ করল।

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন, কালযবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে যদি ঠিক সেই সময়ে মগধরাজ জরাসন্ধ এসে ওর সাথে যোগদান করে তাহলে অসংখ্য যদু উভয় সৈন্যের মধ্যে পড়ে হবে নিহত।

এইরূপ মন্ত্রণা করে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য প্রভাবে সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নির্মান করলেন এবং সেই দুর্গের মধ্যে তৈরী করলেন এক আশ্চর্য নগরী। নাম রাখলেন দ্বারকা।

নিমেষের মধ্যে দ্বারকার রূপ যেন ঝলমল করতে লাগল। অসংখ্য সারি সারি বিন্যস্ত প্রাসাদ। নানা বর্ণের—নানা রঙের সুন্দর সুচারু বৃক্ষলতা। সেই বৃক্ষে ঝুলছে অজস্র মন্দার মালিকা—অজস্র পুষ্প। দূরে দিগন্তের দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশ পৃথিবী আর সাত সমুদ্রের সুনীল হাতছানি—তাল তমালবনরাজী নীলার দূরতম প্রান্ত থেকে ভেসে আসা পুবালি হাওয়ার নবীন সুরের ছন্দ আর মিঠে সুরের আমেজ। ঝকমকে ঝাউবন, দেবদারু আর পাইন গাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে যায় কোকিলের কুহু কুহু কলতান। কদম্ব বৃক্ষের শাখায় উঠে ময়ূর ময়ূরীর কেকারব আর পাপিয়ার সুরঝংকার।

সামনে পেছনে সারিবদ্ধ গৃহের পাশাপাশি প্রশস্ত পথ। সারি সারি একতল দ্বিতল বাড়ী। সুরম্য প্রাসাদ। সুচারু সিংহদ্বার। সরু সরু অসংখ্য গলি। তার ভেতরে মিলনের প্রমোদ কানন। উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত প্রাসাদগুলির জ্যোতি অরোরার জ্যোতিকেও হার মানায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে দ্বারকায় নীল-লাল-হলদে ও সবুজ আলোর রহস্যময়ী জ্যোতিতে শুধু আমাদেরই নয়—মুনিরও মানস টলে অপরূপ চাকচিক্য মণ্ডিত রম্যোদ্যান—যেন মহামায়ার মায়া ঘেরা অপরূপ মায়া নিকেতন······

অপরূপ সৌন্দর্যের পীঠস্থান রূপবতী দ্বারকা। তার চোখে মায়ার অঞ্জন। সে যেন সৌন্দর্যের নবধারায় স্নান করে উঠেছে। মুখে তার লাবণ্যের সুস্নিগ্ধ আতর। অঙ্গে কোমল প্রশান্তি। প্রাশাদে প্রাশাদে সোনা রোদের হাসি। সারি সারি মনোরম সরোবরের ঝকঝকে নীলজলে হংসময়ালীর জলসার আসর। হৃদয় ভোলানো আলোর জোয়ারে আসে অভিসারের আমন্ত্রণ।

যাঁর মুখের মধ্যে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত হয়—তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য প্রভাবে এরূপ নগর যে সৃষ্টি করবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তারপর একদিন যোগমায়ার প্রভাবে বলরাম সহায়ে কালযবনের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মথুরাবাসীকে নব নির্মিত নগরে অপসারিত করলেন এবং কালযবনকে বধ করার জন্য একাকী মথুরাপুরী থেকে বাহির হলেন।

কৃষ্ণ চলেছেন নির্জনে নিভৃতে সবার অলক্ষ্যে। কৃষ্ণকে দেখে কালযবন বিলম্ব না করে একাকী তাঁকে অনুসরণ করল। এভাবে কৃষ্ণকে অনুসরণ করতে করতে সে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতগুহায় করল অনুপ্রবেশ। সন্ধ্যার অস্পষ্ট তরল অন্ধকারের কাল-

যবন দেখল—কে একজন পর্বত গুহায় শয়ন করে আছে। ভাবল—এইতো সেই কৃষ্ণ, নিদ্রার ভান করে কালযবনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। একথা ভেবে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই শায়িত ও সুপ্ত দেহের উপর করল পদাঘাত। নিদ্রিত পুরুষ তখন জাগরিত হয়ে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করলেন আর তার সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাতে অগ্নিঝরা রশ্মিতে কালযবন মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল ভস্মরাশিতে।

কিন্তু কে সেই পুরুষ—যিনি শুয়ে ছিলেন?

শ্রীশুকদেব বললেন—সেই পুরুষ ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুচুকুন্দ নামে খ্যাত। তাঁর পিতার নাম মান্ধাতা, পূর্বে দেবতাগণ অসুরভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধে মুচুকুন্দকে সাহায্য গ্রহণ করতেন কিন্তু পরে কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি রূপে প্রাপ্ত হয়ে মুচুকুন্দকে অবসর প্রদান করলেন। মুচুকুন্দের সমস্ত সাহায্য স্বীকার করে কৃতজ্ঞ চিত্তে দেবগণ তাঁকে বলেছিলেন—আপনার মঙ্গল হোক। এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিকট মোক্ষ ব্যতীত অপর যে কোন বর ইচ্ছা প্রার্থনা করুন, আমরা প্রদান করব। মোক্ষ দেবার শক্তি আমাদের নাই, একমাত্র অব্যয় ভগবান বিষ্ণুই মুক্তি প্রদান করতে সমর্থ।

তখন মুচুকুন্দ দেবতাগণের কাছে এই বর প্রার্থনা করলেন যে তিনি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে কালযাপন করবেন এবং যে তার নিদ্রাভঙ্গ করবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সেই মুচুকুন্দ বৃথা নিদ্রার বর প্রাপ্ত হয়ে এতদিন মুক্তিদাতা কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। আজ স্বয়ং নারায়ণ গিরিগুহামধ্যে তাঁর সামনে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ তখন কৃপা করে মুচুকুন্দকে নিজ স্বরূপ দর্শন করালেন। বিস্মিত পুলকিত মুচুকুন্দ দেখলেন- ঘনশ্যাম, পীত কৌষেয়বসন, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ, চতুর্ভুজ এক পরমসুন্দর পুরুষ স্বীয় জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান।

তাঁকে কৃষ্ণ বলে জানতে পেরে মুচুকুন্দ তাঁর স্তবস্তুতি আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—তুমি মৃগয়াদি করে যে পাপ করেছ, তাথেকে মুক্তি লাভের জন্য বদরিকাশ্রমে গিয়ে শ্রীহরির সাধনা কর। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। মুচুকুন্দও বদরিকাশ্রমে গিয়ে হরির ভজনা আরম্ভ করলেন।

এরপর বহু ম্লেচ্ছসৈন্য বধ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। ইতিমধ্যে জরাসন্ধ পুনরায় বহু সৈন্য নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁকে আরো বেড়ে উঠতে সুযোগ দিয়ে প্রবর্ষণ নামক এক পর্বতে নিলেন আশ্রয়। জরাসন্ধ তখন সেই পর্বতের চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে পর্বতটিকে দগ্ধ করার উপক্রম করলে ওরা দু ভাই জরাসন্ধের অলক্ষিতে পর্বত পরিত্যাগ পূর্বক দ্বারকায় আগমন করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম দগ্ধ হয়েছেন মনে করে জরাসন্ধ তখন নিজের সৈন্যগণকে ফিরে নিয়ে মগধদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

* * *

ব্রহ্মণ্‌ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কোনু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥ ১০।৫২।২০

কৃষ্ণ চরিত্র কর্ণযুগলের সুখকর। জীবের পাপনাশক ও পুণ্যফলপ্রদ। এই কৃষ্ণ-কথা অবিরাম শুনেও তৃপ্তি হয়না। উত্তরোত্তর যেন নতুন বলে মনে হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

● রুক্মিণীহরণ ●

জগতের মাঝে হয় হরিণাম সার।
হরি বিনা কেবা আর করিবে নিস্তার॥

বিদর্ভদেশে ভীষ্মক নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁর পাঁচপুত্র এবং রুক্মিণী নামে এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। বাল্যকাল থেকে পিতৃগৃহে রুক্মিণী কৃষ্ণের রূপগুণ ও পরাক্রমের কথা শ্রবণ করে কৃষ্ণকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করে তাঁরই চিন্তায় সর্বদা বিভোর হয়ে থাকতেন। কৃষ্ণও এখবর শুনে অসামান্যা রূপসীকে বিয়ে করতে রাজী হলেন কিন্তু এই বিবাহে বাদ সাধলেন ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী। তিনি চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে ভগ্নীকে সমর্পণ করবার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। রুক্মিণী দুঃখিত মনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক গোপনে একখানি পত্র লিখে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই পত্র কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করলেন। রুক্মিণী লিখেছিলেন—হে কমললোচন, আমার বিয়ের দিন আসন্ন, তুমি তো জান আমি বাল্য থেকেই তোমাকে মন প্রাণ উৎসর্গ করেছি। আমার অগ্রজ শিশুপালের সাথে আমার বিয়ে দিতে চান। আমি যদি সত্যিকারের তোমাকে ডেকে থাকি আর তুমিও যদি সত্যিকারের ভক্তের ডাকে সাড়া দাও এবং ভক্তের ভগবান-রূপে খ্যাত হও, তাহলে আগামীকাল বিয়ের প্রাকলগ্নেই আমাকে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে যেও। সিংহের ভোগ্যবস্তু শৃগাল যেন অপহরণ না করে।

কাত্যায়নীদেবীর পূজা করে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেয়েছিলেন। আজ পার্বতীর পূজা করে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণমহিষী হওয়ার প্রতীক্ষা করে আছেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত। কুলপ্রথা অনুসারে রুক্মিণীদেবী সখী পরিবৃতা হয়ে সৈন্যসমভিব্যাহারে দেবী অম্বিকার মন্দিরে পূজা দিতে চলেছেন। সেদিন রাজপথের কী দারুণ শোভা চারিদিকে সমাগত বরপক্ষের লোকজন। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ! মনের মধ্যে শুধু কৃষ্ণ চিন্তা!

তিনি রথে উঠতে গিয়েছেন এমন সময় কোথা থেকে কৃষ্ণ এসে সেই রথকে চালিয়ে দ্রুতবেগে পালাতে লাগলেন। সেনাপতিগণ বাধা দিতে লাগল প্রবল যুদ্ধ। যুদ্ধে সবাই পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীকে দ্বারকায় এনে বিধি অনুসারে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণ চিন্তা করে রুক্মিনী অবশেষে কৃষ্ণকেই লাভ করল। (৫ম দিবস শেষ।)

এরপর শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে তার প্রাসাদে প্রবেশ পূর্বক ষোড়শ সহস্র

ক্ষত্রিয় কন্যাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে দ্বারকায় তাঁদের অভিপ্রায় মত নিয়ে এসে নিজে ষোড়াসহস্র দেহ ধারণ পূর্বক একই শুভলগ্নে বিয়ে করেন। এদের মধ্যে ৮জন মহিষী প্রধান। (১) রুক্মিণী, (২) সত্যভামা, (৩) জাম্ববতী (৪) নাগ্নজিতী (৫) কালিন্দী (৬) লক্ষণা (৭) মিত্র বিন্দা (৮) ভদ্রা।

শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে প্রত্যেক মহিষীর গর্ভে দশজন করে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

● নৃগরাজার কাহিনী ●

হরির পূত নাম করে যেই জন।
সর্বপাপ মুক্ত হয় বেদের বচন ॥

একদিন প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারু, ভানু, গদ প্রভৃতি কৃষ্ণপুত্রগণ ক্রীড়া হেতু উপবনে গমন করছিলেন। তাঁরা পিপাসিত হয়ে জল অন্বেষণ করতে করতে একটি জলশূন্য কূপে দেখতে পেলেন এক অদ্ভুত প্রাণীকে। ঐ প্রাণী একটি কৃকলাস। তারপর বহুচেষ্টা করেও তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করতে পারলেন না কুমারগণ।

ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন সমস্ত কথা তখন কৃষ্ণ কূপসমীপে এসে স্বীয় বাম হস্তের দ্বারা অনায়াসে কৃকলাসকে কুপ থেকে তুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। কৃকলাসটি কৃষ্ণহস্তস্পর্শ পাওয়া মাত্র এক দিব্যমূর্ত্তিতে পরিণত হল। শ্রীরামচন্দ্রের পূতপাদস্পর্শে যেমন পাষাণী অমূল্য রক্তমাংসের নারী অহল্যায় পরিণত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি। তারপর সেই মূর্ত্তিটি শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করে বললেন—আমি ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি। নাম—নৃগ। আমি রাজত্বকালে অসংখ্য গাভী দান করেছিলাম। তার মধ্যে একটি গাভী দলভ্রষ্ট হয়ে আমার নিজস্ব গাভীর সহিত মিলিত হয়। ঐ গাভীটিকে আমি ভুল বশতঃ অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করি। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে গাভী নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হলে তারা আমার কাছে হলেন উপস্থিত। আমি তখন একজনকে একটি গাভীর বিনিময়ে লক্ষগাভী দিতে স্বীকৃত হলাম। কেউ তাতে রাজী হলেন না। তখন ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করলেন। কালক্রমে আমার মৃত্যু হয়। যমরাজ আমাকে বললেন—শুভ ও অশুভ—এদুই কর্মের মধ্যে তুমি কোন কর্মের ফল আগে ভোগ করতে চাও?

আমি আগে অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতে চাই—একথা বলার পর হঠাৎ আমি কৃকলাসে পরিণত হয়ে কূপমধ্যে পতিত হলাম। এক্ষণে আপনার স্পর্শে আমি মুক্ত হয়েছি। হে দেবদেব, হে জগন্নাথ, হে প্রাণগোবিন্দ, হে পুরুষোত্তম, হে নারায়ণ, হে হৃষীকেশ, হে পুণ্যশ্লোক, হে অচ্যুত, হে অব্যয়, হে শ্রীকৃষ্ণ, হে প্রভো, হে অক্ষয়, আপনি আমাকে অনুমতি দিন—আমি যেন এবার দেবলোকে যেতে পারি। আমি যেখানেই থাকি সেখানেই যেন আপনার সহস্র নাম স্মরণ করতে পারি।

'তথাস্তু' বলে নৃগকে অনুমতি দিলেন কৃষ্ণ। রাজা সানন্দে স্বর্গে চলে গেলেন।

অতএব ভগবানকে ভুলে থাকার মত জীবের দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

● বলরামের গোকুলে আগমন ●

ধর্মসংস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ অবতার।
বলরামও একথা বলেছেন বারবার ॥

শ্রীকৃষ্ণ একদা বলরামকে বললেন—ভাই বলাই, গোকুলে আত্মীয় স্বজনদের জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মা যশোদা আর পিতা নন্দ অহরহ চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। গোকুলের গোপগোপীগণ আমার বিরহে কাতর। আমি অহরহ ওদের করুণ স্বরের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। তুমি একবার সেখানে যাও ভাই, ওদেরকে আমার সমস্ত কথা জানিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এসো।

বলরাম বললেন—আমার কথায় ওরা কোনদিন সান্ত্বনা পাবে না কানাই। তবে ওদের দেখার জন্য আমিও উৎগ্রীব হয়ে উঠেছি। তুমি সাবধানে থেকো। আমি আগামী কাল প্রাতেই গোকুলাভিমুখে রওনা হব।

শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলে বলরাম গোকুলে আগমণ করলেন। গোকুলের সন্নিকটে আসতেই তাঁর মন পুনঃমিলনের গভীর আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা যেন ডালপালা নেড়ে গাইতে লাগল—

ওরে দেখে যা দেখে যা দেখে যারে—
বলরাম গোকুলে এসেছে আজ ফিরে।

বলরামকে দেখে চারপাশ থেকে সমস্ত আত্মীয়স্বজন ছুটে এল তাঁর সামনে। সবাইয়ের মুখে এক প্রশ্ন—কৃষ্ণ কোথায়? সে কবে আসবে?

যশোদা বললেন—প্রাণের গোপালকে একা ফেলে কেন এলি তুই বলরাম? কানাই ছাড়া যে প্রাণ বাঁচে না রে!

বলরাম নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করে বললেন—দুঃখ করো না মা! তোমার কানাই সাধারণ ছেলে নয়। এক অসাধারণ ক্ষমতার অধীশ্বর। কেউ কোথাও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সে মথুরার কংসরাজাকে বধ করেছে—দ্বারকাতে গিয়ে নতুন শহর নির্মাণ করেছে। সমস্ত দেশ তার কাছে পরাভূত।

বলরামের মারফৎ কৃষ্ণের এহেন বীরত্বের কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে গোপীগণ বললেন—আমাদের প্রাণসখা বড় নিষ্ঠুর···মায়ামমতা বলে তার কিছুই নেই। সে মানুষ নয়।

একথা শুনে বলরাম গোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—প্রাণ কানাই মাটির মানুষ নয়। সে একজন অবতার অনেক কাজ মাথায় নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে।

দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ আর ধর্মসংস্থাপনের জন্য এ জগতে তাঁর আবির্ভাব। তাইতো আজ তিনি সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে ধর্মস্থাপন করে চলেছেন। এতে তোমাদের দুঃখ করার কিছু নেই। তোমরা অতো কাতর হয়ো না।

এই সব কথা বলতে বলতে ভাবে বিভোর হয়ে তিনি—কৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণনা করতে লাগলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

● রাজা পৌণ্ড্রকের কাহিনী। (পৌণ্ড্রকের বাসুদেব লীলা) ●

ঈর্ষাহেতু কৃষ্ণচিন্তা সেও বরং ভাল।
সেই রূপ ধারণে পৌণ্ড্রক স্বর্গে চলে গেল॥

বাসুদেবের নাম তখন সারা ভারতময়। দেশের প্রত্যেকেই তাকে দেখার জন্য ব্যাগ্রপ্রা। ঘরে ঘরে শুধু কৃষ্ণের নাম।

করুষদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক ঈর্ষাবশতঃ জনসমাজে প্রচার করলেন যে তিনিই বাসুদেব—তিনিই কংস বধ করেছেন।

কৃষ্ণের কর্ণগোচর হল এ কথা। তিনি তখন পৌণ্ড্রককে দেখার জন্য গমন করলেন কাশীতে। পৌণ্ড্রক তখন তাঁর আত্মীয় কাশীরাজের আলয়ে বাস করছিলেন।

কৃষ্ণকে দেখেই পৌণ্ড্রক বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধং দেহি' বলে হেঁকে দাঁড়ালেন। অজস্র মানুষ দেখল, পৌণ্ড্রক কখনো শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্ম ধারণ করেছেন কখনো বা কৃষ্ণের মতই সুদর্শন চক্র নিয়ে যুদ্ধ করছেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ ছদ্মবেশধারী। সবাই দেখছে রণক্ষেত্রের দুপাশে দুজন কৃষ্ণ। দুজনের বুকেই শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় বনমালা ও কৌস্তুভ মণি। সবাই অবাক, উভয়েরই পীতবসন—রথের ধ্বজায় গরুড় চিহ্ন।

রণক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। সবাই দুজন কৃষ্ণের যুদ্ধ দেখছেন। আসল নকল আজ ধরা বড় কঠিন। অবশেষে পৌণ্ড্রক আপন মস্তক বিসর্জন দিয়ে বাসুদেবলীলা সংবরণ করলেন। সাহায্যকারী কাশীরাজও নিহত হলেন।

পৌণ্ড্রক সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ ও চিন্তা করার ফলে তিনিও শ্রীহরির রূপ প্রাপ্ত হয়ে নিত্যধামে গমন করলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

● নারদের দ্বারকা দর্শন ●

শ্রেয়ের শ্রেয় কৃষ্ণ যিনি মায়ার মায়া।
পূজ তারে সরল প্রাণে—এক চিত্ত হৈয়া॥

ষোল হাজার রাজকন্যাকে বিয়ে করে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করছেন তা

দেখার কৌতূহল নিয়ে দেবর্ষি নারদ একদা দ্বারকানগরীতে উপনীত হলেন। অপূর্ব রমনীয় দ্বারকাপুরী দেখে বিস্মিত হয়ে অবশেষে কৃষ্ণনাম করতে করতে প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। যে প্রাসাদটিতে তিনি প্রথমে প্রবেশ করলেন সেখানে রুক্মিণীদেবী সহস্র দাসীর সহিত মিলিত হয়ে যদুপতি কৃষ্ণকে চামর ব্যজন করছিলেন।

নারদকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ উঠে এসে প্রণাম পূর্বক আপন শয্যার উপর উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর চরণ ধৌত করে ঋষিপাদ প্রক্ষালিত জল নিজ মস্তকে করলেন ধারণ।

বিস্মিত হলেন নারদ।

তিনি তখন কৃষ্ণের 'যোগমায়া বিবিৎসয়া'—যোগমায়া জানবার ইচ্ছায় অন্য এক মহিষীর প্রাসাদে গেলেন। দেখলেন, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ভক্ত উদ্ধবের সহিত পাশাক্রীড়া করছেন। যেন পূর্বে নারদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি এরূপ ভাব দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা পূর্বক তার পাদোদক মস্তকে নিলেন।

দেবর্ষি অপর এক প্রাসাদে গিয়ে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রদের লালন পালন করছেন। এইরূপ প্রাসাদ থেকে প্রাসাদান্তরে যেতে যেতে দেবর্ষি দেখতে পেলেন সেই একই কৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে বহু দেহ ধারণ করে বহু মহিষী ও সন্তান নিয়ে ব্যস্ত আছেন। দেবর্ষি কৃষ্ণের এই মায়া ঐশ্বর্য দর্শন করে হাসতে হাসতে বললেন—হে যোগেশ্বর, আপনার যোগমায়া যোগিগণের দুর্জ্ঞেয়। তথাপি আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্বদা সেবা করি বলে সেই বিভূতি জানতে পেরেছি।

* * *

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ ও নিত্য কৃত্য সমাপন করে তাঁর সুধর্মা নামে এক সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। এমন সময় এক দূত এসে বলল—মগধরাজ দশহাজার রাজাকে গিরিব্রজনামক দুর্গে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন ঐসব রাজাদের মহা-ভৈরবযজ্ঞে তিনি বলি দেবেন। তাঁদের মুখপাত্র হয়ে আমি আপনার কাছে, এসেছি। আপনি রাজাদের মঙ্গল করুন প্রভু।

ঠিক এই সময়ে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন—যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করছেন। সেখানে আপনাকে এখুনি যেতে হবে।

কোন কার্য আগে করবেন তা ভাবতে না পেরে ভক্তবৎসল শ্রীহরি উদ্ধবের শরণাপন্ন হলেন। উদ্ধব বললেন—আপনিতো বলেছেন 'পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। অতএব সাধুদের পরিত্রাণের জন্য অর্থাৎ বন্দী নির্দোষ রাজাদের মুক্তির জন্য আগে জরাসন্ধকে বধ করতে হবে। তারপর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদান। দিক্‌জয়ের পর যজ্ঞ।

কৃষ্ণ অবনত মস্তকে মেনে নিলেন একথা। তারপর পত্নীদের সহিত হস্তিনাপুরে গেলেন।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞেশ্বরকে পেয়ে খুবই আনন্দিত, কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে তিনি কৃষ্ণপূজার মন্ত্র ভুলে গেলেন।

এটাই হয়। যতক্ষণ ঈশ্বর সামনে নাই ততক্ষণ মন্ত্রপাঠ, হোম, পূজা আসন ইত্যাদি। ঈশ্বরের সামনে এলে সব ভুল হয়ে যায়। তখন মন্ত্র মনে আসে না। ভক্তের দেহ মন তখন প্রদীপ হয়ে ভগবানের সামনে জ্বলতে থাকে। মন যেন হারিয়ে যায়। কথা হচ্ছে, গভীর অনুভূতির ভাষা নাই। অনুভূতি যখন অগভীর তখন মন্ত্র, দূর্বা-ফুল আরো কত কী।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

● জরাসন্ধ বধ ●

যে কথাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম মাত্র নাই।
সে সকল মিথ্যাকথা জানিবে সদাই॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলছে। উদ্ধবের পরিকল্পনা অনুসারে একদিন ভীমসেন, অর্জুন ও তাঁদের মাতুলপুত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশীল জরাসন্ধ তাদেরকে ক্ষত্রিয় বলে সন্দেহ করেও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কৃষ্ণ বললেন—আমরা ক্ষত্রিয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থী হয়ে এসেছি। তাছাড়া এরা হচ্ছে—

আসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতাজ্জুনো হ্যয়ম্।
অনদোঃ মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহিতে রিপুম্॥ ১০।৭৩।২৯

—ইনি কুন্তীনন্দন ভীমসেন, ইনি অর্জুন আর আমি এদের মাতুলপুত্র ও তোমার শত্রু কৃষ্ণ।

একথা শুনে মগধরাজ জরাসন্ধ উচ্চহাস্য করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্রতী হওয়ার আয়োজন করলেন। জরাসন্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি এমন ভক্তিমান ও ধর্মভীরু যে শত্রুকে ব্রাহ্মণরূপে দেখে কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করলেন না। ২৭ দিন ব্যাপী চলল ঘোর মল্লযুদ্ধ। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। প্রতি রাত্রে যুদ্ধ বন্ধ থাকত। তখন রাজা জরাসন্ধ যথোচিত মর্যাদায় শত্রুদের আতিথ্য প্রদর্শন করতেন। আহার শয্যা ও বাসগৃহ প্রতিদিনই ব্যবস্থা করে দিতেন ইচ্ছে করলে রাত্রিতে সেই ঘরের মধ্যে তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু না। জরাসন্ধ ধার্মিক—সত্যসন্ধ। ধর্মযুদ্ধ তিনি চান।

পরিশেষে ভীমকে একখানা গদা দিয়ে উভয়ে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কৃষ্ণকে ভীরু বলে নিন্দা করলেন। গদা ভেঙে গেলে পুনরায় মল্লযুদ্ধ হয়। ভীম আর পেরে উঠতে পারছেন না।

শ্রীকৃষ্ণ তখন চিন্তা করলেন জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত। মনে পড়ল জরা রাক্ষসীর দ্বারা যুক্ত জরাসন্ধের দেহ। পরদিন যুদ্ধে ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণ সংকেত গ্রহণ করে জরাসন্ধকে দু'খণ্ডে বিদারিত করে ফেললেন।

জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ অপুত্রক বলে বনে গমন করলে চণ্ডকৌশিক নামে এক ঋষির সাথে তার দেখা হয়। ঋষি তাকে একটি আম্রফল প্রদান করে বললেন, এই ফলটি তোমার পত্নীকে খাওয়ালে তার পুত্র সন্তান হবে। পত্নীবৎসল রাজা তখন আমটিকে দুখণ্ডে ভাগ করে দুই মহিষীকে খাওয়ালেন। ফলে দুইরানী প্রত্যেকে অর্ধ খণ্ড শিশুদেহ প্রসব করলেন। রাজা বৃহদ্রথ দুঃখিত হয়ে ঐ শিশুখণ্ড দুটিকে শ্মশানে ফেলে দেন। তখন জরা নামে এক রাক্ষসী সেই খণ্ড দুটিকে কৌতূহল বশতঃ একত্রে যোজনা করা মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বালক সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। জরা তাকে বৃহদ্রথের কাছে নিয়ে যায়। জরা বলেছিল, পুনরায় দুই খণ্ডে বিভক্ত না হলে ঐ শিশুর মৃত্যু হবে না। জরা রাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিত বলে বালকের নাম হয় জরাসন্ধ।

জরাসন্ধ নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণ বন্দী রাজাদের মুক্তি দেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

● শিশুপাল বধ ●

কৃষ্ণধ্যান কর তুমি কৃষ্ণ হয়ে যাবে।
ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা পাবে॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হল। বহু মুনি, ঋষি, রাজা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এসেছেন এই যেজ্ঞ। এখন প্রশ্ন উঠল এই যজ্ঞে কে আগে পূজা পাবেন?

মাদ্রীপুত্র সহদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অগ্রে পূজা পাওয়ার যোগ্য।

সভাস্থ সবাই 'সাধু-সাধু' বলে সহদেবের কথা সমর্থন করলেন।

তখন দমঘোষ নন্দন শিশুপাল উত্তেজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। বললেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক। অগ্রে পূজা পাওয়ার যোগ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ কোন কথা বললেন না। সভাসদগণ দুঃসহ ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করে চেদিরাজকে তিরস্কার করতে করতে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। কারণ—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুত॥ ১০।৭০।৪০

—যে ব্যক্তি ভগবানের কিংবা ভগবৎপরায়ন ব্যক্তির নিন্দা শুনে সেখান থেকে চলে না যায় সেই ব্যক্তি পুন্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নরকে গমন করে।

বীরগণ শিশুপালকে বধ করার জন্যে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করলেন। লাগল

প্রবল সংগ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন সকলকে নিবারণ করে একাকী সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

আকাশ থেকে বিচ্যুত উল্কা যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে সেইরূপ চেদিরাজ শিশুপালের দেহ থেকে সমুত্থিত এক অপূর্ব জ্যোতি তখন সর্বলোকের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দেহের সঙ্গে মিশে গেল।

শিশুপাল কখনো কৃষ্ণকে সুনজরে দেখতে পারতেন না। কৃষ্ণকে শত্রু হিসাবে দেখে তিনি সারূপ্যমুক্তি লাভ করলেন। ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

'ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভব কারণম্।'

হিরণ্যকশিপু, দশানন ও শিশুপাল—এই তিনজন্মে পুঞ্জীভূত যে বৈরীভাব তার ফলে শিশুপালের সমগ্র মন ভগবানের চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর পরে ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হল।

অতঃপর নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হল রাজসূয় যজ্ঞ। এই বিরাট যজ্ঞে ভীমসেন পাকশালার ভার গ্রহণ করলেন। দুর্যোধন কোষাধ্যক্ষ। সহদেব অভ্যর্থনা ও নকুল এবং শ্রীকৃষ্ণ অতিথিগণের পাদপ্রক্ষালন কার্য করেছিলেন।

যে কৃষ্ণ সমগ্র মুনি, ঋষি, সাধু, ব্রাহ্মণ ও রাজা মহারাজাকে অতিক্রম করে যজ্ঞের অগ্রপূজা গ্রহণ করেছিলেন। সেই কৃষ্ণই আবার তাঁর কিরীট পরিশোভিত মস্তক অবনত করে সকলের পাদধৌত করে দিলেন। প্রভু 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়।' শিশুপাল তাকে চিনবেন কি করে ?

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।

—আমি যোগমায়ায় সমাবৃত বলে সকলে আমাকে চিনতে পারে না। ভক্ত ও ভগবান যে অভিন্ন এবং ভক্তের প্রতি ভগবান যে কিরূপ দীনতা দেখায় তা আমরা পবিত্র কীর্তি কৃষ্ণের গুণসমূহ কীর্তন করে বুঝতে পারি।

যে বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণের গুণ কীর্তন করা হয় তাই প্রকৃত বাক্য। যে হস্ত অর্চনাদি করে সেটাই প্রকৃত হস্ত। যে মন তাঁকে সর্বদা স্মরণ করে তা'ই প্রকৃত মন, যে কর্ণ সর্বদা তার লীলাকথা শোনে তাই প্রকৃত কর্ণ, যে মস্তক বিষ্ণুর চরণে নত হয় তাই প্রকৃত মস্তক, যে চক্ষু সর্বদা তাকেই প্রত্যক্ষ করে তাই প্রকৃত চক্ষু আর যে অঙ্গ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের পাদোদক ধারণ করে সেই সকল অঙ্গই প্রকৃত অঙ্গ।

শিশুপালের জন্ম রহস্য

শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ইনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন এবং জাতমাত্র গর্দভের মত চীৎকার করতে লাগলেন।

এই দৃশ্য দেখে ওর মাতাপিতা ভীত হয়ে ওকে ত্যাগ করতে উদ্যত হন। এমন সময় দৈববাণী হল—হে নৃপতে! মা ভৈঃ, অনাকুল হয়ে এই পুত্রকে পালন কর।

যম এর অন্তক নয়। এর প্রাণ কেবল অন্য দ্বারা নিহত হবে। যিনি এর জীবন হন্তা, তিনিও উৎপন্ন হয়েছেন।

একথা বলে দৈববাণী নিস্তব্ধ হলে জননী পুত্র স্নেহে অভিভূত হয়ে বলতে লাগলেন—যিনি আমার পুত্রের প্রতি এই আকাশ বাক্য প্রয়োগ করলেন, তিনি দেবতাই হোন আর অন্য কেউ হোন, আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে তাকে নমস্কার করছি। তিনি যথার্থতঃ প্রকাশ করে বলুন—কে আমার সন্তানের কালান্তক হবে?

তখন দৈববাণী হল—"হে দেবি, তোমার পুত্র যাঁহার অঙ্কদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গপ্রতীম অধিক ভুজদ্বয় ক্ষিতিতলে বিগলিত হইবে এবং যাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাট নিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করিবেন"।

অন্যান্য পার্থিবগণ ত্রিনেত্র এবং চতুর্ভুজ শিশুকে দেখতে এলেন। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সৎকার করে একে একে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করলেন। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক পৃথক রূপে রাজাগণের অঙ্কারূঢ় হলেন, কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারবতী নগরীতে ছিলেন, এরা এই ব্যাপার শুনে পিতৃষ্বসাকে দেখবার নিমিত্ত চেদিপুরী আগমন করলেন। জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভূপতিকে পিতৃষ্বসাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে উপবিষ্ট হলে দেবী যাদবী শিশুপালকে দামোদরের কোলে প্রদান করলেন। তাঁর অঙ্কে অর্পিত হওয়ামাত্র ভুজদ্বয় স্খলিত ও ললাটস্থ ত্রিলোচন তিরোহিত হল। তখন শিশুপাল জননী ভীত ও ব্যথিত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন—হে মহাভুজ! এই ভয় কাতরকে বর প্রদান কর।

শিশুপাল জননীর এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করে কৃষ্ণ বললেন—হে মহাভুজ। এই ভয়কাতরকে বর প্রদান কর।
হইবেন না, আমা হইতে আপনার ভয় নেই। হে পিতৃষ্বসঃ! আমি আপনাকে কি বর দিব—তা আজ্ঞা করুন।

শিশুপালজননীর এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করে কৃষ্ণ বললেন—"হে দেবি, ভীত

রাজা মহষী কৃষ্ণ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হয়ে বললেন—হে মহাবল যদু প্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। এই আমার প্রার্থনা।

বাসুদেব একথা শুনে বললেন—আপনি শোক করবেন না। আমি আপনার পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করব।

কিন্তু একদা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞালয়ে বাসুদেবের বর্তমানে শিশুপাল বললেন—তার চেয়ে বড় রাজা আর কেউ নেই। তিনিই পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বীর। দ্বারকাধি পতি সামান্য ব্রাহ্মণমাত্র।

ভীষ্ম এতে বাধা দিতে গেলে শিশুপাল পুনরায় বললেন হে ভীষ্ম, তোমার বুদ্ধি প্রকৃতির অনুগত নয়। তুমি বৃদ্ধ জরদগরব। তা না হলে এত রাজা থাকতে সামান্য এক ভিখিরিকে সমর্থন করছ?

ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে কৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দিতে উদ্যত হন। তখন শিশুপাল কৃষ্ণকে বললেন—হে জনার্দন তুমি আমার সাথে সংগ্রাম করতে উদ্যত হও? তুমি রাজা নহে। তুমি পূজার অযোগ্য। তোমার সাথে পাণ্ডবগণকে বধ করা আমার কর্তব্য। তোমাকে বধ করে রুক্মিণীকে আমি অঙ্কসায়িনী করতে চাই।

ভগবান মধুসূদন শিশুপালের এইরূপ শত অপরাধমূলক কথা শুনে বললেন—হে মহীপালগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, এই শিশুপালের মাতা পূর্বে আমার কাছে পুত্রের শত অপরাধ মার্জনা করার কথা বলেছিলেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে ওর একশত অপরাধ পূর্ণ হয়েছে। অদ্য ওকে আপনাদের সমক্ষেই সংহার করব।

এই কথা বলে তিনি শিশুপালকে চক্র দ্বারা বধ করেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

● শ্রীদাম সখা ●

হরি যদি গ্রহণ করে একমুষ্টি চিঁড়ে।
সর্বৈশ্বর্য এসে যায় তার কুঁড়ে ঘরে॥

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের সখা। শ্রীদাম দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অর্ধাশনে-অনশনে তাঁর কাটত দিন। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তার দিন আর চলে না। একদা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে ব্রাহ্মণপত্নী স্বামীর নিকট বললেন—তুমি তো বারবারই বল, শ্রীকৃষ্ণ তোমার বাল্যকালের ঘনিষ্ট বন্ধু। এখন এই দুঃখের দিনে তার কাছে যাও না! যদি আমাদের দারিদ্রতা মোচন করেন।

শ্রীদাম বিষয়বস্তুতে বিগতস্পৃহ। বিশেষতঃ বন্ধুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাও তাঁর পক্ষে লজ্জাকর, আবার প্রত্যাখ্যানেরও ভয় আছে। তাই পত্নীর উপদেশ শুনে তিনি প্রথমে নীরব রইলেন। কিন্তু বারবার স্ত্রীর অনুরোধে দ্বারকায় বন্ধু কৃষ্ণের বাড়ীতে যেতে সম্মত হলেন। ভাবলেন—কিছু না হোক, কৃষ্ণ দর্শন তো হবে। সেটাইতো জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ। বিষয় সম্পত্তির চেয়ে কৃষ্ণদর্শনতো অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বহুদিন পরে যখন যাচ্ছি, তখন একটা উপহার না নিয়ে গেলে কি মানায়? এই ভেবে দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহারাজ কৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত ভিক্ষা করতে বের হলেন। ঘুরে ঘুরে অবশেষে চার মুষ্টি চিঁড়া পাওয়া গেল।

শ্রীদাম ভাবছেন—সামান্য চিঁড়া রাজাকে দেব কি করে? আবার ভাবছেন—চিঁড়া দেখলে ব্রজধামের বাল্যলীলা তাঁর মনে পড়বে—সেই সকালে ক্ষীর সর ননী খেয়ে সখাগণের সহিত গোচারণে গমন, সেই বনভূমিতে বৃক্ষতলে বসে সখামণ্ডলে পরিবৃত হয়ে মাতা যশোদা প্রদত্ত চিঁড়া ও দধি ভক্ষণ, সেই সন্ধ্যাবেলা ধূলিধূসরিত দেহে নন্দগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—সবই চিঁড়া দেখে মনে পড়ে যাবে তার। সত্যি তো—সখা চিঁড়া খেতে ভালবাসে। চিঁড়া ব্রজ জীবনের সঙ্গে, গোপজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। চিঁড়াই ভাল। চিঁড়া দেখে তার বাল্যকালের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

তাছাড়া দরিদ্র কৃষ্ণসখা মহারাজ কৃষ্ণের জন্য হীরা মনিমাণিক্যের উপহার কোথায় পাবেন ? এইসব ভেবে ব্রাহ্মণ একখানি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে সেই চারমুষ্টি চিঁড়া বেঁধে নিয়ে দ্বারকাভিমুখে করলেন যাত্রা।

দ্বারকা—লক্ষ লক্ষ প্রাসাদে পরিশোভিত। মহামহিমামণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের মায়া ঐশ্বর্য দ্বারা সৃষ্ট দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণ মনের মতো এই নগরী সৃষ্টি করেছেন। এমন ঐশ্বর্যতো শ্রীদাম কোনদিন দেখেনি। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের হীরামুক্তা মানিক্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে ? ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হচ্ছেন শ্রীদাম। একবার আশা—একবার অনুশোচনা—একবার ভয়! খুঁজতে খুঁজতে রাজপ্রাসাদ পরিদৃষ্ট হল। কিন্তু কোথায় প্রাণসখা ? কোন পথ দিয়ে তার কাছে যাওয়া যাবে ? মনের মধ্যে সেই কৃষ্ণের চিন্তা। অন্তঃপুরের পথ দিয়ে চললেন শ্রীদাম।

সর্বান্তর্যামী সর্ব চক্ষু দিয়ে দূর থেকে দেখতে পেলেন শ্রীদামকে। তৎক্ষণাৎ চিনতেও পারলেন তাঁর বাল্যকালের খেলার সাথীকে। সহসা রুক্মিণীদেবীর শয্যা থেকে উঠে দ্বাড়িৎগতিতে আনন্দ গদগদচিত্তে সখার নিকটে এসে তাঁকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণের মুখের ভঙ্গী ও আন্তরিকতা দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন শ্রীদাম—আহা! 'মুখং প্রসন্নং বিমলা চ দৃষ্টিং কথানুরাগো মধুরা চ বাণী'। কী মধুর ভাব! কী মধুর প্রসন্নমুখ।

স্নেহ-প্রেম মাখানো দুটি হৃদয়। মহারাজার সহিত ভিক্ষুকের আলিঙ্গন—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার। উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। কতদিনের পরিচয়—কতদিনের ভালবাসা! অকৃত্রিম প্রেম—কী পরম পদার্থ! কি যৌবনে—কি প্রৌঢ়ে সবদিন একইরূপ থাকে।

তারপর কৃষ্ণ সখাকে ছোট শিশুর মতো টানতে টানতে প্রাসাদমধ্যে নিয়ে গিয়ে আপন শয্যার উপর বসালেন। পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন। রুক্মিণীকে বললেন তারপর জানলে রুক্মিণী, এ আমার বাল্যকালের সখা। খুব কষ্ট করে ব্রজধাম থেকে এখানে এসেছে।

রুক্মিণী বিস্মিত হলেন—স্বামীর সখাকে চামর ব্যজন করতে লাগলেন গভীর আগ্রহে। জলপাত্র এনে দিলেন' জলযোগের পর আলোচনা আর আলোচনা। দুই সখার মধ্যে আলোচনা হল কত শত কথা। বাল্যকালের সেই অনাবিল আনন্দের কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়ল বিগত দিনের এক একটি ঘটনা। যমুনা পুলিনের সেই আনন্দ—সেই মিলন মেলা—সেই রাসলীলা। সেইসব কথা বলতে বলতে ভাবে বিভোর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করে ফেললেন কৃষ্ণ।

সখার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন শ্রীদাম। তথাপি তাঁর মনের মধ্যে গভীর সংকোচ' সামান্য চিঁড়া কি করে দেবেন এ চিন্তাও তাঁর মনের মধ্যে।

কিন্তু অন্তর্যামী জানতে পারলেন শ্রীদামের মনোব্যথা। তিনি বন্ধুকে ঠাট্টা করে বললেন—সখার জন্যে তুমি কি এনেছ দাও! তোমার দেওয়া খাবার কিছু না

মুখে দিলে আমার মন শান্তি পাবে না। বলেই শ্রীদামের গাত্রবস্ত্রের ভেতরে লুকানো পুঁটলিটি টেনে বের করলেন আর বলতে লাগলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ১০।১০।৪

ভক্ত যদি ভক্তিভরে আমাকে পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করে সেই তুচ্ছ জিনিসও আমি সাদরে গ্রহণ করি। আমার কাছে বস্তুর চেয়ে ভক্তিই বড়। একথা বলতে বলতে সেই পুঁটলীটি খুলে একমুষ্টি চিঁড়ে তৎক্ষণাৎ মুখে তুলে পরম তৃপ্তি সহকারে চিবাতে আরম্ভ করলেন। তারপর দ্বিতীয় মুষ্টি তুলতে গেলে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করে তাঁকে করলেন নিবারিত।

রুক্মিণী স্বামীকে বললেন—তুমি একমুষ্টি চিঁড়ে গ্রহণ করেছ—এটাই সখাকে সর্বৈশ্বর্য্য প্রদান করবে। দ্বিতীয় মুষ্টি খাওয়ার আর দরকার নেই। বলেই নিজে সেই মুষ্টি গ্রহণ করলেন।

বিস্মিত হয়ে পুলক অনুভব করলেন শ্রীদাম। তারপর মহাসমারোহে সেই রাজপ্রাসাদে নৈশভোজে মত্ত হয়ে উঠলেন। খেতে আর পারছেন না শ্রীদাম। এত উপাদেয় খাদ্য খাওয়াতো তাঁর অভ্যাস নেই। সবই দুগ্ধজাত—মিষ্টান্ন সন্দেশ আর নাড়ু। তবু কিছু খেতেই হল তাকে।

তারপর রাত্রিবাস। চোখে ঘুম নেই শ্রীদামের। ঐশ্বর্য্যের স্তুপে গরীবের কি ঘুম আসে? শ্রীদামের অবস্থা তাই খুবই মর্মান্তিক। সারারাত জেগে জেগে কাটল। আকাশ পাতাল চিন্তা তাঁর মাথায়। হাজার কীট পতঙ্গ যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে তাঁর অচেতন ও চেতন মনের প্রান্তরে।

পরদিন প্রভাতে বিদায় নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এলেন তাঁর সাথে।

পথে শ্রীদাম ভাবছেন সবইতো হল। কিন্তু আসল কথা তো কিছুই বলা হল না। আর অর্থ সম্পদের কথা বলবই বা কি করে? না, তার চেয়ে কৃষ্ণ দর্শনই যথেষ্ট। ব্রাহ্মণী কত আশা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হয়ত বুঝেছেন—

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন পেয়ে মদমত্ত হয়ে আমাকে আর স্মরণ করবে না—ঐশ্বর্য্য তার চরম অধঃপতনের কারণ হবে। তাই বুঝি অল্পধনও প্রদান করলেন না।

আবার ভাবছেন—কৃষ্ণ আমাকে বক্ষ আলিঙ্গন দিয়েছে। রুক্মিণীর মত নারী আমাকে চামর ব্যজন করেছে। এটাইতো আমার মত মানুষের কাছে অনেক বড়। স্বয়ং ইন্দ্রও এমন আতিথ্য পায় না।

এইরূপ চিন্তা করতে করতে শ্রীদাম গৃহের সম্মুখে এসে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর কুটির আজ বিরাট রাজপ্রাসাদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সামনে পদ্মশোভিত সরোবর—দাসীরা ঘোরাঘুরি করছে। চারধারে একটা কল কোলাহল বিরাজমান।

এমন সময় তাঁর স্ত্রী বহুমূল্য অলংকারে শোভিত হয়ে স্বামীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দয়া আর বুঝতে দেরী হল না ব্রাহ্মণের।

তাই কৃষ্ণভক্তি শুধু মুক্তিপ্রদানকারী নয় সে ঐশ্বর্য'ও দান করে। সে ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

● শ্রীহরির মহত্ত্ব বর্ণন ●

ক্ষমা করা পরমধর্ম ক্ষমা বীরত্ব হতে।
ক্ষমার অবতার হরি শ্রেষ্ঠ এ জগতে।।

একদা সরস্বতী নদী তীরে ঋষিগণ আলোচনা প্রসঙ্গে তর্ক বিতর্ক শুরু করেছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে বড়। কিছু মীমাংসা হল না। তখন সকলে ভৃগুমুনির (ব্রহ্মার পুত্র) কাছে গেলেন।

ভৃগু তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করে সভায় করলেন গমন। ব্রহ্মা তাকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। তখন ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে ত্বরিতে কৈলাস পর্বতে মহাদেবের কাছে গমন করলেন। মহাদেব যথোচিত সম্মান দেখালেও ভৃগু তাকে বেপথুমতী বলে নিন্দা করেন। এতে শিব ত্রিশূল তুলে ভৃগুমুনিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। অনন্তর ভৃগুমুনি সেখান থেকে বৈকুণ্ঠ পলায়ন করেন। সেখানে গিয়ে লক্ষ্মী অঙ্কে শায়িত শ্রীহরির বক্ষে করলেন পদাঘাত। শ্রীহরি তখন নিজের অপরাধ হয়েছে ভেবে সত্বর উঠে গিয়ে মুনিকে প্রণাম করে ক্ষমা চাইলেন। তারপর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে পুনরায় বললেন—

অতীব কমলৌ তাত, চরণৌ তে মহামুনেঃ।
বজ্র কর্কশ মদ্বক্ষঃ স্পর্শেন পরিপীড়িতো।।

হে মহামুনে, আপনার চরণযুগল কত কোমল আর আমার বক্ষ বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। না জানি আমার বক্ষের সংঘাতে আপনার পদদ্বয় ব্যথিত হয়েছে।

কী অপূর্ব বিনয়! কী ভক্তবৎসলতা! অপূর্ব সাধুপ্রশান্তি! এ বুঝি শ্রীহরির মুখেই শোভা পায়।

কথা শুনে ভৃগুমুনির চোখে জল এল। তিনি প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেলেন সরস্বতী নদীর তীরে সেই ঋষিদের কাছে। তখন ঋষিগণ ভৃগুমুনির সমস্ত কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন—বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিষ্ণু থেকেই পরমশান্তি ও অভয়প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● যদুবংশ ধ্বংস ●

হরিনাম অর্থ জীব করহ স্মরণ।
যাহাতে কলুষনাশ হয় সর্বক্ষণ ॥
শ্রীহরির পদে সদা যার মন রয়।
ধন্য সেই জীবশ্রেষ্ঠ ভাগবতে কয় ॥
'হ' তে করয়ে হরণ—পাপ তাপ আদি।
'রি' তে রিপুগণে—ত্বরা নাশে নিরবধি ॥
'না' তে করয়ে নাশ—কালিমার রাশি।
'ম' তে মঙ্গল হয় অমঙ্গল নাশি ॥

ভগবান কৃষ্ণ বধ করলেন বহুদৈত্য। হত্যা করলেন অত্যাচারী রাজাদের। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করলেন। এখন অত্যাচারী যাদবকুলকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। তা না হলে ভারতভূমি অন্যায়ে ছেয়ে যাবে। এইরূপ মনস্থ করে "সত্য সংকল্প ঈশ্বর" ব্রহ্মশাপচ্ছলে নিজকুলের উপসংহার টানলেন।

পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপের কারণ জানতে চাইলে শ্রীশুকদেব বললেন—একদা বসুদেবের গৃহে যজ্ঞাদি সম্পাদন করে বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ ও নারদাদি ঋষিগণ দ্বারকার নিকটে পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করেছিলেন, তখন যদু কুমারগণ তাচ্ছিল্যভাবে জাম্ববতী পুত্র শাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীবেশে সাজিয়ে ঋষিগণের নিকট নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—বলুনতো ঋষিগণ, এই স্ত্রীলোকটি কন্যা না পুত্র প্রসব করবে ?

যদুকুমারদের এইরূপ ধৃষ্টতা দেখে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

'জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্'।

রে মূর্খগণ! এই কল্পিতারমনী কুলনাশক এক মুষল প্রসব করবে।

ঋষিগণের অভিশাপ বাক্য শুনে যদুগণ ভীত হয়ে শাম্বের বস্ত্রমধ্যে গর্ভাকারে লুকানো লৌহময় মুষলটিকে নিয়ে রাজা উগ্রসেনের নিকটে তাদের বিপদের কথা নিবেদন করলেন। তখন যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেই লৌহ চূর্ণ ও চূর্ণাবশিষ্ট লৌহখণ্ড সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলেন। এক মৎস্য গ্রাস করল একটি খণ্ড। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডগুলিও তরঙ্গ সংঘাতে সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হয়ে এক শরবনে পরিণত হল।

জরা নামক এক জেলের জালে পড়ল সেই মাছ। ঐ জেলে বনে বনে শিকারও

ব্রত। সে যাই হোক, জরা মাছের উদর থেকে লৌহখণ্ডটিকে পেয়ে বিস্মিত হয়ে ৗটিকে স্বীয় শরের অগ্রভাগে সংযোজিত করে রাখল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ ব্রহ্মশাপ অবগত হলেন এবং কিরূপে ঐ শাপ ভয়াবহ পরিণতির ্কে অগ্রসর হচ্ছে তাও বুঝতে পারলেন। কিন্তু 'অন্যথা কর্ত্তুং নৈচ্ছৎ বিপ্রশাপং' -সেই ব্রহ্মশাপকে অন্যথা করতে ইচ্ছা করলেন না। কারণ তিনি অত্যাচারী যদু-ংশের ধ্বংস কামনা করেন।

এছাড়া গান্ধারীর অভিশাপও যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কুরুবংশের রাজা ধৃতরাষ্ট্র শুধু জন্মান্ধ ছিলেন না, ছিলেন স্নেহান্ধও। ধর্মাশ্রয়ী ।ান্ডবদের উপর রাজা দুর্য্যোধনের শত অন্যায়, শত অত্যাচার নীরবে তিনি সমর্থন রতেন। স্নেহশালা জননী গান্ধারী কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনের অন্যায় আচরণ মর্থন করতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করার ন্য যতবার জননীর কাছে এসেছেন, ততবারই তিনি বলেছেন—'যতো ধর্মস্ততো য়ঃ।' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এগার অক্ষৌহিনী কৌরবসৈন্য এবং দুর্য্যোধনের ৯৯জন াতা নিহত হওয়ার পর ভগ্নজানু দুর্য্যোধন শেষ পর্য্যন্ত যখন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে প্রাণত্যাগ করলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ধর্মযুদ্ধের মহাসারথি শ্রীকৃষ্ণ ুধিষ্ঠির ও ভীমসেন সহ পুত্রশোকে ক্রুদ্ধ ও শোকাতুরা গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে াসেন। কৃষ্ণ গান্ধারীকে বলেছিলেন যে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গান্ধারীর বাক্য যতোধর্মঃ......' অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব তিনি যেন শোক ারহার করেন।

কৃষ্ণের এই সান্ত্বনাবাক্যে শতপুত্রহারা জননী গান্ধারী কিছুক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকার ব শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করতে থাকেন। তারপর গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিধবা ুত্রবধূগণ সহ কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে গমন করেন এবং সেই মহাশ্মশানভূমিতে শকুনি ৃধিনী পরিবৃত হাজার হাজার বিকৃত ভয়ঙ্কর শবশয্যার হৃদয় বিদারক দৃশ্য দিব্যচক্ষে র্শন করে পান্ডবদের অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত য়ে গান্ধারীকে শান্ত করেন এবং ভীম তার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। শেষে ান্ধারী ক্রোধে, ক্ষোভে ও শোকে বিহ্বল হয়ে যুধিষ্ঠিরকে দেখতে চান। কম্পিত লেবরে যুধিষ্ঠির এসে কৃতাঞ্জলিপুটে গান্ধারীর অভিশাপ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত ন এবং তিনি নিজে তাঁর শত পুত্রের হন্তারক বলে গান্ধারীর পাদস্পর্শ করতে অবনত লে গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণ বস্ত্রের অন্তরাল থেকে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখতে পান। ফলে যুধিষ্ঠিরের নখগুলি কুৎসিত আকার ধারণ করে।

তারপর গান্ধারী কম্পিত অধরে কৃষ্ণকে বলতে থাকেন—হে কেশব, হে চক্রী, তুমি মিত বিক্রমশালী পুরুষ। তোমার শক্তি ও বুদ্ধিতে এই মহাযুদ্ধ নিবারণ করা ত, কিন্তু তুমি তা কর নাই। আমার পতিসেবার যদি কিছুমাত্র পুণ্যফল থাকে, বে আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি—"আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে তুমি ও তোমার ত শত পুত্র, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও যদুবংশের সকলকেই হারাবে। আর এই

বনের মধ্যে তুমি নিজে এক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে হবে নিহত। আমার শোকবিধুর শত পুত্রবধূর মর্মভেদী আর্তনাদ বৃথা যাবে না। যদুবংশের নারীগণও আমা পুত্রবধূদের ন্যায় হাহাকার করে কাঁদবে।

যথাকালে গান্ধারীর এই অভিশাপ সফল হয়েছিল। কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র শাম্বে কৃত্রিম গর্ভপ্রসূত মুষলে যদুবংশ হয়েছিল ধ্বংস। এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে মানবলীলা সংবরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● নবযোগীন্দ্র সংবাদ ●

সর্বভূতে ঈশ্বর জ্ঞান যে করিতে পারে।
সখারূপে কৃষ্ণ তার সাথে সাথে ফিরে॥

ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে নয়জন দিগম্বর যোগীন্দ্র আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের নাম—কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল চমস্ ও করভাজন।

এরা ভাগবতে নবযোগীন্দ্র নামে সুপরিচিত। একদিন এরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে মহাত্মা নিমির যজ্ঞস্থলীতে এসে উপস্থিত হন। বিদেহরাজ নিমি যথাযোগ্য অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্॥ ১১।২।২৯

—দেহধারী জীবগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর হলেও মনুষ্যদেহ দুর্লভ। সেই মনুষ্যদেহ মধ্যে আবার ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণের দর্শন সুদুর্লভ। মহান সৌভাগ্যের ফলেই মনুষ্যদেহ লাভ করে আমি আজ আপনাদের দর্শন লাভ করলাম। এখন বলুন, জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের উপায় কি? ভাগবত ধর্মই বা কি?

বিদেহরাজ নিমি কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে যোগীন্দ্র কবি নিমির সমস্ত সন্দেহ মীমাংসা করে দিলেন। তিনি বললেন—এই সংসারে ভগবানের চরণ সেবাই আত্যন্তিক মঙ্গল বলে মনে করি। আর ভগবানে সমর্পিত সমস্ত কার্যই ভাগবত ধর্ম। গীতায় আছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—হে কৌন্তেয়; যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যা তপস্যা কর—সেই সমস্ত আমাতে অর্পণ করবে। তবে তা ভক্তি সহকারে।

ভক্তি কিভাবে আসবে?

হরিলীলা শ্রবণ করতে করতে। তবে হরিলীলা শ্রবণে শুধু ভক্তিই আসে না

ভগবৎদর্শন হয় ও সংসারে বিরক্তি আসে। যেমন প্রতি গ্রাস অন্নের সহিত ভোজনকারীর, উদরপূরণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি ও সুখ একসঙ্গেই হতে থাকে, সেইরূপ ভগবৎলীলা কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির ভক্তি, ভগবৎ দর্শন ও সংসারে বিরক্তি সমকালেই উৎপন্ন হয়।

অতঃপর রাজা নিমি ভগবানের ভক্তগণের আচার ব্যবহার জানতে ইচ্ছুক হলেন।

যোগীন্দ্র হরি বললেন - যে ভক্ত সর্বকারণ পরমাত্মা ভগবানের প্রকাশ সর্বভূতে দর্শন করেন এবং জগদাত্মা ভগবানেই সর্বভূত অবস্থিত অনুভব করেন—তিনিই ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি সর্বানুভূতির অভাববশতঃ ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবৎ ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞগণের প্রতি কৃপা ও ভগবৎ বিদ্বেষীগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি মধ্যম ভাগবত। আর যিনি শ্রদ্ধা সহকারে কেবল প্রতিমাদিতেই শ্রীহরির পূজা করে থাকেন, হরিভক্তগণের অথবা সর্বভূতের ভেতর শ্রীহরির প্রকাশ দর্শন করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন না—সেই ভক্ত ভজনারম্ভকারী বা কনিষ্ঠ ভক্ত।

অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র বললেন যে, ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হলেও যে ভক্ত ভগবানের লীলাস্মরণ হতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হন না, যিনি জানেন, ত্রৈলোক্য সুখ অনিত্য, ভগবৎ প্রাপ্তি সুখ নিত্য—তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

এইবার নিমি পরম আনন্দিত হয়ে বললেন—সংসার তাপের –পরম ঔষধিরূপ হরিকথা শ্রবণ করে আমার আকাংখা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

● শ্রীহরির মায়াতত্ত্ব কি ?

ভগবান পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা জীবসমূহ সৃষ্টি করেছেন। জীবগণ দেহকেই আত্মা মনে করে এই শরীরের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। এই আসক্তি প্রসূত বাসনা থেকে আসে জন্মমৃত্যুর-জ্বালা। প্রলয়কাল পর্যন্ত এই জ্বালারথে চড়ে বেড়াতে হয় জীবকে। এটাই শ্রীহরির মায়াতত্ত্ব।

অবশেষে প্রলয়কাল উপস্থিত হলে শতবর্ষব্যাপী অগ্নিবৃষ্টি হবে। সূর্যের তেজ হবে প্রখর। সৃষ্টিকালের বিপরীত ভাবে পঞ্চভূত ও অহংকার সমূহ স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাবে।

অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র এইরূপে ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারকারিণী ত্রিগুণাত্মক মায়ার কথা বর্ণনা করে নিমিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আর কি জানতে চান ?

● এই মায়া অতিক্রম করার উপায় কি ?—বললেন নিমি।

তখন যোগীন্দ্র প্রবুদ্ধ বললেন—দুঃখনাশ ও দুঃখপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম করে জীব তার বিপরীত ফল ভোগ করে। মায়াতরণেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মজনিত স্বর্গলোকও নশ্বর। স্বর্গলোকেও সমানের প্রতি বিতশ্রদ্ধা, শ্রেষ্ঠের প্রতি অসূয়া এবং বিনাশ ভয় বিদ্যমান। মায়াবন্ধন ছিন্ন করতে হলে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞ গুরুর শরণাগত হওয়া প্রয়োজন। তারপর গুরুর নির্দেশমত শ্রীহরির লীলাকথায় মনোনিবেশ করতে

হয়। তবেই মায়া কাটানো যায়।

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষণ্ ভক্ত্যা তদ্দুত্থয়া।

নারায়ণ পরমায়াং অঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ১১। ৩। ৩৩

—নারায়ণের উপাসক এইরূপ ভাগবত ধর্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করতে করতে নারায়ণী ভক্তির দ্বারা দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করেন।

● পরমাত্মার স্বরূপ কি?

যোগীন্দ্র পিপ্পলায়ন বললেন—পরমাত্মা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কারণ আবার কারণরহিত—সকলের আধার স্বরূপ। দেহ মন ইন্দ্রিয় তার দ্বারা পরিচালিত।

● কিভাবে তিনি প্রকাশিত হবেন?

মোক্ষকামী ব্যক্তির চিত্ত শ্রীহরির চরণকমল চিন্তা করতে করতে পরিশুদ্ধ হলে তার নির্মল চক্ষুতে সূর্যের প্রকাশের মত পরমাত্মার প্রকাশ অনুভূত হবে।

● কর্মযোগ কি?

বেদবিহিত কর্মের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনাই কর্মযোগ। চিকিৎসক যেমন বালককে মিষ্টদ্রব্যের দ্বারা প্রলুব্ধ করে রোগনিবৃত্তির জন্য ঔষধ পান করান, ধর্মগ্রন্থ তেমনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বর্গফলের দ্বারা প্রলোভিত করে সংসার নিবৃত্তির জন্য কর্মসমূহ বিধান করেন।

কর্মকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। বিকর্ম মানে শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচরণ, অকর্ম মানে শাস্ত্রবিহিত অনাচারণ আর কর্ম মানে শাস্ত্রবিহিত আচরণ। ঈশ্বর উদ্দিষ্ট কর্মই কর্ম।

● যোগীন্দ্র আবির্হোত্রের মুখে কর্মযোগের কথা শুনে রাজা নিমি শ্রীহরির অবতারের কথা জানতে চাইলেন।

তখন যোগীন্দ্র দ্রুমিল বললেন—পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা যাবে তবু ভগবানের সমস্ত অবতার লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা অসম্ভব। এই বলে দ্রুমিল কারণ সলিলশায়ী আদিপুরুষ এবং তা থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি বর্ণনা করলেন। কালক্রমে ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মূর্তির গর্ভে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ও নর জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু নিজ অংশে জগতের মঙ্গলের জন্য হংসদেব, দত্তাত্রেয় সনকাদি কুমারদ্বয় এবং আমাদের পিতা ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সম্পর্কে উপদেশ দেন। সেই ভগবান বিষ্ণুই হয়গ্রীব অবতারে মধু দৈত্যকে বধ করে উদ্ধার করেন বেদ। অতঃপর বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, পরশুরাম ও রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের কথা উল্লেখ করে যোগীন্দ্র দ্রুমিল বললেন—

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।

বাদৈ র্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোহতদর্হান্ শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতভুজোন্য হনিষ্যদন্তে।

১১। ৪। ২২

—জন্মরহিত ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীর ভার গ্রহণ করবার জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে দেবতাগণেরও দুষ্কর কার্য করেছেন। তিনি বুদ্ধ অবতারে অনধিকারী অথচ

যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত অসুরভাবাপন্ন মানবগণকে অহিংসাবাদের দ্বারা বিমোহিত করেছেন। কলির শেষে তিনিই কল্কিরূপে শূদ্ররাজাদিগকে বধ করবেন।

● অসংযত চিত্ত, ভোগে অপূর্ণকাম অথচ শ্রীহরির ভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ?

যোগীন্দ্র চমস বললেন—সেই অসাধু ব্যক্তিগণ এই মরণশীল নিজ দেহ ও পুত্র কলত্রাদিতে আসক্ত হয়ে এদের পোষণের নিমিত্ত পশুহিংসা করে স্বীয় আত্মাকে ধ্বংসের পথে এনে বাসুদেব পরাঙ্মুখ হয়ে উঠে। তাদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়। পরিশেষে অনুতপ্ত হয়ে কৃষ্ণমুখী হলে সব পাপ কেটে যায়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—একদিনের সভক্তি কৃষ্ণনামের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠে।

● ভগবান এই জগতে কোন যুগে কিরূপ বর্ণবিশিষ্ট ও কিরূপ আকার বিশিষ্ট হয়ে থাকেন ? কোন যুগ শ্রেষ্ঠ এবং কেন ?

ঋষি করভাজন তখন বললেন- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি- এই চার যুগে ভগবান শ্রীহরি নানাবিধ বর্ণ—নাম ও আকার নিয়ে পূজিত হন। সত্যযুগে ভগবান শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ (কল্কি)

যুগের মধ্যে কলিযুগই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যুগে কেবলমাত্র ভগবানের নাম স কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্ব পুরুষার্থ প্রাপ্য হওয়া যায়।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

তাই কলিযুগ ধন্য। বহু ভক্তবৈষ্ণবের পদধূলিতে ধরিত্রী কৃতার্থা। বহুবৈষ্ণব এই যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং করবেন। আমরা বদ্ধজীব—এইসব দেখার মত আমাদের অধিকাংশের চক্ষু নেই। অনুভব করার মত চেতনা শক্তি নেই।

অতএব নবযোগীন্দ্র সংবাদ পাঠ করে আমরা দেখতে পাই যে ভাগবত গ্রন্থ শ্রুতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্ব ও বৈষ্ণবদর্শনের দ্বৈততত্ত্ব—এই আপাত বিরোধী মতদ্বয়ের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্ব ভাগবতের মধ্য দিয়ে দ্বৈততত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়ে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার মহিমা প্রকাশিত করছেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে এই জন্যেই বেদান্তের ভাষ্য বলা হয়ে থাকে। বেদান্ত বলেন—ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদবুদ্ধি থেকেই সকল প্রকার ভয় ও দুঃখ উপস্থিত হয়। জীব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা অনুভব না করছেন ততক্ষণ জীবের শোক মোহ দূরীভূত হতে পারে না। আবার শ্রীমৎ ভাগবতও বলেন, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ এবং সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন না করলে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে দুঃখ শোক ভোগ করতে থাকে। একই ভাব—একই সত্য, কেবল ভাষার বিভিন্নতা। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সর্বজীব সর্বভুবন আচ্ছন্ন করে আছেন—এই দুইই মূলতঃ একতত্ত্ব। তবে বেদান্তের পথ দুরূহ। ভক্তির পথই সহজ। বেদান্ত অপেক্ষা ভাগবতের আত্মনিবেদনই সহজসাধ্য। মোট কথা যিনি ভগবৎ রসের রসিক

ও ভক্তিপরায়ন তার কাছে ভগবৎ কৃপা লাভ খুবই সহজ। আর যারা পাণ্ডিত্যের সমুদ্রে সন্তরণপটু তাদের কাছে তিনি বহুজটিল।

*　　　*　　　*

কখনো কখনো শুধু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অঙ্গ দর্শনের ফলে কোন ব্যক্তি মোক্ষবাঞ্ছা ত্যাগ করে ভগবদ্ভজনে ব্রতী হন। তথাকথিত জ্ঞানালোচনায় কালক্ষয়ের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে নির্মল কৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গুণাবলীতে আকৃষ্ট, ভজন মুক্তাত্মা ভজনরাজ্যে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি-হীন শুষ্ক চিন্তাপরায়ণ জ্ঞান অনুশীলনকারীর অপরাধহেতু পতন হয়।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত
ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

—যারা ভক্তিহীন অথচ নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর তপস্যার ফলে তারা পরম পদপ্রাপ্ত হলেও শ্রীভগবানের চরণ সেবার অনাদর করায় নিশ্চিতভাবে তাঁরা ভবসাগরে পতিত হয়।

জ্ঞান অনুশীলনকারী যোগী দুরকম—একজন অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসক এবং অপরজন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। অদ্বৈতবাদীরা অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করায় তাদের ব্রহ্মোপাসক বলে। এরা আবার তিনভাগে বিভক্ত—নবীন ব্রহ্মোপাসক, ব্রহ্মোপলব্ধিতে আবিষ্ট যোগী আর নিজেকে যিনি ব্রহ্মরূপে অনুভব করছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী ভক্তিযুক্ত হলেই মুক্তিলাভ করেন। অন্যথায় মুক্তিলাভ অসম্ভব। ভগবদ্ভক্তি এতই বলবতী যে ব্রহ্মোপাসনা স্তরেই একজন শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হয়। ভগবান তাকে পূর্ণ চিন্ময় দেহ প্রদান করেন এবং তিনিও নিত্যকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ভজন করেন। ঠিক এই সময় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়েও তাঁকে উপলব্ধি করে তিনি সর্বান্তকরণে গোবিন্দভজনে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন চতুঃসন ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হয়ে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। সনক কুমারও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত কুসুম সৌরভে আকৃষ্ট হন।

এইভাবে যিনি ব্রহ্মানুভূতির সোপানে অধিষ্ঠিত—তিনি শোকহীন—সর্বজীবে সমভাবাপন্ন এবং তিনিই নিস্পৃহ হয়ে ভজনরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও এটা স্বীকার করে বলে গেছেন—ব্রহ্মে লীণ হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি অদ্বৈতপন্থী ছিলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন দুষ্ট কিশোরের সান্নিধ্যে তাঁর নিত্য সেবকে পরিণত হয়েছি। এককথায় ভক্তিমার্গে আত্মসাক্ষাৎকারী দিব্যশরীর প্রাপ্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গুণে আকৃষ্ট হয়ে নির্মল ভগবদ্ভজনে পূর্ণভাবে নিযুক্ত হন।

যে শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হয়, সে নিঃসন্দেহে অবিদ্যাময়ী মায়াপাশে আবদ্ধ। কিন্তু ভক্তিমার্গে মুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তি বস্তুত মায়ামুক্ত। তার সর্বজীবে সমভাবাপন্ন।

[এইরূপে নবযোগীন্দ্রগণের উপদেশাবলী বসুদেবের নিকট শ্রবণ করে দেবর্ষি নারদ বললেন—অতঃপর ঐ নয়জন মুনি অন্তর্হিত হলে রাজা নিমি ভাগবত ধর্ম অনুষ্ঠান করে পরম গতি লাভ করেন। বসুদেবকেও বললেন যে তিনি যেন পুত্রবুদ্ধি নিয়ে বাসুদেবকে না দেখেন। বাসুদেব পরমপুরুষ আদিকর্তা।

একথা শুনে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধিরূপ আত্মমোহ পরিত্যাগ করে পরম পুরুষের ধ্যানে হলেন মগ্ন।]

* * *

ভগবান কৃষ্ণের মানবলীলা শেষ হয়ে আসছে দেখে ব্রহ্মা ও দেবগণ তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে বললেন হে বন্দনীয়! আপনার লীলাগুণ শ্রবণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রদ্ধার দ্বারা সাত্ত্বিকচিত্ত মুমুক্ষুগণের যে প্রকার শুদ্ধি হয়, বেদার্থশ্রবণ, বেদাধ্যায়ন, দান, তপস্যা ও কর্মসমূহের দ্বারা কামনাবাসনাযুক্ত জীবগণের সেই প্রকার শুদ্ধি সম্ভব হয় না। অতঃপর ব্রহ্মা বললেন—

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসাতমঃ॥

—হে পরমেশ্বর, কলিযুগে সাধুমনুষ্যগণ—আপনার ঐ সকল চরিত্র শ্রবন ও কীর্তন করতে করতে অনায়াসে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হবেন। অতএব আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে বৈকুণ্ঠে গমন করুন এবং লোকসমূহের সহিত আপনার সেবক আমাদেরকে পালন করুন।

ব্রহ্মা ও দেবগণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তাই হবে। আমি সমস্ত দেবকর্ম সম্পন্ন করেছি, এখন যদুকুল ধ্বংস হলেই বৈকুণ্ঠে গমন করব। যদি যদুকুলের বিনাশ সাধন না করে আমি বৈকুণ্ঠে যাই তাহলে শৌর্য্য বীর্য্য সমন্বিত অহংকারী যাদবগণের দ্বারা লোকসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। তারপর ফিরে গেলেন স্বর্গে।

ক্রমে দ্বারকাতে নেমে এল ধ্বংসের কালো মেঘ কৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে যাওয়ার জন্য যাদবগণকে রথ প্রস্তুত করতে বললেন।

তৃতীয় অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ ●

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁহার অধীন।
সেই নারায়ণে সবে ভজ নিশিদিন॥
বহু সংখ্যক জীব থেকে বহু শিক্ষা লও।
সংসারে নির্বিকার হয়ে তুমি সদা রও॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রভাসে যাওয়ার জন্য রথ প্রস্তুত করছিলেন সেই সময় তার পরম

ভক্ত উদ্ধব এসে উপস্থিত। তিনিও প্রভুর সাথে যেতে চান। উদ্ধব বললেন—প্রভু, আমি আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। আপনাকে ভুলে আমি থাকতে পারব না। আপনি বলুন, আমি কোথায় যাব?

এই কথা শুনে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন—তুমি সংসার মোহ ত্যাগ করে ভারতবাসীর গৃহে ভ্রমণ পূর্বক গৃহস্থবাসীদের কাছে আমার নাম রূপ ও গুণের কথা আলোচনা করবে আর সংসার-বৈরাগ্য সম্পর্কে উপদেশ দেবে। প্রিয়জনতো তার প্রিয়জনেরই কথা সর্বত্র বলে বেড়ায়। তাছাড়া মুক্তিপথকামী জীবগণের মুক্তির উপায় বলে দেওয়াই হবে তোমার কাজ।

উদ্ধব বললেন—তাহলে আমাকে সংসার বৈরাগ্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দান করুন; সেই জ্ঞানের কথা শুনে আমার মতো হতভাগ্য দাসানুদাসের যদি মোহ ভঙ্গ হয়।

*　　*　　*　　*

সত্যিই উদ্ধবের মতো এমন দাস্যভক্ত কেউ নেই। আর দাস্যভক্তই শ্রেষ্ঠ। 'মধুর' ভাব শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। কিন্তু সকলেই এই রসেই অধিকারী হতে পারে না। কামনা বাসনা বিবর্জিত মন নিয়ে অর্থাৎ সর্বদা মনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে মধুর রস আস্বাদন করা যায়। দাস্যভাবের ভক্তের কামনা বাসনা ত্যাগের কোনো প্রসঙ্গই নেই। এখানে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক। ভুল-ত্রুটির মার্জনা আছে।

মধুর ভাবের সাধককে বহুজন্মের অন্যান্য রসসাধনার দ্বারা অগ্রসর হতে হয়। পাঁচজনের দেখে একেবারে লাফিয়ে মধুর রস ধরতে গেলে হাত ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মধুর রসের সাধনোপযোগী মন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ। মধুর রসের রসিকই রাসলীলা শ্রবনের অধিকারী।

কিন্তু দাস্যভাব সাধনার অধিকারী সর্বজীব। এতে অপরাধের ক্ষমা আছে। সাধারণের পক্ষে দাস্যভাব সাধনাই সহজ নিরাপদ ও সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ।

আবার অনেকে বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করে থাকেন কিন্তু বাৎসল্য রস একমাত্র পিতা নন্দ ও মাতা যশোদারই মধ্যে শোভা পেয়েছিল। সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই। অবশ্য স্বয়ং পিতা নন্দও এই রসের সম্পূর্ণ অধিকারী হতে পারেন নি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভক্তগণ নিজগৃহে নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে বাৎসল্যরসের অনুশীলন করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে খাঁটি বাৎসল্য রসের অধিকারী ভক্ত নাড়ুগোপালের সেবা করছেন আবার হয়ত রাসলীলা দর্শন ও শ্রবন করে ভাবে বিভোর হয়ে করছেন অশ্রু বিসর্জন। এতে সব গোলমাল হয়ে যায়। নাড়ুগোপাল ও রাসলীলার কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক অখণ্ড পরমপুরুষ কৃষ্ণ হলেও ভাবজগতে এরা দুজন ভিন্ন পুরুষ। একজন অসহায় স্নেহরসের উদ্রেককারী অপরের প্রতি নির্ভরশীল বালকমাত্র। অপরজন বয়সে আটবছরের হলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র লীলাময়—প্রেমরসের উদ্রেককারী মহান পুরুষ। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। সুতরাং নাড়ুগোপালের ভজনা করতে করতে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করলে দুকুল হারিয়ে যাওয়ার ভয় বেশী।

গোপালকে বালকের মতো ভালবাসতে গিয়ে যদি ঐশ্বর্য বুদ্ধি এসে যায় তাহলে বালক গোপালের সাধনা নষ্ট হয়ে যায়। বালক গোপালের সাধনা করতে গিয়ে অসুর বধ, কালিয় দমন, রাসলীলা কোন কিছুই ভাবলে চলবে না। না ভাবলেও অকারণে কিছু ভাব এসে পড়বেই। সেই অকারণ ভাবকে দমন করা দুঃসাধ্য। অতএব বাৎসল্যরসের সাধনা খুবই কঠিন। কিন্তু দাস্য ভাবের সাধনায় সেইরূপ কোন আশঙ্কা দেখা যায় না।

বৈষ্ণব আচার্যগণ বলেন যে দাস্যভাবের ভিতর শান্ত ও দাস্য উভয় রসই বিদ্যমান। সখ্য ভাবের ভেতর শান্ত, দাস্য ও সখ্য—এই তিন প্রকার রস নিহিত রয়েছে। বাৎসল্য রসের ভেতর শান্ত-দাস্য-সখ্য ও বাৎসল্য এই চারটি রসই দেখতে পাওয়া যায়। আবার মধুর রসের মধ্যে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাবই বিদ্যমান। মধুর রসে কাম-প্রেম একাকার হয়ে যায়। এটি কেবলমাত্র গোপীগণের জীবনেই সার্থক হয়েছিল। এমন কি মধুর রসের সাধক শ্রীরূপ গোস্বামীরও গোলমাল বেঁধেছিল। পরম সাধিকা মীরাবাঈ বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন প্রার্থনা করলেন শ্রীরূপ নারী দর্শনে হলেন অস্বীকৃত।

"গোস্বামী কহেন মুই বনে করি বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥"

মীরা দেবী উত্তর পাঠান—

"এতদিন শুনি নাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥"

শ্রীরূপ গোস্বামীর চৈতন্য হল। তিনি লজ্জিত হয়ে মীরা বাঈয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে আপনি ধন্য হলেন। মীরাদেবীকেও ধন্য করলেন। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার বিষয়—মধুর রসের সাধক শ্রীরূপ গোস্বামীরও আপনাকে পুরুষ বলে বোধ ছিল। গোপীভাব তাঁর মনকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে পারেনি। যদি পারতো তাহলে পুরুষ বলে অভিমান তার থাকত না।

অতএব দাস্যভাবই সহজ ও নিরাপদ। আবার বলছি, জন্মজন্মান্তর দাস্যভাব সাধন করলে তবে হয়ত ভক্ত সখ্যভাব এবং পরে সাধনার দ্বারা মধুর রসের অধিকারী হতে পারে।

সে যাই হোক, উদ্ধব প্রভুর দাস। তিনি প্রভুর ভৃত্য হয়েই সুখী। মধুর বা কান্তা ভাব তিনি পছন্দ করেননি। প্রভুর চরণে আত্মবিসর্জন দিয়েই তিনি তৃপ্ত। তাই উদ্ধব আমাদের নমস্য—প্রণম্য।

উদ্ধব ও কৃষ্ণের কথাবার্তার প্রসঙ্গে একটুখানি রস বিচার করা হয়ে গেল। হয়ত এতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে অপমান করা হল। অসাধারণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের অধিকারী পরম প্রভুর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁকে পুনঃ পুনঃ সংসার বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—শোন উদ্ধব, আমি অতি সত্বর পরমধামে গমন করছি। আজ

থেকে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করে বিনষ্ট করবে। আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করলে এই লোকসমূহের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হবে এবং কলি পৃথিবীকে আক্রমণ করবে তাই তোমার আর এখানে থাকা উচিৎ হবে না। মায়া মমতা বিসর্জন দিয়ে তুমি তীর্থ পর্যটন কর।

তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব বললেন—হে পরাৎপর হে সারাৎসার হে প্রিয়াৎ প্রিয়! যাদের মন বিষয়াসক্ত, শত ভক্তিসাধনেও তাদের পক্ষে বিষয়সমূহ ত্যাগ করা দুষ্কর। আর যাদের ভক্তি নেই তাদের পক্ষে বিষয় পিপাসা অতিক্রম করা আরও কঠিন। তাহলে সংসার বাসনা ত্যাগের উপায় কি?

প্রাণনাথ তখন বললেন—আমার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর মনুষ্য শরীরেই আমার আবির্ভাব সবচেয়ে বেশী। এই মনুষ্যশরীর দ্বারা জীবাত্মা বাসনা মুক্ত হয়। এই জীবাত্মার বাসনামুক্তি প্রসঙ্গে রাজা যদু ইচ্ছামত ভ্রমণ করতে করতে এক ব্রাহ্মণকে দেখলেন। সেই ব্রাহ্মণ বিদ্বান হয়েও বালকের ন্যায় অভিমান শূন্য হয়ে জগতে বিচরণ করছেন। যদু তাঁকে প্রণাম করে বললেন—আপনি বিদ্বান পণ্ডিত ও পরিপূর্ণ সংসারী অথচ বাসনানির্মুক্ত হয়ে আনন্দে বিচরণ করছেন কিরূপে?

তখন সেই ব্রাহ্মণ অবধূত বললেন—আমি আপন বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বহু সংখ্যক জীবের নিকট থেকে বহুবিধ শিক্ষালাভ করেছি। সুতরাং এই সকল জীব আমার গুরুস্থানীয়। আমার এইরূপ চব্বিশজন গুরু আছেন।

১। আমার প্রথম গুরু এই পৃথিবী। পৃথিবীর উপর আমরা কত উৎপাত করি। গাছ কেটে মাটি দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী করা হয়। কিন্তু এদের কিছুতেই কোন আপত্তি নেই। তাই এদের নিকট শিখলাম—ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরম গুণ। আর পরের উপকারের জন্যই আমাদের জীবন ধারণ।

২। বায়ু আমার দ্বিতীয় গুরু। বায়ু নিজে লিপ্ত না হয়ে গন্ধ বয়ে আনে। তার নিকট শিখেছি, সংসারী হয়েও অনাসক্ত থাকতে হবে।

৩। আকাশ সর্বব্যাপী। একদিকে সে শান্ত অন্যদিকে অনন্ত। সে ঘরেও থাকে আর বাইরেও। সে উদার। আমাদেরকেও উদার হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। এই আকাশ আমার তৃতীয় গুরু।

৪। জলকে আমি চতুর্থ গুরুরূপে বরণ করেছি। জল মলিণ বস্তুকে করে শুদ্ধ এবং নিজে থাকে নির্মল ও স্নিগ্ধ। জলের কাছে শিখেছি—নিজে পবিত্র থেকে জগতের মালিণ্য দূর করতে হবে।

৫। আগুন: বনের মধ্যে যেমন আগুন আছে—ভগবানও তেমনি জনারণ্যে গুপ্তভাবে বিরাজমান। ধ্যানের দ্বারা তাকে জানতে হয়। তাই আগুন আমার পঞ্চমগুরু।

৬। চন্দ্র আমার ষষ্ঠ গুরু। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির মত আমাদের দেহেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়।—আত্মার নয়। চন্দ্রের কাছ থেকে এ জ্ঞান লাভ করেছি।

৭। সূর্য: যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে একই সূর্যকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়

তেমনি আত্মা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে থেকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। আরো দেখা যায়—সূর্য পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে বৃষ্টিরূপে আবার তাকেই ফিরিয়ে দেয়। মানুষের জানা উচিৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা গ্রহণ করা যায় তা অপরের উপকারে লাগতে পারলেই এ জীবনের সার্থকতা। তাইতো সূর্যকে আমি গুরুপদে বরণ করেছি।

৮। কপোত-কপোতী : আমার অষ্টম গুরু কপোত কপোতী। শাবকদের জন্য কপোত কপোতীও দুরন্ত ব্যাধের জালে আটকা পড়ে। সন্তান স্নেহ এতই প্রবল। তেমনি আমরা যদি কপোত কপোতীর মত মায়াজালে আবদ্ধ হই তাহলে কোনদিন মুক্ত হতে পারব না।

৯। অজগর আমার এক অন্যতম গুরু। অজগর যা পায় তাই খায়। আবার কিছু না পেলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখভোগের জন্য লালায়িত হয় না। বিবেকী পুরুষ যদৃচ্ছালব্ধ আহার গ্রহণ করেন।

১০। সমুদ্র অতল অপার। বর্ষার জলে স্ফীত হয় না বা গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায় না। শ্রীহরির ভক্ত সেই কদাপি সুখে উল্লসিত কিংবা বিপদে দুঃখিত হয় না। এই গুরুদেবকে আমি তাই প্রণাম করি।

১১। মধুকর : মধুকর মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু পরিণামে হয় বঞ্চিত। সেইরূপ সঞ্চয় কারীদের পরিনাম দুঃখজনক। তাই মধুকর আমার একজন শিক্ষাগুরু।

১২। পতঙ্গ যেমন আগুনের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে পুড়ে মরে মূর্খ ব্যক্তিও রূপের মোহে তেমনি বিনষ্ট হয়। তাই পতঙ্গের মতো জীবের মন ষড়বিধ বহ্নির দিকে ছুটছে। কখন যে পুড়ে মরবে তার ঠিক নেই। পতঙ্গ আমার এক গুরু।

১৩। হস্তিনীর মোহে হস্তী তৃণাদিতে আচ্ছাদিত গর্তের মধ্যে পতিত হয়। ফলে শিকারী তাকে ধরে ফেলে। তেমনি মানুষও স্ত্রীর মোহে পড়ে গিয়ে ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করে। এই হস্তিনী আমাকে চরম শিক্ষা দিয়েছে।

১৪। ভ্রমর : ভ্রমর বিভিন্ন ফুলে মধু সংগ্রহ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনি ছোট বড় সকল শাস্ত্র থেকে সার সংগ্রহ করবেন।

১৫। ব্যাধের সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ জালে পড়ে। রমণীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও স্ত্রীলোকদের বশীভুত হয়েছিলেন। অতএব হরিণ এখানে আমার গুরু।

১৬। মাছ আহারের লোভে বঁড়শীর কাটাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। তেমনি বিবেকী মানুষের রসনালালসা (ভোগবস্তু) ত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য। জিহ্বা জয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ের মূল কারণ। 'ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে। অতএব মাছ আমার ষোড়শ গুরুদেব। ১১ | ৮ | ২১

১৭। আমার সপ্তদশ গুরুদেব এক বেশ্যার মেয়ে। পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বেশভূষা করে এক ধনবানের আশায় অধিক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু কোন ধনশালী লোক তার কাছে এল না। সে তখন ভাবল—হাড়ের দ্বারা নির্মিত বিষ্ঠামূত্র পরিপূর্ণ দেহের জন্য আমার বসে থাকা উচিৎ নয়। এর চেয়ে কৃষ্ণনাম

ভাল। এই চিন্তা করতে করতে পিঙ্গলা রাত্রিতে সুখনিদ্রায় মগ্ন হল। অতএব এই পিঙ্গলার কাছে আমি শিখলাম, আশাই দুঃখের কারণ আর আশা ত্যাগই সুখ।

১৮। চিল যতক্ষণ মাছ নিয়ে উড়ে কাকের দল ততক্ষণ তার পেছনে তাকে তাড়া করে উড়ে বেড়ায়। তারপর মাছটা যখনই সে ফেলে দেয় তখনই সে মুক্তি পায়। তাই চিল অর্থাৎ কুরর পাখীর কাছে শিখেছি 'পরিগ্রহো হি দুঃখায়'। বিষয় সংগ্রহই দুঃখের কারণ।

১৯। বালক আমার এক গুরু। কারণ তাদের মনে কোনরূপ অভিমান নেই।

২০। অধিক শঙ্খবলয় একত্রে থাকলে সর্বদা ঝন্ ঝন্ করে বাজে ও গৃহকর্মে অসুবিধা ঘটায়। সেরূপ বহুজনের সঙ্গে থাকলে কৃষ্ণভজন হয় না। এক্ষেত্রে শঙ্খ-বলয় আমার গুরু।

২১। সাপের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। একাকীই থাকে। সেইরূপ গৃহ-হীনতাই সুখ। তাই সাপ আমার নমস্য।

২২। শর নির্মাতার মতো একমনে কাজ করাই সাধনার অগ্রগতি। তাই শর নির্মাতা আমার দ্বাবিংশ গুরু।

২৩। ভগবানের মত মাকড়সাও জাল সৃষ্টি করে আবার সংহার করে। তাই সে আমার এক গুরু।

২৪। কাঁচ পোকা অপর পোকাকে ধরে নিজের গর্তে নিয়ে যায়। তখন সেই পোকাটি ভয়ে কাঁচ পোকার দেহ চিন্তা করতে করতে নিজেই কাঁচ পোকা হয়ে যায়। তেমনি কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে তাঁরই স্বরূপতা লাভ করা যায়। সেই কাঁচ পোকাকে তাই প্রণাম করি।

এইরূপে ব্রাহ্মণ চব্বিশজন শিক্ষাগুরুর কথা বলে নিজের দেহকেই সবচেয়ে বড় গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই দেহের সাহায্যে আমরা তত্ত্বকথা জানতে পারি এবং এই দেহই মোহ মুক্তির কারণ। ঈশ্বর পুজার জন্য—এই দেহই দরকার। দেহ না থাকলে সব অন্ধকার—সব চিন্তাই ব্যর্থ। তাই দেহকে সুস্থভাবে রাখা মানে দেহরূপ গুরুকে ভক্তি করা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

অবধূতের এই সারগর্ভ বাণীগুলি শুনে যদুরাজ সকল আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানে মনোনিবেশ করলেন।

অতঃপর নানাবিধ উপদেশ শ্রবন করে শেষ শ্লোকে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—আপনার অংশভূত জীবাত্মা সকলের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিত্যমুক্ত আবার কেউ কেউ নিত্যবদ্ধ হয় কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ তখন বন্ধন ও মুক্তি সম্পর্কে বলতে লাগলেন—ত্রিগুণের অধীন বলে আমরা আত্মাকে কখনো মুক্ত আবার কখনো বদ্ধ বলে থাকি। জীব নিজ থেকেই মুক্ত হতে পারে না। অবিদ্যা জীবনের বন্ধন ও বিদ্যাই জীবের মুক্তির কারণ। ঈশ্বর জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা আর সব অবিদ্যা। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন—

"প্রভু কহে কোন বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥" চৈঃ চঃ

মহর্ষি পাতঞ্জল বলেছেন—'অনিত্য-অশুচি-দুঃখ-অনাত্মসুখ আত্মখ্যাতিরবিদ্যা'। —অনিত্য বিষয়বস্তুতে নিত্য জ্ঞান, অশুচি পদার্থে শুচীজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান এবং অনাত্মদেহাদিতে আত্মপ্রতীতির নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যার জন্যই মানুষ ঈশ্বরের উপর মন দিতে অসমর্থ হয়। অতএব হে কলির বদ্ধজীব, তোমরা সমস্ত মায়ামমতা ভুলে কর্মফলের আশা ত্যাগ কর। তারপর আমার কথা চিন্তা করলে তোমরা ভক্তি-মার্গে উপনিত হবে। এই ভক্তির দ্বারা সদ্‌গুরু লাভ করে তোমরা বৈকুণ্ঠে গমন করতে সমর্থ হবে।

প্রায়েন ভক্তি যোগেন সঙ্গসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ১১ | ১১ | ৪৮

হে উদ্ধব, সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত ঈশ্বর লাভের উপায় আর কিছু নেই।

সৎসঙ্গ ঈশ্বরকে যতখানি বশীভুত করতে পারে, বেদপাঠ-জ্ঞান বৈরাগ্য, যজ্ঞ, দান, ব্রত ততসহজে তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। গোপীগণ সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের দ্বারা চিরদিনের জন্য তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শরণাগতিই এরূপ চিরকল্যাণপ্রদ। ঈশ্বরকে কোন গুণই বশীভূত করতে পারে না। সত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ বুদ্ধির আত্মার নহে। অতএব সত্বগুণের বুদ্ধির দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে বিনাশ করে অবশেষে শমদমাদি অভ্যাসের দ্বারা সত্বগুণকে অভিভূত করে মানুষ ভক্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

তাছাড়া যিনি আকঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচিত্ত—আমাকে পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্ত হন—সেই ব্যক্তির সমস্ত দিক সুখময় হয়ে উঠে। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ করলে জীবের যে দুঃখ ও বন্ধন আসে, অন্য পুরুষের সঙ্গে বাস করলে সেরূপ বন্ধন আসে না।

যে সন্ন্যাসী বিশুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা বাক্য ও মনকে সম্যকরূপে সংযত না করে সাধন ভজনের চেষ্টা করেন—'তস্য ব্রতং তপোদানং শ্রবত্যামঘটাম্বুবৎ'- কাঁচা মাটির ঘটে রক্ষিত জলের মত সেই সাধকের ব্রত, তপস্যা ও দান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এরপর উদ্ধবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীদের ধর্ম সম্পর্কে বললেন—ব্রহ্মচারীদের দ্বিবিধ—উপকুর্বান ও নৈষ্ঠিক। উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী জটাধারণ করবেন। তিনি কখনো স্বয়ং বীর্যপাত করবেন না, স্বপ্নাদি দোষবশতঃ যদি বীর্যপতন হয় তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ অবগাহন স্নান করে প্রাণায়াম পূর্বক গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবেন। তিনি আচার্যকে মৎস্বরূপ বলে জানাবেন কখনো মনুষ্যবোধে দোষারোপ করবেন না। কারণ—সর্বদেবময়োগুরুঃ'। এই উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে গুরুকে দক্ষিণা প্রদান পূর্বক তাঁর অনুমতি নিয়ে অঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন পূর্বক স্নানান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী চিরজীবনের জন্য ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহন করবেন। তিনি সর্বদা সর্ব-ভূতে পরমেশ্বরকে দর্শন করে ভেদবুদ্ধি বিহীন হয়ে বাস করবেন। সর্বকালে রমণী

দর্শন, স্পর্শন, আলাপন ও স্মরণ পরিত্যাজ্য।

আর গৃহস্থদের ধর্ম হচ্ছে—গৃহস্থগণ সর্বদা, অনিন্দিতা ও বয়ঃ কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করবেন। গৃহস্থব্যক্তি প্রত্যহ অন্নজলাদি প্রদানের দ্বারা মুনি ঋষি ভূত পিতৃ ও মনুষ্যগণকে পূজা করবেন। এইরূপ নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান গৃহীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এই পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য পোষ্যবর্গের ভরণপোষনে কোনরূপ কার্পণ্য দেখবেন না। সংসার চালানোর পর অবশিষ্ট অর্থে ঐ যজ্ঞ সমাপন করবেন। ভক্তিমান গৃহস্থগণ উদাসীনভাবে মমতাশূন্য হয়ে গৃহে বাস করবেন। কারণ আত্মীয় বন্ধুদের মিলন স্বল্পস্থায়ী। মৃত্যুর পর পিতামাতা পুত্র, পত্নী সবই মিথ্যা হয়ে যায়। কেউ সঙ্গে যায় না।

এইরূপ মমতাবীজ ত হয়ে বাস করতে পারলে তবেই ভগবানের প্রতি ভক্তি আসবে। অন্যথায় গৃহস্থ জীবন বন্ধনের কারণ। গৃহে আসক্তচিত্তব্যক্তি আমার পুত্র আমার কন্যা—এইরূপ চিন্তা করতে করতে ঘোর তামসীযোনিতে পতিত হয়।

● বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, মোক্ষ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মসম্পর্কে উপদেশ ●

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব, বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ পঞ্চাশ বছর বয়সে বনগমন করবেন। পঁচিশ বছর ব্যাপী চলবে তাঁর এই বানপ্রস্থ জীবন। তিনি পশু-বধ দ্বারা যজ্ঞ করবেন না। সন্ন্যাসীব্যক্তি কৌপীন পরিধান করবেন। মৌন, চেষ্টা-শূন্যতা ও প্রাণায়াম—এই তিনটি যথাক্রমে বাক্য, শরীর ও মনের দণ্ড। যাঁর এই সকল দণ্ড অর্থাৎ সংযম নেই তিনি কেবলমাত্র বংশদণ্ড নিয়েই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হতে পারেন। 'বেণুভিন' ভবেৎ যতিঃ'। সন্ন্যাসীর মনের ভাব নির্মল না হলে বাইরের সন্ন্যাসচিহ্ন সমস্তই নিষ্ফল। সন্ন্যাসী সাতটি গৃহে ভিক্ষা করে প্রত্যহ জীবনযাপন করবেন। সন্ন্যাসী সর্বদা বালকের মত ক্রীড়া করবেন, ধ্যানাদিতে নিপুণ হয়েও আচরণ করবেন জড়ের মত। পণ্ডিত হয়েও উন্মত্তের ন্যায় কথা বলবেন এবং বেদনিষ্ঠ হয়ে বৃষের ন্যায় (অনিয়তাচারী) আচরণ করবেন।

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ, কুশলো জড়বৎ চরেৎ।
বদেৎ উন্মত্তবৎ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥ ১১।১৮।২৯

সন্ন্যাসী বৃথা তর্কবিতর্কে কোনপক্ষই অবলম্বন করবেন না। 'শুষ্ক বাদ-বিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ'। তিনি অপরের দুর্বাক্যসকল সহ্য করবে এবং নিজে দুর্বাক্যের দ্বারা অপরকে পীড়া দেবেন না। ভগবৎ চিন্তনের জন্য নিজে আহার্য্য সংগ্রহ করে জীবন কাটাবেন।

*　　*　　*

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে মোক্ষধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের মুখ থেকে যে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রবন করেছিলেন তা এখানে উদ্ধবের কাছে বর্ণনা করছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিনয়ের কথা বলা হয়েছে। যাঁর জ্ঞানের একটু মাত্র আভাস পেয়ে ত্রিভুবনের লোক তাকে পরম পুরুষ

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলে পরিচয় দেয়, তিনি ভীষ্মের কাছে ধর্ম কথা শুনে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জ্ঞানীব্যক্তি কর্মফলকে অনিত্য ও অমঙ্গলকর বলে জানাবেন। সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞানই আসল জ্ঞান। বিষয় সমূহে অনাসক্তিই বৈরাগ্য, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিই ঐশ্বর্য্য।

অনন্তর কৃষ্ণ বললেন—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয়—এই দ্বাদশটি যম আর—বাহ্যিক শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, অর্চ্চনা, তীর্থভ্রমণ, পরোপকার, ব্রত, সন্তোষ ও গুরু সেবা—এই দ্বাদশটি নিয়ম। এগুলি ধর্মের অঙ্গ। এইসব গুণযুক্ত ব্যক্তিকে ধার্মিক বলা হয়।

বিষয় ভোগের আশাই দুঃখ, অহংকারী ব্যক্তিই মূর্খ, তর্কের পথই কুপথ, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র আর অনাসক্ত ব্যক্তিই স্বাধীন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটি মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়।

অতএব কর্মের অনুষ্ঠানে যাদের আগ্রহ নেই, তাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধ। কর্মে আসক্ত ব্যক্তিরা কর্ম যোগের সাধনা করবেন। যারা কৃষ্ণের লীলাকথায় আগ্রহশীল ও কর্মে আসক্ত তাদের পক্ষে ভক্তিযোগ শ্রেয়। মোটকথা—জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্ত ও কর্মীর ভগবান সেই পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন—

তাবৎ কুর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বেদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১১।২০।৯

—যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য উপস্থিত না হয় এবং আমার লীলাকাহিনী শ্রবণ করতে করতে যতদিন না শ্রদ্ধা আসে ততদিন পর্য্যন্ত কর্মানুষ্ঠান করবে। এই মনুষ্যদেহে জ্ঞান ও ভক্তি করা সম্ভব বলে মনুষ্যজন্ম দেবজন্ম থেকে দুর্লভ। এই জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি অবশ্যই হয়।

সাধকং গুণভক্তিভ্যাং উভয়ং তদসাধকম্ ॥ ১১।২০।১২

ভগবান বলেছেন—যে ব্যক্তি কামনা বাসনা থাকা সত্ত্বেও ভক্তিযোগের দ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করে আমি তার "কাম্যাঃ হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে"—হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে তার কামনা বাসনা দূর করে দিই। তাছাড়া—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ১১।২০।৩০

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা আমি। আমাকে ভক্তিভরে দর্শন করলে ব্যক্তির অহংকার দূর হয়ে যায়। তার কর্ম সমূহও বিনষ্ট হয়।

যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥ ১১।২০।৩২, ৩৩

—মানুষ কর্ম সমূহের দ্বারা এবং তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগসাধন, দান, তীর্থবাস ও অন্যান্য মঙ্গলকর উপায়ের দ্বারা যা প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা তা পেয়ে থাকে। ভক্তিযোগ সবার ঊর্ধ্বে। ভক্তিযোগের দ্বারা স্বর্গ, মোক্ষ এমনকি বৈকুণ্ঠও প্রাপ্তি হয়।

ভক্তিযোগ সাধনের দ্বারা স্বর্গ ও মুক্তিলাভ সুলভ হলেও শুদ্ধ ভক্ত তা আশা বা প্রার্থনা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের সাথে কোন দেনা পাওনার সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয়। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে বলেছেন—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাস্য কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

—বিষয়ভোগ বা মুক্তির স্পৃহা যতক্ষণ মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে ততক্ষণ পরম সুখময়ী ভক্তির উদয় সম্ভব নয়।

ভক্তিসাধকের অন্যদিকে উদ্দেশ্য নেই। অনেক সময় দেখা যায় ভক্তি ভেকধারী মানুষের অবচেতন মন লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও মান খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটি আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। শাস্ত্রকার তাই মানুষকে সাবধান করে বলছেন—

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবৈঃ সমম্।
প্রতিষ্ঠা শৌকরী বিষ্ঠা, ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ ॥

—ভক্তি সাধকের পক্ষে প্রতিষ্ঠার লোভ সুরাপানের মত গর্হিত। গৌরবের ইচ্ছা নরকের দ্বারস্বরূপ। প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছ। অতএব এই তিনটির লোভ ত্যাগ করে হরিভজন করবে।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ দোষগুণ, দেশ, কাল ও দ্রব্যসমূহের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি সম্পর্কে বললেন—নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিষ্ঠাই গুণ আর অপরের অধিকারে যে অবস্থিতি তাই দোষ। ব্রাহ্মণ ভক্ত বিহীন দেশ অশুদ্ধ। আসন, পাত্র ও বস্ত্র অশুদ্ধ হলে ঘর্ষন ও জল সেচনের দ্বারা তাদের শুদ্ধ করতে হয়। স্নান, দান ও ভগবৎ স্মরণের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি, গুরুমুখ থেকে শ্রুত মন্ত্রজ্ঞানের দ্বারা মন্ত্রের শুদ্ধি আর আমাকে সর্বফল সমর্পনের দ্বারা কর্মশুদ্ধি হয়।

বেদ বলেছে—স্বর্গ কামী ব্যক্তি যজ্ঞ করবে। বেদের এই স্বর্গপ্রাপ্তি রূপ ফল কীর্ত্তন কেবল মানুষের বাইরের রুচি পরিবর্তনের জন্য। বেদ স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করছে। এই কর্ম থেকেই জ্ঞান আসবে। আর জ্ঞান হলেই উদয় হবে ভক্তির। ভক্তির পরেই মুক্তি।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মনঃসংযমের উপায় সম্পর্কে উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করলেন—এক ব্রাহ্মণ অর্থব্যয়ের ভয়ে ধর্ম কর্ম ত্যাগ করে স্ত্রীপুত্রদের বঞ্চনা পূর্বক অর্থ সঞ্চয় করতেন। বৃদ্ধ বয়সে কোনক্রমে তাঁর সেই অর্থ নষ্ট হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তখন পূর্বকৃত কাজের জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের এই বিলাপ ভাগবতে

'ভিক্ষুগীতা নামে পরিচিত। সেই ব্রাহ্মণ এরপর ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে ঘুরতে লাগলেন। গ্রামের নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাকে করত তিরস্কার। ব্রাহ্মণ ভাবছেন—এক্ষেত্রে আমার মনঃ সংযোগই পরম কাজ। মনঃসংযমের দ্বারা চির শান্তি আসে। যদি কেউ নিজের দাঁত দ্বারা নিজের জিভে কামড়ায় তখন তার দাঁত বা জিভের প্রতি রাগ করা বৃথা। অতএব এক্ষেত্রেও আমার রাগ করা চলবে না। মানুষ নিজের মনঃসংযমের অভাবে নিজে দুঃখ পায়। অপর কেউ তার দুঃখ নিবারণ করতে সক্ষম হয় না। আমরা অপরকে আমাদের সুখ দুঃখের কর্ত্তা মনে করে নিজেদের অন্ধক্রোধ ও অল্পবুদ্ধির পরিচয় দিই মাত্র।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা, পরো দদাতীত কুবুদ্ধিরেষা।

অহং করোমীতি বৃথাভিমানং, স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥

—সুখ এবং দুঃখের দাতা অপর লোক নহে। অপর কেউ সুখ দুঃখ প্রদান করছে মনে করা কুবুদ্ধি। মানুষ নিজেকে নিজের জীবনের কর্ত্তা মনে করলে অহংকারেরই পরিচয় দেওয়া হয়। মনঃ প্রসূত আপন আপন কর্মফলই মানুষ ভোগ করে থাকে।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ শ্রীভগবৎ চরণ সেবায় আত্মনিয়োগ করে ভগবৎ প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাই একমাত্র মনঃসংযমই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়।

এরপর ভগবান সাংখ্যযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ গুণত্রয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নির্গুণ হয়ে ঈশ্বরের ভজনা করে থাকেন।

নির্গুণ অবস্থা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।

প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ১১।২৫।২৪

—জীবাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকে সাত্ত্বিক, দেহাত্মাভিমান বিষয়ক জ্ঞানকে রাজস ও আহার বিহারাদি বিষয়ক জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে। আর যে জ্ঞান উপস্থিত হলে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভগবদাত্মক বলে প্রতীত হয়, সেই ভগবৎ অনুভূতিমূলক জ্ঞানকে নির্গুণ জ্ঞান বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষড়বিংশ অধ্যায়ে চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরূরবার বৈরাগ্য প্রাপ্তি বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ গ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করছেন। মনুকন্যা ইলা ভগবদনুগ্রহে পুরুষ হন এবং সুদ্যুম্ন নাম ধারণ করেন। একদা ঐ সুদ্যুম্ন উমাবনে প্রবেশ করে সৈন্যগণের সহিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পরে ঐ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত সুদ্যুম্নের গর্ভে চন্দ্রপুত্র বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হয়। ইলার পুত্র বলে পুরূরবা ঐল নামে পরিচিত। একাদশ স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ে পুরূরবার বিষয় বৈরাগ্যের বর্ণনা আছে বলে এই অধ্যায় "ঐলগীত" নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন—হে উদ্ধব, যারা কাম ও উদরের তৃপ্তি সাধন করতে ব্যস্ত, সেইরূপ অসজ্জনগণের সঙ্গ মঙ্গলকামী ব্যক্তির কখনই উচিৎ নয়। অন্ধ ব্যক্তির অনুগমনকারী অন্ধব্যক্তি যেমন ঘোর অন্ধকূপে নিপতিত হয় সেইরূপ বিষয়ীর সঙ্গ

থেকে বিষয়ীলোকের চিরকালের জন্য অধঃপতন ঘটে থাকে।

পুরুরবা উর্বশীর মোহে পতিত হয়ে অনেকদিন যাপন করেছিলেন। পরে উর্বশী তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে তিনি উলঙ্গ হয়েই বিলাপ করতে করতে তাঁকে অনুগমন করেছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ইন্দ্রিয় জয় করা মানুষের খুবই কষ্ট। এদেরকে বিশ্বাস করা উচিৎ নয়। এইগুলি পণ্ডিতদের মনকেও বিমোহিত করে।

অতঃপর পুরুরবা বিষয়ভোগ বর্জন করে শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 'ক্রিয়াযোগ' উপদেশ দিয়েছিলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব, আমার নিকট থেকে তুমি যে সুবিচারিত তত্ত্ব শিক্ষা করেছ তা তুমি পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে অনায়াসে সত্ত্বরজতমো গুণাশ্রিত গতানুতিশীল জীবন অতিক্রম করে পরমাত্মার সহিত মিলিত হতে পারবে। "অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যাসি ততঃ পরম্—এটাই উদ্ধবের প্রতি প্রভুর শেষ আশীর্বাদ ও শেষ কথা।

অতঃপর ভক্ত উদ্ধব প্রভু কৃষ্ণের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করে তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভারত ভ্রমণে মনোনিবেশ করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

● শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংবরণ ●

জন্ম হলেই মৃত্যু আছে উৎপত্তির বিনাশ।
এটাই চরম সত্য ভেবো বারমাস ॥
মৃত্যুভয় থেকে ভাই মুক্ত রহ চিতে।
অমৃতময় কৃষ্ণ পারেনা মৃত্যুকে এড়াতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত যাদবগণ প্রভাস তীর্থে গমন করেন। কিন্তু সেখানে অকস্মাৎ ঘনিয়ে এল মহাবিপদ।

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ ॥
মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢানাম্ সংঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥

প্রভাস তীর্থে গমন করে যাদবগণ দৈবপ্রভাবে হয়ে উঠলেন মতিভ্রষ্ট। এক প্রকার মদিরা পান করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হতে লাগলেন। ক্রমে পরস্পর বিবেকহীন হয়ে পরস্পরের সাথে করতে লাগলেন মারামারি। হিংসা দ্বেষে জর্জরিত হয়ে পরস্পর শক্তির গর্ব দেখিয়ে মহাকলহের মধ্যে বাস করতে লাগলেন। তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে অনেকেই মৃত্যুমুখে হলেন পতিত। অবশেষে অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হলে

সমুদ্রতীরে মুষলচূর্ণজাত দীর্ঘ ও সুচাল গ্রন্থিবিহীন শর গাছ নিয়ে পরস্পরকে করলেন আক্রমণ।

শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই কলহেতে বাধা দিতে এলে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে প্রতিপক্ষ মনে করে বধ করার মানসে তাঁদের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে যাদবদিগকে করতে লাগলেন বধ।

এইরূপে মহা ভয়ঙ্কর কলহ উপস্থিত হলে যাদবগণ সবাই মারা গেলেন। শুধু বেঁচে রইলেন কৃষ্ণ ও বলরাম।

অবশেষে বলরাম যোগমার্গ অবলম্বন করে সমুদ্রতীরে করলেন দেহত্যাগ। তখন দেবকীনন্দন বনপ্রদেশে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় চতুর্ভুজ মূর্তিতে ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হয়ে বামপদ উরুদেশে স্থাপন পূর্বক ভূতলে অবস্থান করলেন।

এমন সময় জরা ব্যাধ মুষলের চূর্ণাবশিষ্ট লৌহখণ্ডের দ্বারা যে বাণ নির্মাণ করেছিল, মৃগমুখের আকৃতি সম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকে মৃগ মনে করে সেই বাণের দ্বারা সে তাঁর চরণ বিদ্ধ করল। তারপর—

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্টা স কৃত কিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাতশিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ।। ১১।৩০।৩৪

—তখন সেখানে গমন করে চতুর্দশ কৃষ্ণকে দেখে স্বীয় অপরাধের ভয়ে ভীত সেই ব্যাধ তাঁর চরণে পতিত হয়ে সজোরে কাঁদতে আরম্ভ করল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন ক্রুদ্ধ না হয়ে সেই ব্যাধকে বললেন—

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্‌ ॥ ১০।৩০।৩৯

—হে জরাব্যাধ, তুমি ভয় করিও না। ওঠ বৎস। তুমি আমার ইচ্ছাই পূর্ণ করেছ। এক্ষণে স্বর্গে গমন কর।

তখন জরা শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে মূর্চ্ছিত হয়ে স্বর্গে গমন করলে সারথি দারুক প্রভুকে খুঁজতে খুঁজতে তুলসীগন্ধে আমোদিত বায়ু অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে হলেন উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ তাকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন পূর্বক বললেন—তুমি তাড়াতাড়ি অর্জুনকে খবর দাও। সে যেন এখুনি আমার কাছে আসে। আর দ্বারকা শীঘ্রই প্লাবিত হবে। তুমি বন্ধু-বান্ধবকে অতি সত্বর অর্জুন সুরক্ষিত ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে বলবে। আমি আজই পরমধামে গমন করব। আমার মতো পিতাকে জানাবে আমার শেষ প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কথা শুনে দারুক দেবযানযোগে গমন করলেন হস্তিনাপুরে। সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। অর্জুন প্রাণসখাকে শেষ দেখার জন্য অনুমতি চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির বললেন—দেখ অর্জুন তুমি দূর থেকে কৃষ্ণের সাথে কথা বলবে। স্পর্শ করবে না। আমরাও সবাই যাব। তুমি যদি আর ধৈর্য্য ধরতে না পার তাহলে এগিয়ে চল।

অগ্রজের কথা শুনে দারুকের সাথে প্রাণসখাকে দেখার জন্য তৃতীয় পাণ্ডব চললেন

সেই বন প্রদেশে। আঁখি দুটি অশ্রু ছল-ছল। জীবনের এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ।

নিমেষের মধ্যেই পেঁছিলেন তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ তখন অসহায় ভাবে পড়ে আছেন। বিশ্বচরাচরের প্রভু আজ বিশ্ববন্দী। সৃষ্টিকর্তা স্রষ্টা আপন সৃষ্টিতেই বন্ধ হয়ে মাঝে মাঝে মরণ যন্ত্রণায় ছটফট্ করছেন। জন্ম মৃত্যুর একি অদ্ভুত চক্র! এ চক্রের হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নেই।

অর্জুন কৃষ্ণের এহেন অবস্থা দেখে দূরে থেকে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বললেন—সখা, আমি এসেছি। তুমি কথা বল! কোন্ পিশাচ এমন কাজটা করল—তুমি তাড়াতাড়ি বল! আমি তাকে—

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কাছে এসো। আমাকে স্পর্শ কর। তোমার হাতের স্পর্শে আমি যদি এ যন্ত্রণা থেকে কিছুটা শান্তি পাই। সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করো না আমার ইচ্ছাই সে পূর্ণ করেছে। সে মহা ভাগ্যবান। এসো—কাছে এসো।

অর্জুন অগ্রজের কথা স্মরণ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তোমাদের জন্য আমি এতকিছু করলাম আর তুমি আজ আমাকে স্পর্শ করতে ঘৃণাবোধ করছ। তুমি এমনই বেইমান। তাহলে তোমার গাণ্ডীবটা আমাকে দাও। ঐ গাণ্ডীব স্পর্শ করে চিরজীবনের মত তোমার স্পর্শ সুখ অনুভব করি।

সখার কথা রাখতে তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডীবখানা বাড়িয়ে ধরলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই গাণ্ডীব স্পর্শ করে বললেন—সখা, তুমি অবিলম্বেই আমার আপনজনদের নিয়ে তোমার ইন্দ্রপস্থে আশ্রয় দাও। সাতদিনের মধ্যেই সমগ্র দ্বারকানগরী প্লাবিত হবে। তারপর তুমি পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ভ্রাতাদের নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিও।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব এসে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে বললেন—তোমরা অবিলম্বেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা কর। তা না হলে কলি এসে তোমাদের গ্রাস করবে। আমি এখুনি পরমধামে গমন করব আমাকে ধর যুধিষ্ঠির! ভীম, তুমি কাছে এসো। একথা বলতে বলতে ঢলে পড়লেন কৃষ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁর লীলা কীর্ত্তন করতে করতে বিমান যোগে সেই অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় এসে হলেন উপস্থিত। তাঁদেরকে দেখেই কৃষ্ণ তখন স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মায় যোজনাপূর্বক চক্ষু করলেন মুদ্রিত। স্বর্গে বেজে উঠল দুন্দুভি। আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল অজস্র মন্দার মালিকা—চারিদিকে বেজে উঠল মঙ্গলশংখ।

এরপর অর্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডব সেই মরদেহকে করতে লাগলেন দাহ। আকাশপথে উত্থিত হল ধূম। সেই ধুঁয়ার কুণ্ডলী উঠে গেল অনেকদূরে। সেই ধূম রাশিতে প্রতিভাত হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ আজ মানবলীলা সংবরণ করে গোলোকে ফিরে যাচ্ছেন। দ্বিগুণভাবে আবার বেজে উঠল শংখ ঘণ্টা

আকাশপথ থেকে দেবতারা জানাচ্ছেন সম্বর্ধনা। স্বর্গের দ্বারে ঝুলছে অসংখ্য পারিজাত মাল্য। বৈকুণ্ঠের সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে পাতা হচ্ছে ফুলের আসন। সুরভিত চন্দনধূপে সেই সিঁড়ি মাতোয়ারা। নানা রঙের আলপনায় বৈকুণ্ঠের দ্বার অলংকৃত। অপূর্ব ছায়ামূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন সেই সেই সিঁড়ি বেয়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারে।

দূর থেকে যেন ধ্বনিত হয়—

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীহরি ভবলীলা সংবরণ করে চলেছেন গোলোকে ' ওগো তোমরা আজ সব তাকিয়ে দেখো—

ওরে তোরা সব শাঁখ বাজা, ঘণ্টা বাজা

বাজারে মাদল—

গোলোকে আজ যাচ্ছে কৃষ্ণ ত্যাজি ভূমণ্ডল।

* * *

এরপর সারথি দারুক ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্বারকায় গিয়ে দেবকী বসুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের কাছে ভগবানের মানবলীলা সংবরণের সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন। পুত্রদ্বয়ের শোকে বিহ্বল হয়ে দেহত্যাগ করলেন দেবকী, রোহিনী ও বসুদেব। উগ্রসেনও হলেন মূর্চ্ছিত। শ্রীকৃষ্ণের অধিকাংশ স্ত্রী সহমরণে গেলেন। বাকি ১০৮ জন পাণ্ডবদের সাথে অগ্রসর হলেন ইন্দ্রপস্থের পানে।

পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন ওঁরা। অর্জুন কোনক্রমেই আর গাণ্ডীব চালনা করতে পারলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি কৃষ্ণকে স্পর্শ করেছিলে অর্জুন ?

—না, তবে আমার গাণ্ডীবে উনি একবার হাত দিয়েছিলেন।

একথা শুনে যুধিষ্ঠির আক্ষেপ করে বললেন—বিরাট ভুল করেছ ভ্রাতা। তুমি কৃষ্ণের শক্তিতেই শক্তিমান ছিলে। তিনি মানবলীলা সংবরণ কালে গাণ্ডীবে হাত দিয়ে তাঁর নিজের শক্তি নিজেই নিয়ে চলে গেলেন। আর কোনদিন তুমি যুদ্ধ জয়ী হতে পারবে না।

সত্য সত্যই পরাজিত হলেন পঞ্চপাণ্ডব সেই দস্যুদের কাছে। যদুকুলরমণী শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগণ সতীত্ব রক্ষার জন্য ইতস্তত করতে লাগলেন ছুটাছুটি। ঠিক সেই সময় শোনা গেল প্রবল জলকল্লোল। মুহূর্তেই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সারা দেশ হল প্লাবিত। ধ্বংস হল সমগ্র দ্বারকা। দ্বারকার সে কী ভয়াবহ অবস্থা। যে যেদিকে পারল পলায়ণ করল। অনেকেই দিল জলে প্রাণ বিসর্জন।

পঞ্চপাণ্ডব উড়ন্ত রথে চড়ে দ্বারকার বীভৎস চিত্র দেখতে দেখতে ব্যথিত মনে ফিরে চললেন ইন্দ্রপস্থের পানে।

[কেউ কেউ বলেন—শ্রীকৃষ্ণকে দাহ করার পর অবশিষ্ট যে কাষ্ঠ থাকে তা সেই প্লাবনে ভেসে ভেসে উড়িষ্যার উপকুলে উপনীত হয়। পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঐ কাষ্ঠদ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্মাণ করান।]

দ্বাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

● কলিযুগের কাহিনী ●

কলিযুগে কোন মূর্ত্তি না কর গ্রহণ।
সেই হেতু কলিযুগ হইল বর্জন ॥
জীবের মুক্তির হেতু বলি বারবার।
কলিযুগে একমাত্র হরিণাম সার ॥

এটাই ভাগবতের শেষ স্কন্ধ। এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব কলিযুগের দোষ, কল্কি অবতারের আবির্ভাব ও সত্যযুগের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের রাজবংশের কাহিনী ভক্তজনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তাই বাদ দিলাম। যদুবংশের ধ্বংস হওয়ার পর মহাপদ্মনামধারী মহারাজ নন্দ, ব্রাহ্মণ চাণক্য ও মৌর্য্য বংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী বর্ণনা আছে প্রথম অধ্যায়ে।

শ্রীশুকদেব বললেন যে—

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচার গুণোদয়ঃ।
ধর্মন্যায় ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি ॥ ১২।২।২

কলিযুগে বিত্তই মনুষ্যগণের জন্ম, আচার ও গুণের মহিমা বাড়াবে। বাহুবলই হবে ন্যায়ের মানদণ্ড। জীবগণের আয়ু ধর্ম ও বল ক্ষয় হতে থাকবে।

কলিযুগে 'দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুঃ'—পরস্পরের আকর্ষণ থেকে নরনারীর বিয়ে হবে। গুণহীন মানুষ কেবলমাত্র পৈতার দ্বারাই ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। "বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।" পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ'—বেশী কথা বলতে পারলেই পণ্ডিত বলে পরিগণিত হবে। মানুষ যশের আশায় ধর্ম সাধন করবে। আয়ু হবে সাধারণতঃ ৫০। নোংরামি, অশ্লীলতা, কন্যাগমন, পুত্রবধূগমন, মাতৃগমন ও বেইমান নেমকহারামীতে ভরে যাবে পৃথিবী। যে যত ভণ্ড আর ধড়িবাজ সেই হবে তত বলবান। কারো কোন কথার মূল্য থাকবে না। অন্যায়ে দেশ হবে ষোলকলাপূর্ণ। সুরা ও নারী হবে অধিকাংশ মানুষের প্রধান ভোগ্য বস্তু। কলির শেষের দিকে জমি ফসল দানে কুণ্ঠিত হবে—পৃথিবী হবে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। মানুষ ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে বামনসদৃশ। এইরূপে কলিযুগ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসবে ঠিক সেই সময় 'ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবান অবতরিষ্যতি।' অবসন্ন ধর্মকে উদ্ধার করবার জন্য ভগবান সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে আবির্ভূত হবেন।

শম্ভল গ্রাম মুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১২।২।১৮

—শ্রীহরি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কি অবতার রূপে জন্ম-গ্রহণ করবেন।

তারপর—

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনা সাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ॥ ১২।২।১৯
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ।
নৃপ লিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি॥ ১২।২।২০

—অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, গুণবান ও অতুলনীয় দীপ্তিশালী সেই জগৎপতি কল্কিদেব অসাধু ব্যক্তিগণের দমনকারী দেবদত্ত নামক এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করে পৃথিবীতে বিচরণ পূর্বক খড়্গের দ্বারা কোটি কোটি রাজবেশধারী প্রচ্ছন্ন দস্যুকে বধ করবেন। তারপর পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

অনন্তর শুকদেব কলিযুগের দোষ গুণাদি বর্ণন করতে লাগলেন। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ—সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান। ত্রেতাযুগে ধর্ম এক চতুর্থাংশ হ্রাস পায়। দ্বাপরে আরও চতুর্থাংশ লোপ পেয়েছিল। কলিযুগে সর্বলোপ পেয়ে ধর্মের মাত্র একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকবে। পরে মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ বেড়ে গেলে সেই একচতুর্থাংশও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পাষণ্ড কর্তৃক বেদ ও ধর্মশাস্ত্রাদি কলুষিত হবে। ব্রাহ্মণগণ উদারপরায়ন ও ইন্দ্রিয় পরশ হবেন। তপস্যা যাগ যজ্ঞ লোপ পাবে। রমনীগণ অত্যাধিক ভোজনকারিণী, বহুসন্তানবতী ও লজ্জাবিহীনা হবেন। আর—

পিতৃভ্রাতৃ সুহৃদ্‌জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।
ননান্দৃশ্যালসংবাদাঃ দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ॥ ১২।৩।৩৭

—ভালবাসা মমতা ও প্রীতি হবে রতিক্রিয়ামূলক। এইরূপ স্ত্রৈণ পুরুষগণ পিতামাতাকে ত্যাগকরে শ্যালীকা ও শ্যালককে নিয়ে বাস করবে।

আর সাধারণ প্রজাগণ অন্নাভাবে, অনাবৃষ্টির ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হবে। শ্রীহরিকে ভুলে বাস করবে জীবন্মৃত অবস্থায়।

কিন্তু যে হরিনাম গ্রহণ করলে মানুষের "জন্মায়ুতাশুভম্"—দশহাজার জন্মেরও পাপ রাশি ধৌত হয়ে যায়—সে নাম গ্রহণ করবে না।

শ্রীশুকদেব বলছেন যে কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হলেও একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনে জীবের মুক্তি হবে। সত্যযুগে ভগবানের ধ্যান করলে যে ফল হয়, ত্রেতায় যজ্ঞ করলে সে লাভ হয়, দ্বাপরে কৃষ্ণপূজায় যে মোক্ষ পাওয়া যায়, কলিযুগে একমাত্র হরিণাম কীর্তনের দ্বারা ক্ষীণায়ু জীব মুক্তিলাভ করতে পারেন।

কলের্দোষনিধেঃ রাজন্ অস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তৎ হরিকীর্ত্তনাৎ॥ ১২।৩।৫১-৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

● পরীক্ষিতের দেহত্যাগ ●

"হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র বল অবিরাম।
কলি সন্তরণ উপনিষদ থেকে পাওয়া এ নাম ॥
ব্রহ্মা দিল নারদকে এই মন্ত্রখানি।
কলির মুক্তির হেতু আমরা সবে জানি ॥

শ্রীশুকদেব সমগ্র ভাগবতী কথা রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করিয়ে অবশেষে বললেন—হে রাজন্, এই ভাগবত শ্রবণ করে আপনার আর মৃত্যুভয় থাকা উচিৎ নয়। মৃত্যু-ভয় পশু বুদ্ধি। মৃত্যুতেই অমৃত আছে। মৃত্যুর পরেই আপনি চির আনন্দের ধামে যাবেন। মায়ামোহে আর ভুগতে হবে না। এ দেহ মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুই সত্য ও শান্তি। অতএব শ্রীহরির নাম স্মরণ করতে করতে আপনি সেই বৈকুণ্ঠে গমন করুন।

মহারাজ পরীক্ষিত এখন বুঝতে পারলেন যে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জীবনের জয়যাত্রা। শুকদেবের পদযুগল মস্তকে নিয়ে তাই বললেন—হে গুরুদেব! আমি আর তক্ষকদংশনে মৃত্যুর ভয় পাচ্ছি না। আমি আপনাকর্তৃক প্রদর্শিত অভয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামক পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়েছি। এখন আমি বিষয় বাসনা বর্জিত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করে প্রাণত্যাগ করব। আমার অজ্ঞান দূর হয়েছে।

এই ভাগবতের প্রারম্ভেই মৃত্যুভয় ভীত রাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন শুকদেবকে—

কথয়স্ব মহাভাগ, যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ২।৮।২

—হে মহাভাগ, আমাকে উপায় বলে দিন, যাতে আমি বিষয় চিন্তাবর্জিত মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করে প্রাণত্যাগ করতে পারি। আজ সমগ্র ভাগবত শ্রবণ করে সপ্তম দিবসে বলেছেন—মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্।

—বিষয় বাসনাবর্জিত মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত ক'রে আমি এখন প্রাণত্যাগ করব।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, ভাগবতী কথা শুনে রাজার জ্ঞান লাভ হয়েছে। তিনি বিষয় বাসনা বর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন তিনি শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পন করে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত।

আজও বহু ভক্ত এইরূপ ভাগবৎ পাঠ অথবা শ্রবণ করছেন। তবে তাঁরা যদি পরীক্ষিতের মত না বলতে পারেন—'মুক্তকামাশং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্' তাহলে বুঝতে হবে শ্রীভাগবত গ্রন্থ তাকে কৃপা করেন নাই। তাঁর নিকট ভাগবতী কথা নীরস অক্ষর সমষ্টি মাত্র।

অবশ্য ভাগবতী কথা শ্রবণ কখনও সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হতে পারে না। 'অমোঘা ভগবৎ সেবা নেতরেতি মতির্মম।'—ভগবত কথা শ্রবণ অমোঘ। জন্মজন্মান্তরেও এটা ফলপ্রসূ হবে।

অনন্তর রাজা মনকে সমাহিত করে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এদিকে তক্ষক

নামক সর্প ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে গঙ্গার তীর ধরে পরীক্ষিতের নিকট যেতে যেতে পথে কাশ্যপকে দেখতে পেল। তাঁর সহিত কথা বার্তায় তক্ষক বুঝতে পারল যে কাশ্যপ বিষ চিকিৎসায় পারদর্শী এবং রাজাকে তক্ষকদর্শনের পর পুনঃজীবিত করার জন্য তিনি হস্তিনাপুরে গমন করছেন। তখন তক্ষক অর্থ প্রদানের দ্বারা কাশ্যপকে বশীভূত করে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে প্রলুব্ধ করল এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে রাজসভায় গিয়ে সমাধিস্থ মহারাজ পরীক্ষিতকে দংশন করল।

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা।

বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১২।৬।১৩

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ তৎক্ষণাৎ সমস্তলোকের সমক্ষে তীব্র বিষের অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

আমাদের সকলের দেহকেই শ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আমরা জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে যাতায়াত করি। কারণ মন কামনাবাসনাবর্জিত হয় না। আসক্তিশূন্য মনই পরমাত্মার সহিত মিলিত হতে পারে। পাখী যেমন জলে পতনপ্রবৃত্ত বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, সেই বৃক্ষের দিকে ফিরে না চেয়ে আকাশে উড়ে যায় তেমনি সাধুগণ সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করে সংসারের দিকে আব না চেয়ে লিঙ্গদেহশূন্য হয়ে মুক্তি প্রাপ্ত হন। অতএব কামনার বিলুপ্তিই মুক্তি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে কোনদিন কামনা বাসনা লোপ পায় না তাই ঈশ্বরচিন্তা সত্ত্বেও তারা মোক্ষ লাভ করতে পারে না। মুক্তি দুই প্রকার—সদ্য মুক্তি আর ক্রম মুক্তি। মহারাজ পরীক্ষিতের মন বিষয় বিলুপ্ত হল—তিনি লাভ করলেন সদ্যমুক্তি। আব সাধারণ কামনা বাসনা যুক্ত ভক্তের বহুজন্মের সাধনার ফলে যে মুক্তি তা হল ক্রম মুক্তি।

•

পিতার মৃত্যুতে পুত্র জনমেজয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে সর্প যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তখন ভীত হয়ে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। তক্ষক যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশ করছে না দেখে জনমেজয় ব্রাহ্মণদের কাছে তার কারণ জানলেন যে ইন্দ্রের আশ্রয়ে আছে তক্ষক। তাকে নিপতিত করতে হলে ইন্দ্রকেও নিপাতিত করতে হবে। তা শুনে জনমেজয় ইন্দ্রসহ তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে নিপতিত করতে ব্রাহ্মণদের অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণগণ তখন—হে তক্ষক, তুমি ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশ কর। 'তক্ষকাশু পতস্বেহ মহেন্দ্রেণ মরুত্বতা'।

সৃষ্টি হল এক ভীষণ পরিস্থিতির। দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে নিয়ে আকাশ পথে আসতে বাধ্য হলেন।

এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি জনমেজয়কে ক্রোধ পরিত্যাগ করতে উপদেশ প্রদান করলেন—

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মনা।

রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ১২।৬।২৫

—হে রাজন, প্রাণিগণের জীবন, মরণ ও পরলোক নিজ নিজ কর্মের দ্বারাই

নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সেইজন্য প্রাণিগণের সুখ ও দুঃখ প্রদাতা অপর কেউ নহে। নিজের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়।

জনমেজয় তখন বুঝলেন যে রাজা পরীক্ষিতের প্রতি তক্ষক দর্শন পিতার নিজকর্ম ফল বলেই গ্রহণ করতে হবে। তক্ষক সেজন্য অপরাধী নহে।

অতঃপর শ্রীশুকদেব বেদের বিভিন্ন শাখা, পুরাণ বিভাগ, মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা, মহাদেব ও উমাদেবীর সহিত মার্কণ্ডেয়ের সাক্ষাৎ, শিব কর্তৃক বর দান, বিরাট পুরুষের স্বরূপ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের চারি মূর্ত্তিতে প্রকাশ—এই সমূহ বর্ণনা করে শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণন করতে লাগলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

● শ্রীশ্রীভাগবত মাহাত্ম্য বর্ণন ●

ভাগবত পাঠ শেষে কর হরিনাম।
পরম শান্তিতে থেকে পুরবে মনস্কাম॥
পেয়েছি জীবনে আমি বলি ভক্ত জনে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম ছাড়া কিছু নাই ভুবনে॥
নামে শান্তি নামে মুক্তি নামে পাপ মরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভাগবত পাঠ করলে মানুষ অনায়াসে দেহবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার দর্শন লাভ করে থাকেন। ভাগবত সর্বশাস্ত্রের সার। নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহাদেব তেমনি পুরাণ সমূহের মধ্যে ভাগবতই শ্রেষ্ঠ।

সর্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১২।১৩।১৫
নিম্নগানাং যথাগঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১২।১৪।১৬
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশীহ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥ ১২।১৩।১৭

—সমস্ত তীর্থের মধ্যে যেমন কাশী শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণ সমূহের মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা পূর্বক অবশেষে পাঁচটি শ্লোকে বেদমুখ ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব, যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে স্মরণ করে এবং শ্রীহরির বন্দনা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাপ্ত করলেন। নিম্নে উল্লিখিত শ্লোকটি শ্রীভাগবতের সর্বশেষ শ্লোক।

নাম সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২।১৩।২৪

—যাঁর নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বপাপের বিনাশক এবং যাঁকে প্রণাম করলে সর্ব্দঃখের অবসান হয়ে থাকে, আমি সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন বলে শ্রীশুকদেব পরমার্থ লাভের জন্য সহজ ও সরল পন্থা নির্দেশ করে দিয়েছেন। সে পথ হচ্ছে সাধুসঙ্গ ও নাম সংকীর্ত্তন। সাধুসঙ্গ বহুভাগ্যে লাভ হয়ে থাক।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

জন্ম জন্মান্তর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে তবে কোন ভাগ্যবান জীব কোন জন্মে ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ভক্তি বলতে ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ। 'সা-পরানুরক্তিরীশ্বরে।' মানুষ যখন এই ভক্তির অধিকারী হয় তখন তার সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য কিছুই ভাল লাগে না। সবই আলুনি লাগে, ভাল লাগে শুধু কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ সেবা আর কৃষ্ণ স্মরণ।

সৎগ্রন্থপাঠও একপ্রকার সাধুসঙ্গ। সদগ্রন্থ পাঠ করলেও অভীপ্সিত ফল পাওয়া যায়। মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে ভাগবত পাঠ করুক—শ্রীভাগবত, দেবর্ষি নারদ, শ্রীশুকদেব, শ্রীভরতমহাশয়, শ্রীউগ্রশ্রবাসুত প্রভৃতিগণের সঙ্গলাভ করে জীবন সার্থক করবেন।

পরমার্থ লাভের দ্বিতীয় সহজ উপায় এবং শ্রেষ্ঠ পথ সংকীর্ত্তন। মহাভারতের শান্তিপর্বে হরিনাম সম্বন্ধে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব বলেছেন—

প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

—অর্থাৎ 'হরি' এই দুইটি অক্ষর জীবনরূপ দুর্গম পথের পাথেয় স্বরূপ। সংসারব্যাধিরূপ ব্যাধির মহৌষধি এবং দুঃখশোক থেকে পরিত্রাণ দাতা। "প্রাণ কান্তার পাথেয়"।

কী অপূর্ব—কী চমৎকার—কী অতুলনীয় এই শব্দ ব্রহ্ম!

তাই জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য হরিণামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে শ্রীউগ্রশ্রবাসুত মহাশয় শ্রীভাগবত কাহিনী শেষ করেছেন।

যে নাম স্মরণে ও কীর্ত্তনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্ব্ববিধ দুঃখ বিনষ্ট হয়ে যায়, যে নাম কীর্ত্তন করলে ইহকাল ও পরকালের পাপরাশি নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়, আমি সেই পরমাত্মস্বরূপ নামরূপী শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

আর বলি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

● শ্রীমধুসূদন কথিত শ্রীশ্রীভাগবত কথামৃত দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত ●

———